প্রেম
মৃত্যু
ভালবাসা

এক এক দেশে মৃত্যুর চেহারা এক এক রকম। শুধু চেহারা নয়, তাদের গন্ধও। আফ্রিকায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের দীর্ঘদিন পরেও দেখা যায় ছড়ানো-ছিটনো মৃতদেহগুলো পড়ে রয়েছে রণাঙ্গনে, তখনও কবর দেওয়া হয়নি। রাত্তিরে বাতাসে থমথম করছে দম বন্ধ করে দেওয়া চিমসে একটা গন্ধ। হাওয়ায় সারা শরীর ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। মিটমিটে তারাদের ভূতুড়ে আলোয় মৃতদেহগুলোকে মনে হবে কতকগুলো প্রেতচ্ছায়া যেন সীমাহীন ক্লান্তিতে মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। অথচ কয়েক সপ্তাহ পরেই আবার দেখা যাবে ফুলে-ওঠা দেহগুলো শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে, কঙ্কালসার শরীরে সামরিক পোশাকগুলো ঢলঢল করছে। আফ্রিকার উত্তপ্ত বালি, প্রচণ্ড দীপ্ত সূর্যের চোখ-ঝলসানো রুপোলী রোদ আর রুক্ষ আবহাওয়ায় মৃত্যুর চেহারাটা কেমন যেন শুকনো ধরনের। অথচ তুষার-ছাওয়া এই রাশিয়ায় মৃত্যুর চেহারাটা ঠিক তার উলটো—শুধু পিচ্ছিলই নয়, বিশ্রী দুর্গন্ধে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত উঠে আসে।

কয়েকদিন ধরে সমানে বৃষ্টি ঝরছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে বরফ গলার পালা। মাসখানেক আগেও রাতের পর রাত বরফের পুরু স্তর পড়ে বিধ্বস্ত এই গ্রামের প্রতিটা বাড়ি ছাদ-পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিলো। এখন ধীরে ধীরে বরফ গলে বাড়িগুলো স্পষ্ট হচ্ছে—প্রথমে জানলার কাঠামো, দরজার খিলান, তারপরে নিচের সিঁড়িগুলো। সবশেষে গলা বরফের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো মৃতদেহগুলো।

মৃতদেহগুলো কয়েক মাস আগের। এর আগে বহুবার যুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে এই গ্রামের ওপর দিয়ে—নভেম্বর, ডিসেম্বর আর জানুয়ারিতে। এখন এপ্রিল মাস। প্রথমে তুষার-ঝড় মৃতদেহগুলোকে ঢেকে দিয়েছিলো। কখনও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন তুষারপাত হয়েছে যে শব-উদ্ধারকারী সৈন্যরা পর্যন্ত মৃতদেহ খুঁজে পায়নি। তার পর থেকে হাসপাতালের নোংরা রক্তাক্ত বিছানা ধবধবে সাদা চাদরে ঢেকে দেওয়ার মতো প্রতিদিনই শুভ্র তুষার বিছিয়ে গেছে তার নতুন আস্তরণ।

প্রথমে চোখে পড়লো জানুয়ারির মৃতদেহগুলো। ওগুলো ছিলো সবচেয়ে ওপরে। এপ্রিলে বরফ গলার পালা শুরু হতেই ওগুলো বেরিয়ে এলো। দেহগুলো জমে শক্ত কাঠ। মুখগুলো ঘষা-মোমের মত ধূসর।

গ্রামের পেছনে নিচু পাহাড়টায় যেখানে বরফ তত গভীর নয়, সেখানে পাথরের মতো শক্ত মাটি কেটে কিছু মৃতদেহ এর আগেই কবর দেওয়া হয়েছিলো। যদিও কাজটা খুব কঠিন, তবু কবর দেওয়া হয়েছিলো শুধু জার্মান সৈন্যদেরই। রাশিয়ান সৈন্যরা পড়েছিলো খোলা প্রান্তরে। আবহাওয়া একটু শান্ত হবার পর মৃতদেহগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছাড়তে শুরু করলো। গন্ধ যখন তীব্র হয়ে উঠলো, দেহগুলোর ওপর কয়েক বেলচা বরফ চাপিয়ে দেওয়া হলো। কবর দেবার প্রয়োজনও হয়নি। কেন না কেউ বলতে পারে না এই গ্রামটাকে কতক্ষণ নিজেদের দখলে টিকিয়ে রাখা যাবে। তাছাড়া জার্মান সৈন্যবাহিনী এখন পিছু হটছে। এগিয়ে আসা রাশিয়ান সৈন্যরা যদি প্রয়োজন মনে করে নিজের লোকজনদের কবর ওরা নিজেরাই দিয়ে নেবে।

ডিসেম্বরে মৃত সৈন্যদের কাছ থেকে খুঁজে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র, যেগুলো জানুয়ারিতে মৃত সৈন্যরাও ব্যবহার করেছিলো, এবার সেগুলোকে দেখা গেলো। রাইফেল, হাত-বোমা আর মাথা থেকে খুলে যাওয়া ইস্পাতের ভারি শিরস্ত্রাণগুলো মৃতদেহের চেয়ে বেশি বরফের গভীরে ডুবে গিয়েছিলো। সামরিক পোশাকের ভেতরে বিশেষ চিহ্ন দেখে মৃতদেহ কাদের চিনে নেওয়া খুব একটা কঠিন নয়। কিন্তু কখনও কখনও তাও সম্ভব হয় না। জলে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। ওদের হাঁ-হয়ে-থাকা মুখের ভেতরে জল জমে থাকে। কখনও কখনও দু-একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গও পচে গলে যায়। কখনও আবার কয়েকদিন খোলা রোদ্দুরে পড়ে থেকে চোখগুলোই গলে গেলো। প্রথমে দীপ্তিহীন চোখের মণিগুলো গলে গিয়ে থকথকে জেলির মতো দলা পাকিয়ে যায়। তারপর কোটরে জমা বরফজল চোখের কোল বেয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ে! হঠাৎ দেখলে মনে হবে ঠিক যেন ওরা কাঁদছে। হয়তো কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারের আবরণ জমে দেহগুলো কয়েকদিনের জন্যে জমাট বেঁধে রইলো। তারপরেই আবার হঠাৎ একদিন মন্থর গুমট বাতাস বইতে শুরু করলো।

এতদিন পর এই প্রথম বিস্তীর্ণ তুষার প্রান্তরে মানুষের চিহ্ন চোখে পড়লো। জীর্ণ ধূসর সামরিক পোশাক পরা দুটি মানুষ। একজন চকিতে থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ওই যে, ওখানে আর একটা!'

ইম্মেরমান দু পা এগিয়ে এলো। 'কই, কোথায়?'

'ওই তো,' জাউয়ের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। 'গির্জাটার সামনে। আমরা ওকে খুঁড়ে বার করবো নাকি?'

'কি দরকার! ঝড়ে ও আপনিই বেরিয়ে আসবে। এখানে এখনও কমসে কম তিন-চার ফুট বরফ জমে আছে। শালা রাশিয়ার এই গ্রামটাই দেখছি সবচেয়ে নিচু। চলো, বুটের মধ্যে বরফ-জল ঢোকার আগে কেটে পড়ি।'

'সেই ভালো। আজকে কি খাওয়া জুটবে কিছু জানো না কি?'

'রোজ যা জোটে—বাঁধাকপি। চাও কি বাঁধাকপি আর আলুর সঙ্গে দু-এক টুকরো শুয়োরের মাংসও থাকতে পারে।'

'শুয়োরের মাংসের কথা ভুলে যাও, দোস্ত। বাঁধাকপি অবশ্য জুটবে। এই নিয়ে এ সপ্তায় তিনবার হলো।'

জাউয়ের ট্রাউজারের বোতাম খুলে পেচ্ছাপ করতে শুরু করলো। 'আঃ কতদিন যে এরকম আরামে পেচ্ছাপ করিনি! বছরখানেক আগেও দুর্ধর্ষ সৈনিকের মতো গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে পেচ্ছাপ করেছি। তখন শালার মেজাজই ছিলো আলাদা—প্রতিদিন মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলেছি। আর এখন পিছু হটতে হটতে একেবারে খিড়কির দরজায় এসে পৌঁছে গেলুম। নাঃ, এবার দেখছি একটু ভদ্র নাগরিকের মতো পেচ্ছাপ করা শিখতে হবে।'

'সত্যিকারের ভদ্র জীবন ফিরে পেলে কিভাবে পেচ্ছাপ করবে সেটা কোন প্রশ্নই নয়।'

'তা ঠিক। তবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমরা বোধহয় চিরদিনই সৈনিক থেকে যাবো।'

'নিশ্চয়ই,' ইম্মেরমান ঠোঁট টিপে হাসলো। 'আমরা বীরের মতো মৃত্যু-বরণ করে কবরে যাবো, আর এস এস সৈন্যরা এসে তখন তোমার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের কবরে পেচ্ছাপ করবে।'

জাউয়ের ট্রাউজারের বোতাম আঁটলো। 'যা বলেছো। যত নোংরা কাজ করবো আমরা, আর ওরা কুড়বে সম্মান। আমরা শালা কোন গ্রামের জন্যে দু সপ্তা তিন সপ্তা ধরে বুকে বুক দিয়ে লড়বো, আর শেষের দিনে বাবুদের দেখা যাবে আমাদের পাশ দিয়ে বিজয়ীর মতো বুক টানটান করে কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে যেতে। একেই বলে কপাল! নইলে ওদের বেলায় জোটে সবচেয়ে মোটা কোট, ভালো বুট আর মাংসের সবচেয়ে বড় বড় টুকরোগুলো!'

ইম্মেরমান দাঁতে দাঁত চাপলো। 'এখন এস এস সৈন্যরাও আর কোন শহর দখল করতে পারছে না। আমাদের মতো ওরাও পিছু হটছে।'

'আমাদের মতো বোলো না। আমরা যা সঙ্গে নিতে পারছি না, ওদের মতো তো আর গুলি করে বা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছি না।'

'আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো?' ইম্মেরমান আড়চোখে ওর দিকে তাকালো। 'তুমি যে দেখছি বেশ ভদ্র মানুষের মতো কথাবার্তা বলছো! দেখো, স্টেইনব্রেনার যেন আবার না শুনতে পায়···আরে! ওখানে মানুষের একটা হাত দেখা যাচ্ছে না?'

'কই?' জাউয়ের বাঁদিকে ফিরে তাকালো, 'তাই তো! যে-হারে বরফ গলছে, কাল হয়তো দেখবে হাতটা ক্রুশের মতো ঝুলছে। ওটা অবশ্য ঠিক জায়গাতেই আছে, একেবারে গোরস্থানের ওপর।'

'এটা কি গোরস্থান নাকি?'

'নিশ্চয়ই! কেন, তুমি জানো না? আমরা তো আগেও একবার এখানে এসেছিলুম। অক্টোবরের শেষে, সেই পালটা আক্রমণের সময়। তখন তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে না?'

'না।'

'কেন?'

ইম্মেরমান কোন জবাব দিলো না।

'তাহলে তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

একটু বিরতির পর ইম্মেরমান চাপা স্বরে বললো, 'সামরিক শাস্তিশিবিরে।'

জাউয়ের শিস দিয়ে উঠলো। 'শাস্তিশিবির! তাহলে দোস্ত, তুমিও শ্বশুরবাড়িতে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন, কেন?'

ইম্মেরমান ওর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করলো। তারপর চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিলো, 'আগেকার দিনের কমিউনিস্ট বলে।'

'মাইরি!' আনন্দের চোটে বরফের ওপরেই জাউয়ের এক চক্কর ঘুরে নিলো। 'আর ওরা তোমাকে শুধু শুধু ছেড়ে দিলো?'

ইম্মেরমান মুচকি মুচকি হাসলো। 'কারও কারও কপালের জোর থাকে। তাছাড়া সবাই জানে আমি একজন তুখোড় মেসিনগান-চালিয়ে। আপাতত যাকে ওখানের চাইতে এখানে বেশি দরকার।'

'হতে পারে। কিন্তু একজন কমিউনিস্ট হিসেবে, এই রাশিয়ায়···' জাউয়ের হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে ওর দিকে চোখ মিটমিট করে তাকালো। 'ওদের সাধারণত অন্য কোথাও পাঠানো হয়।'

'গুলি মারো।' বিদ্রূপে শক্ত হয়ে উঠলো ইম্মেরমানের চোয়াল ছটো। 'আমি তো আর রাশিয়ার গুপ্তচর নই। তাছাড়া এস এস সৈন্যদের বিরুদ্ধে তুমি যা বললে, আমিও ওদের কানে গিয়ে লাগাতে যাচ্ছি না।' জাউয়েরের দিকে ও বাঁকা চোখে তাকালো। 'তুমি কি বলো ?'

'আমি ? যাকগে ইয়ার, ছেড়ে দাও ওসব কথা।' জাউয়ের তার সামরিক ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিলো। 'চলো, এবার রান্নাঘরের দিকে পা চালানো যাক। নইলে কপালে আবার ডিস-ধোয়া জলও জুটবে না।'

বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগলো। যেন মাটির গভীর থেকে ধীরে ধীরে মেলে দেওয়া একটা হাত আর্ত অসহায় ভঙ্গিতে কার সাহায্য চাইছে।

কম্যাণ্ডার রায়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। 'এটা আবার কি ?'

'একটা হাত, স্যর।'

ভালো করে দেখার জন্যে কম্যাণ্ডার রায়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এলেন। বিবর্ণ আস্তিনের সামান্য অংশটুকু দেখে যেন চিনতে পারলেন। 'দেখে তো রাশিয়ান বলে মনে হচ্ছে না।'

কম্যাণ্ডারের পাশেই ঋজু অথচ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো সার্জেণ্ট মুয়েকে। কোন মন্তব্য করলো না। রায়েকে ও সহ্য করতে পারে না। মাথা-মোটা ধেড়ে গর্দভ একটা! মনে মনে ভাবলো মুয়েকে। অথচ ব্যক্তিগত মনের অনুভূতিকে মনেই চেপে রাখলো। বাইরে তাকে প্রকাশ হতে দিলো না।

রায়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'এটাকে তোলার ব্যবস্থা করো।'

'আচ্ছা, স্যর।'

'বড্ড দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে। ছজন লোককে এক্ষুণি হাত লাগাতে বলো।'

ন্যাকা আমার! দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে! মুয়েকে ভাবলো। যেন জীবনে এই প্রথম আমরা মরা মানুষ দেখছি!

'আমার তো মনে হচ্ছে এটা জার্মান সৈন্য,' রায়ে চশমার ওপর দিয়ে মুয়েকের দিকে তাকালেন।

'কিন্তু, গত চারদিনে আমরা রাশিয়ান ছাড়া অন্য কোন মৃতদেহ পাইনি, স্যর।'

'ঠিক আছে, আগে তোলা হোক। তখন বোঝা যাবে।'

'হ্যাঁ, স্যর।'

কম্যাণ্ডার রায়ে আর দাঁড়ালেন না। তাঁর আস্তানার দিকে ফিরে

গেলেন। উজবুক আর কাকে বলে! অপলক চোখে ওঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে মুয়েকে ভাবলো, ব্যাটার আরামের আর অন্ত নেই! ভালো ঘর, আগুন জ্বালার পাকা ব্যবস্থা আর নামী একটা পদক—রিটারক্রয়েজ! আর আমার শালা একটা লোহার ক্রুশ পর্যন্ত নেই। নিজের অজানতেই মুয়েকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জাউয়ের! ইম্মেরমান! তুটো বেলচা আর শাবল নিয়ে এসো। গ্রেবার, হির্শলাগু, বেরনিং, স্টেইনব্রেনার—তোমরা তোমাদের দায়িত্ব বুঝে নাও। আগে লোকটাকে খুঁড়ে বার করো। যদি জার্মান সৈন্য হয়, তবেই কবর দেবে। আমার মনে হয় এটা জার্মান সৈন্য নয়।'

'বাজি রাখো।' স্টেইনব্রেনার মন্থর পায়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো। চোখে-মুখে নেচে উঠলো শিশুর মতো সরল একটা চপলতা। 'কতো?'

মুয়েকে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো। তারপর বললো, 'তিন রুবল্।'

'চলতি রুবল্?'

'চলতি।'

'তাহলে পাঁচ রুবল্। পাঁচের কম আমি বাজিই ধরি না।'

'বহুত আচ্ছা। পাঁচই সই, এবার ছাড়ো মাল।'

স্টেইনব্রেনার হাসলো। ম্লান সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো ওর মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো। বয়েস সবে উনিশ। ঝকঝকে হালকা সোনালী চুল। ভরাট মুখের আদলটা ভারি সুন্দর, ঠিক যেন প্রাচীন কোন দেবদূত। আর ওর হাসিতে সব সময়ই জড়িয়ে রয়েছে একটা তুষ্টুমি। 'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

মুয়েকে স্টেইনব্রেনারকেও বড় একটা পছন্দ করে না। সবাই জানে ও এস এস। হিটলারের যুব-বাহিনী থেকে ওকে পাঠানো হয়েছে এই সৈন্যদলে। ওর আসল কাজ এখানকার খবরাখবর গেস্টাপোয় পাচার করা। তাই আর পাঁচজনের মতো মুয়েকেও ওর সঙ্গে সমঝে কথা বলে।

'ঠিক হ্যায়।' মুয়েকে পকেট থেকে সুন্দর কারুকার্য করা চেরীকাঠের একটা সিগারেট কেস বার করলো। 'চলবে নাকি?'

'মন্দ কি।'

ইম্মেরমান পাশ থেকে ফোড়ন কাটলো, 'ফুরার কিন্তু ধূমপান করেন না, স্টেইনব্রেনার।'

'চোপরাও।'

'তুই চুপ কর্, বেজন্মা।'

সুন্দর দীঘল চোখের পাতা মেলে স্টেইনব্রেনার ওর দিকে আড়চোখে

তাকালো। 'বাঃ, বেশ বড় বড় পালক উঠেছে তো দেখছি! এর মধ্যে সব ভুলে গেলে নাকি?'

ইস্মেরমান হাসলো। 'সহজে আমি কিছুই ভুলি না, দোস্ত। এবং তুমি কি বলতে চাইছো আমি জানি। কিন্তু ভুলে যেও না আমি শুধু বলেছি—ফুরার ধূমপান করেন না। এখানে আরও চারজন সাক্ষী রয়েছে এবং ফুরার যে ধূমপান করেন না, এ কথা সবাই জানে।'

মুয়েকে ওকে থামিয়ে দিলো। 'থাক থাক, বক্তৃতিতা রেখে এখন খোঁড়া-খুঁড়ির কাজ শুরু করে দাও। হির্শলাণ্ড, তুমিও ওর সঙ্গে হাত লাগাও।'

হির্শলাণ্ড এগিয়ে এলো। স্টেইনব্রেনার মুচকি মুচকি হাসলো। 'কাজটা তোমার মনের মতনই দেওয়া হয়েছে, আইজাক। মড়া খুঁড়ে বার করার কাজ। তোমার ইহুদি রক্তকে চাঙ্গা করে এবার শাবলটা তুলে নাও।'

'চার ভাগের তিন ভাগ আমার আর্য রক্ত।'

'তাই নাকি!' স্টেইনব্রেনার পর পর কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুঁড়ে দিলো ওর মুখের দিকে। 'আমি তো জানতাম তুমি তিন ভাগ ইহুদি। ফুরার অত্যন্ত উদার বলেই তোমাকে দয়া করে আমাদের মতো প্রকৃত জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করতে পাঠিয়েছেন। যাই হোক, এবার এই রাশিয়ান শুয়োর-টাকে টেনে বার করো তো দেখি।'

'এটা রাশিয়ান নয়,' গ্রেবার বললো। মৃতদেহের ওপর থেকে দু-একটা তক্তা সরিয়ে ফেলে ও আগেই হাত আর বগলের চারপাশের বরফ খুঁড়তে শুরু করেছিলো। এবার ভিজে উর্দির কিছুটা স্পষ্ট দেখা গেলো।

'রাশিয়ান নয়?' স্টেইনব্রেনার প্রায় নাচতে নাচতেই গ্রেবারের কাছে ছুটে এসে গর্তটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। 'আরে, এটা তো জার্মান ইউনিফর্মই দেখছি!' চকিতে ও সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। 'মুয়েকে, তুমি হেরে গেছো। এটা রাশিয়ান নয়।'

মুয়েকেও বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলো। গর্তটার দিকে তাকিয়ে দেখলো—বরফের চারপাশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঝরছে। 'আমি বুঝতেই পারিনি,' নিদারুণ বিরক্তিতে ও সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'আমার মনে হয় এটা গত ডিসেম্বরের মৃতদেহ।'

'অক্টোবরের হওয়াও অসম্ভব নয়,' গ্রেবার বললো। 'আমাদের সৈন্য-বাহিনী তখন এখানে ছিলো।'

'বোকার মতন বোলো না। অক্টোবরের একটাও মৃতদেহ আমরা ফেলে রাখিনি।'

'আমি পারছি। সে সময়ে উনি ছাড়া আর কোন সামরিক অফিসার এখানে ছিলেন না।'

'চোখ দুটো পরিষ্কার করে ফেলো।'

গ্রেবার মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলো। তারপর সাবধানে আঙুল দিয়ে বরফ তুললো। 'হ্যাঁ, উনিই।'

মুয়েকে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এবার পরিচালনার দায়িত্ব ও নিজে হাতে তুলে নিলো। বিশেষ করে উঁচু সারির একজন অফিসারের সম্মানের প্রশ্ন যখন এর সঙ্গে জড়িত। 'ওঁকে তোলো। হির্শলাণ্ড আর জাউয়ের, তোমরা পা দুটো ধরো। স্টেইনব্রেনার আর বেরনিং, তোমরা দুজনে হাত দুটো ধরো। গ্রেবার, তুমি মাথাটার দিকে লক্ষ্য রেখো। সবাই একসঙ্গে টানবে। এক দুই—টানো।'

দেহটা নড়ে উঠলো।

'আবার টান। এক দুই—তোলো।'

দেহটা বেরিয়ে এলো। গর্তটা থেকে উঠে এলো গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতো একঝলক হিমেল বাতাস।

'পাটা খুলে গেছে, সার্জেন্ট।' হির্শলাণ্ড মুয়েকের দিকে তাকালো।

'খুলুক গে। ওঁকে এপাশে শুইয়ে দাও।' মুয়েকে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বুটটা অর্ধেক খুলে এসেছে। পায়ের মাংস বরফ-গলা জলে সম্পূর্ণ পচে গেছে। সারা শরীর নড়বড় করছে। বুটসমেত পাটা তখনও হির্শলাণ্ডের হাতে।

ইম্মেরমান জিজ্ঞেস করলো, 'পাটা কি ভেতরে?'

'হ্যাঁ।'

'হাঁ করে দেখছ কি?' মুয়েকে খেঁকিয়ে উঠলো। 'যেমন আছে ওই অবস্থাতেই রেখে দাও। কে আর জানতো এত তাড়াতাড়ি এমন নরম হয়ে যাবে! আর ইম্মেরমান, তুমি এত বকবক না করে মৃত ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে শেখো, বুঝলে?'

ইম্মেরমান সত্যিই কিছু বুঝতে পারলো না। তাই বোকার মতো মুয়েকের মুখের দিকে ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃতদেহ থেকে বরফ সরিয়ে ওরা পরিষ্কার করে ফেললো। ভিজে উর্দির বুকপকেটে পাওয়া গেল একটা চামড়ার ব্যাগ। ভেতরে কাগজপত্র ঠাসা। হাতের লেখা প্রায় সবই উঠে গেছে। তবু গ্রেবার ঠিকই বলেছে—ইনিই লেফটেনান্ট রাইকে। সে সময়ে উনি ছিলেন পদাতিক সেনাদলের অধিনায়ক।

মুয়েকে বললো, 'তোমরা সবাই এখানে থাকো। আমি কম্যাণ্ডার রায়েকে খবরটা দিয়ে এক্‌খুনি আবার ফিরে আসছি।'

জারের আমলের পুরনো একটা গির্জা। পেছনের দিকে গির্জা-সুসংলগ্ন ছোট্ট একটা বাড়ি। সারা গ্রামের মধ্যে এইটেই একমাত্র বাড়ি, যেটা এখনও অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে। যুদ্ধের আগে সম্ভবত গির্জার ধর্মযাজক এখানে বাস করতেন। এর সবচেয়ে বড় শোবার ঘরটায় বসে কম্যাণ্ডার রায়ে কি যেন কাগজপত্তর দেখছেন। বিদ্বেষে কুঁচকে আসা কুতকুতে চোখে মুয়েকে তাকিয়ে দেখলো—ঘরের এক কোণে বড় একটা রাশিয়ান অগ্নিকুণ্ড, তাতে কাঠ জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমচ্ছে বড় বড় লোম-ওয়ালা একটা কুকুর। মুয়েকে খবরটা জানাতেই কম্যাণ্ডার রায়ে ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

কিছুক্ষণ মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে উনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে দাও।'

গ্রেবার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। আস্তে আস্তে বললো, 'বন্ধ করা যাবে না, স্যর। পাতা দুটো এত নরম হয়ে গেছে যে বন্ধ করতে গেলেই গলে যাবে।'

'তাহলে থাক।' রায়ে বোমায় বিধ্বস্ত গির্জার চূড়াটার দিকে তাকালেন। 'একে আপাতত ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখো। আর, আমাদের কোন বাড়তি কফিন আছে?'

'না, স্যর।' মুয়েকে অস্বস্তি বোধ করলো।

'আচ্ছা, আমরা একটা তৈরি করে নিতে পারি না?'

'অনেক দেরি হয়ে যাবে, স্যর,' গ্রেবার উত্তর দিলো। 'এমনিতেই নরম হয়ে গেছে, তার ওপর মজবুত তক্তা এখন কোথাও পাওয়া যাবে না।'

একটু চুপ করে থেকে রায়ে কি যেন ভাবলেন। 'তাহলে এক কাজ করো, শক্ত একটা ক্যাম্বিসে ওকে আপাতত জড়িয়ে রাখো। আমরা ওই-ভাবেই ওকে কবর দেবো। তার আগে বেশ বড় একটা গর্ত খুঁড়ে রাখো।'

গ্রেবার, জাউয়ের, ইম্মেরমান এবং বেরনিং—চারজনে মিলে মৃতদেহটা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে চললো গির্জার দিকে। হির্শলাণ্ড বুটসমেত পাটা নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো ওদের পেছন পেছন।

কম্যাণ্ডার রায়ে এতক্ষণ নির্নিমেষ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার ঘুরে দাঁড়ালেন। 'সার্জেন্ট মুয়েকে!'

'বলুন, স্যর।'

'চারজন বন্দী গেরিলাকে আজ এখানে পাঠানো হয়েছে। কাল ভোরেই ওদের গুলি করে মারতে হবে। আমাদের সৈন্যবাহিনীর ওপর এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। তোমার ওপর দায়িত্ব রইলো এই কাজের। কে কে স্বেচ্ছায় রাজী হবে, সেটা তুমিই ঠিক করে নেবে।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

'আমাদের ওপর কেন এই আদেশ দেওয়া হলো, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। যাই হোক, দায়িত্ব যখন এসেছে···'

স্টেইনব্রেনার এতক্ষণ কথা বলার জন্যে উসখুস করছিলো। এবার সুযোগ পেতেই বলে ফেললো, 'আমি রাজী আছি, স্যর।'

'বেশ।' অভিব্যক্তিহীন থমথমে মুখে উনি ওর দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন। তারপর আর একটি কথাও বললেন না। তুষার-ছাওয়া পথ ধরে সোজা গির্জার দিকে ফিরে চললেন।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ! মুয়েকে মনে মনে ভাবলো। আমাদের হাজার হাজার সৈন্যকে ওরা যখন বন্দী করছে, তখন এই কটা গেরিলাকে গুলি করে মেরে কি হবে!

স্টেইনব্রেনারের উর্বর মস্তিষ্কে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। 'আচ্ছা, আজ বিকেলে রাশিয়ানগুলোকে দিয়ে লেফটেনান্ট রাইকের কবরটা খুঁড়িয়ে নিলে কেমন হয়? আমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। এক ঢিলে দুই পাখিই মারা যাবে। তুমি কি বলো, মুয়েকে?'

'সেটা অবশ্য মন্দ যুক্তি নয়।' মুয়েকে এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কম্যাণ্ডার রায়ের কথাই ভাবছিলো। যুদ্ধের আগে উনি ছিলেন স্কুল মাস্টার। লম্বা, একহারা চেহারা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই প্রথম যুদ্ধের সময় থেকে লেফটেনান্ট। এর আগে একবারও পদোন্নতির সুযোগ পাননি। সাহস আছে ঠিকই, সাহস অনেকেরই থাকে। তবে সেনাধ্যক্ষ হবার যোগ্যতা বলতে যা বোঝায়, তা ওঁর ছিটেফোঁটাও নেই। 'আচ্ছা, রায়েকে তোমার কি মনে হয়?'

ঠিক বুঝতে না পেরে স্টেইনব্রেনার বেশ অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালো। 'তার মানে? উনি আমাদের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক!'

'সে তো নিশ্চয়ই। এ ছাড়া?'

'এ ছাড়া! কি বলতে চাইছো তুমি?'

'কিছু না।'

'এতে হবে ?' বৃদ্ধ রাশিয়ান বন্দী জিজ্ঞেস করলো।

বয়েস ওর সত্তরের কাছাকাছি। ধুলো-ময়লায় ছোপ লেগেছে সাদা দাড়িতে। ঘন নীল তুটো চোখ। ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় ও কথা বললো।

'চুপ কর্ বলশেভিক ভেড়া। তোকে যখন কথা বলতে বলা হবে, তখনি শুধু কথা বলবি,' স্টেইনব্রেনার ঝাঁঝিয়ে উঠলো। ওই এখন সবচেয়ে মৌজে আছে। বারবার ওর চোখ গিয়ে পড়ছে রাশিয়ান মেয়েটার দিকে। বন্দী গেরিলা চারজনের মধ্যে ও-ই একমাত্র মেয়ে—যেমন তেজীয়ান স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দর দেহের বাঁধুনি।

'থাক, এতেই হবে।' গ্রেবার বললো। স্টেইনব্রেনার আর জাউয়েরের সঙ্গে ও-ও কবর খোঁড়ার কাজ দেখাশোনা করছিলো।

'আমাদের জন্যে নাকি?' বৃদ্ধ আবার ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলো।

চোখের পলক পড়ার আগেই স্টেইনব্রেনার লাফিয়ে উঠলো এবং ঠাস করে একটা চড় কশিয়ে দিলো বৃদ্ধের গালে। 'একটু আগে তোকে চুপ করতে বললাম না, জানোয়ার। কি, এখন কেমন লাগছে?'

বৃদ্ধ হাসলো। সারা মুখে কোথাও একটুও গ্লানিমার চিহ্ন নেই। ঠোঁটের প্রান্তে শিশুর মতো সরল একটা প্রশান্তি।

গ্রেবার বললো, 'না, এ কবরটা তোমাদের জন্যে নয়।'

বৃদ্ধ একটুও নড়লো না। নিশ্চল ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি চোখে স্টেইনব্রেনারের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। স্টেইনব্রেনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। ওর মুখচোখের ভাষা হঠাৎ পালটে গেলো। সতর্ক হয়ে ও তু পা পেছিয়ে এলো, ভাবলো রাশিয়ানরা বোধ হয় ওকে আক্রমণ করবে। তাই রাইফেল তুলে ও প্রস্তুত হয়ে রইলো। গ্রেবার ভাবলো এই মুহূর্তে স্টেইনব্রেনারের পক্ষে কাউকে গুলি করে মারাটা আদৌ অসম্ভব নয়, বরং আত্মরক্ষার অজুহাতে সেইটেই স্বাভাবিক। স্টেইনব্রেনারকে ও খুব ভালো করেই চেনে। এটা ওর কাছে এক ধরনের খেলা। শিকারকে উত্তেজিত করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে খুন করতে ও দারুণ আনন্দ পায়। জীবনে গ্রেবার এসব অনেক দেখেছে। এ অভিজ্ঞতা ওর দীর্ঘদিনের। তাই মনে মনে ও শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

স্টেইনব্রেনার এখন রীতিমত উত্তেজিত।

অথচ বৃদ্ধ একচুলও নড়লো না। একই নিশ্চল, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো। নাক থেকে গড়িয়ে আসা রক্তের ক্ষীণ একটাধারা সাদা দাড়ি বেয়ে

ফোঁটায় ফোঁটায় টুপটাপ ঝরে পড়লো শুভ্র তুষারের ওপর। গ্রেবার এই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে ভাবলো, ও যদি এই বৃদ্ধ হতো তাহলে কি করতো—চড় মারার সঙ্গে সঙ্গে ও কি আক্রমণকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, ও কি জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করে বীরের মতো মৃত্যু বরণ করতো, না কি যেকোন বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও নিজেকে অটল রেখে এ পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ আরও কয়েকটা মুহূর্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করতো ! গ্রেবারের মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। স্পষ্ট করে ও আর কিছুই ভাবতে পারলো না।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে নিচু হয়ে শাবলটা তুলে নিলো। স্টেইনব্রেনার আরও এক পা পিছিয়ে এসে লক্ষ্য স্থির করলো। কিন্তু বৃদ্ধ ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। শাবল দিয়ে আবার গর্ত খুঁড়তে শুরু করলো। স্টেইনব্রেনার দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'থাক, আর খুঁড়তে হবে না। এবার ওর মধ্যে শুয়ে পড়্।'

বৃদ্ধ শাবলটা একপাশে সরিয়ে রাখলো। তারপর ধীরে ধীরে গর্তের মধ্যে নেমে নিজেকে টানটান করে মেলে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলো। একটু অপেক্ষা করে স্টেইনব্রেনার সেদিকে এগিয়ে গেলো। ওর পায়ের চাপে ঝুরঝুর করে বরফকুচি ঝরে পড়লো বৃদ্ধের গায়ে। গ্রেবারের দিকে ফিরে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করলো, 'এই লম্বাতেই চলে যাবে, কি বলো ?'

'হ্যাঁ। রাইকে এর চেয়ে বেশি লম্বা নন।'

বৃদ্ধ সোজা ওপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সমুদ্র-নীল আয়ত দুটি চোখ। চোখের মণিতে প্রতিফলিত হচ্ছে একটুকরো স্বচ্ছ আকাশ। মুখের চার-পাশে ছড়ানো শুভ্র দাড়ি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মৃদু ওঠা-নামা করছে। স্টেইনব্রেনার বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'বেরিয়ে আয়।'

বৃদ্ধ বেরিয়ে এলো। কোটের পেছনে, হাতার জায়গায় জায়গায় ভিজে মাটির ছোপ। 'তাহলে,' স্টেইনব্রেনার চোখ ফেরালো মেয়েটির দিকে। 'এবার তোর পালা। গর্তটা অবশ্য বেশি বড় না হলেও চলবে। তোকে কবর দেওয়া আর শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাওয়া, আমাদের কাছে দুই-ই সমান।'

পরের দিন ভোর। নিশান্তিকার তরল অন্ধকার ছিঁড়ে পুব দিগন্তে সবে তখন হালকা গোলাপী রঙের ছোপ লাগতে শুরু করেছে। গত রাত্তির থেকে আবার বরফ পড়া শুরু হয়েছে। খোঁড়া গর্তগুলোর ভেতরে তখনও জমে

রয়েছে চাপ-চাপ অন্ধকার। জাউয়ের বললো, 'একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এ কাজ কেন আমাদের দিয়ে করানো হচ্ছে? এর জন্যে তো এস ডি, এস এসরা রয়েছে। মানুষ মারার ব্যাপারে ওরা ওস্তাদ, এই কাজ করে করে হাত পাকিয়ে ফেলেছে। তাহলে আবার আমাদের দিয়ে কেন? এই নিয়ে তিনবার হল। ইশ্, আমরা যেন কত উঁচুদরের সম্মানীয় সৈনিক!'

গ্রেবার হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে কাঁধের পেছনে ঝুলিয়ে রাখলো। বরফের মতো ঠাণ্ডা ইস্পাতে ওর হাত কনকন করছিলো। এবার পকেট থেকে দস্তানা ছুটো বের করে হাতে পরে নিলো। 'এস ডি, এস এসরা এখন ভীষণ ব্যস্ত।'

জাউয়ের গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'হ্যাঁ, সীমান্তে আসা তো দূরের কথা, ওদের এখন নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই। তা না হোক, স্টেইনব্রেনার যখন রয়েছে···আগে তো ও এস ডি-তে ছিল, তাই না?'

'আমি শুনেছি ও আগে বন্দীশিবিরের দ্বাররক্ষক না কি যেন একটা ছিলো।'

পেছনে এবার অন্যদের পায়ের শব্দ শোনা গেলো।

স্টেইনব্রেনার বড় বড় পা ফেলে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। রীতিমতো শরিফ মেজাজ। সম্ভবত ও-ই একমাত্র যে রাত্তিরে সবচেয়ে ভালো ঘুমুতে পেরেছিলো। ভোরের রাঙা আলো ওর যেন চোখেমুখে ঝিলিক দিচ্ছে। জাউয়েরের দিকে তাকিয়ে ও মুচকি মুচকি হাসলো। 'দেখো, আমি আগেই বলে রাখছি, বকনাটা কিন্তু আমার জন্যে।'

'তার মানে?' জাউয়ের ঘুরে দাঁড়ালো। 'তুমি কি বলতে চাইছো, ওটাকে গভনো করানোর এখনও সময় আছে? সে-চেষ্টা আর একটু আগে থেকে করলে পারতে, ইয়ার!'

ইম্মেরমান চোখের কোণে ইশারা করলো। 'তুমি কি ভাবছো, এমন সুযোগ ও হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে?'

স্টেইনব্রেনার চটে উঠলো। 'কে বললো তোমাকে?'

'তোমার মুখই বলছে, দোস্ত। তা চাঁটটা কেমন খেলে?'

'বাজে বোকো না। আমি যদি সত্যি করে চাইতুম, ও কুত্তীটাকে পেতে আমার কোন অসুবিধেই হতো না।'

'উঁহু, বোধ হয় না।'

'যাক গে ওসব বাজে কথা,' জাউয়ের খানিকটা তামাকপাতা দাঁতে কেটে

মুখে পুরলো। 'মেয়েটাকে তুমি যদি নিজে হাতে গুলি করে মারতে চাও, ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন আপত্তি নেই।'

গ্রেবার বললো, 'আমারও নেই।'

অন্যরা আর কেউ কিছু বললো না। আকাশ তখন অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। হালকা গোলাপী আভা এখন আরক্ত গাঢ় রঙে নিজেকে বদলে নিয়েছে। হির্শলাণ্ড ঘড়ি দেখলো। স্টেইনব্রেনার আড়চোখে ওর দিকে তাকালো। 'তোমার কাছে ব্যাপারটা খুবই দ্রুত ঘটছে বলে মনে হচ্ছে, তাই না আইজাক? কিন্তু এই কাজের জন্যে তোমাকে যে নির্বাচন করা হয়েছে, এর জন্যে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্তত তাতে তোমার ইহুদি দুর্ভাগ্যকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারবে। তবে যাই বলো, এভাবে গুলি নষ্ট করার কিন্তু কোন মানেই হয় না। ব্যাটাদের উচিত স্রেফ পিটিয়ে মারা।'

গ্রেবার মনে মনে ভাবলো, তা তো বটেই, নইলে তোমার হাতের সুখ হবে কেন।

হির্শলাণ্ড বললো, 'ওই যে, ওরা আসছে।'

সার্জেন্ট মুয়েকের সঙ্গে বন্দীরা এগিয়ে এলো। প্রথমে বৃদ্ধ, তার পেছনে তরুণী, সবশেষে তরুণ বন্দী দুজন। ওদের পেছনে উদ্ধত রাইফেল হাতে দুজন জার্মান সৈনিক। বন্দীরা কোন কথা না বলে কবরগুলোর সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়লো। মেয়েটির চোখ মাটির দিকে নামানো। পরনে টক-টকে লাল রঙের পশমের ঘাগরা।

লেফটেনান্ট মুয়েলারকে এবার কম্যাণ্ডারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। কম্যাণ্ডার রায়ের পরিবর্তে উনিই আজ এই প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন। হাস্যকর হলেও, এইটেই সামরিক নিয়ম। সবাই জানে এই বন্দী রাশিয়ানরা গেরিলা। আবার নাও হতে পারে। সত্যি বলতে কি ওদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই পাওয়া যায়নি। তবু অস্ত্র রাখার অপরাধে ওদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাই পদস্থ একজন সামরিক অফিসারের উপস্থিতিতে এই হত্যাকাণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে সুসম্পন্ন হওয়া উচিত।

লেফটেনান্ট মুয়েলার একুশ বছরের তরুণ। বলিষ্ঠ, সুপুরুষ চেহারা। এবং খুব অল্পদিনই এই সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র তিনি একে একে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং মৃত্যু-দণ্ডাদেশ পাঠ করে শোনালেন।

'ছুঁড়িটা কিন্তু আমার জন্যে।' স্টেইনব্রেনার পাশ থেকে ফিসফিস করে বললো।

গ্রেবার মেয়েটির দিকে তাকালো। ভোরের রাঙা আলো এসে পড়েছে ওর মুখে, বাদামের মতো বড় বড় আনত দুটি চোখের পাতায়, পশমের উজ্জ্বল লাল ঘাগরায়। নিপুণ ভাস্করের ছেনিতে কুঁদে তোলা আশ্চর্য সুন্দর সুগঠিত একটি দেহরেখা। মুয়েলার কি পড়ছেন ও কিছুই বুঝতে পারলো না, শুধু এটুকু বুঝতে পারলো এটা ওর মৃত্যু-আদেশ। অনুমান করে নিলো, যে স্পন্দিত উষ্ণ রক্ত ওর ধমনীর শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তবু ভোরের এই হিমেল হাওয়ায় ও চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ও ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কোথাও কেউ নেই।

গ্রেবার দেখলো মুয়েকে লেফটেনাণ্ট মুয়েলারের কানে ফিসফিস করে কি যেন বললো। মুয়েলার চুপচাপ শুনলেন, তারপর দৃষ্টি ফেরালেন। 'ওটা পরেও করা যেতে পারে।'

'না, স্যর। আমার মনে হয় এখনই সহজ হবে।'

'বেশ, যা ভালো বোঝ করো।'

মুয়েকে বন্দীদের দিকে এগিয়ে এলো। একজন তরুণকে নির্দেশ করে ও বৃদ্ধকে বললো, 'ওকে জুতোজোড়াটা খুলে ফেলতে বলো।'

বৃদ্ধ তক্‌খুনি রোগা মতন দেখতে একজন তরুণ বন্দীকে কাঁপা কাঁপা স্বরে রাশিয়ান ভাষায় কি যেন বললো। তরুণ প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি। হয়তো কোন অতীত স্মৃতি তখন ওর মনের মধ্যে আনাগোনা করছিলো। মুয়েকে চাপা গর্জন করে উঠলো, 'জুতোজোড়া···হাঁদাগঙ্গারাম, তোর জুতোজোড়াটা খুলে ফেল।'

বৃদ্ধ আবার রাশিয়ান ভাষায় ওকে কি যেন বললো। তরুণ এবার বুঝতে পারলো। এবং এতক্ষণ যে বুঝতে পারেনি, এর জন্যে শঙ্কিত হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও জুতো দুটো খুলে ফেলার চেষ্টা করলো। এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য জুতোটা খোলার সময় নিজের দেহের ভারসাম্যতা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো। গ্রেবার ভেবেই পেলো না—ও এত তাড়াতাড়ি করছে কেন! ও কি জীবনে আর একটা মিনিট সময় সঞ্চয় করে রাখতে চায়! তরুণ জুতোজোড়া হাতে নিয়ে মুয়েকের দিকে এগিয়ে ধরলো। জুতোজোড়া সত্যিই দামী। মুয়েকে ইঙ্গিতে ওখানেই রাখতে বলে একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। তরুণ জুতোজোড়া ওখানে রেখে খালি পায়ে আবার

তার সারিতে ফিরে এলো। তুষারের ওপর দাঁড়াতে তখন তার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো।

মুয়েকে এবার অন্য বন্দীদের দিকে চোখ ফেরালো, দেখলো মেয়েটির হাতে ঘন পশুর লোমের চমৎকার একজোড়া দাস্তানা। ইঙ্গিতে ও দাস্তানা দুটো খুলে জুতোজোড়ার পাশে রেখে দিতে বললো। এবার ওর চোখ পড়লো সুন্দর লাল ঘাগরাটার দিকে। স্টেইনব্রেনার আড় চোখে মুয়েকের দিকে তাকালো। মুয়েক কিন্তু মেয়েটিকে কিছু বললো না। হয়তো ও ভয় পেয়েছিলো, পাছে কম্যাণ্ডার রায়ে তাঁর জানলা দিয়ে লক্ষ্য করেন, কিংবা ঘাগরাটা নিয়ে কি করবে ও তখনও হয়তো ঠিক ভেবে উঠতে পারেনি। মুয়েকে এবার কয়েক পা পেছিয়ে এলো।

মেয়েটি দ্রুত রাশিয়ান ভাষায় কি যেন বললো।

লেফটেনাণ্ট মুয়েলারের জীবনে এই প্রথম প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া। গলার ভেতরটা ওঁর শুকিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ রাশিয়ানকে উনি বললেন, 'ওকে জিগেস করো ও কি চায়?'

'কিছু না। ও শুধু তোমাদের অভিসম্পাত দিচ্ছে।'

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে মুয়েলার একটু ঝুঁকে জোরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দিচ্ছে?'

'ও তোমাদের অভিসম্পাত দিচ্ছে।' বৃদ্ধ একইভাবে জোরে জোরে উত্তর দিলো। 'তোমাদের এবং প্রতিটা জার্মান সৈন্য, যারা এই রাশিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছো, তাদের সবাইকে ও ঘৃণায় অভিসম্পাত দিচ্ছে। ওর ধারণা—তোমরা যেভাবে ওকে গুলি করে মারছো, ওর শিশুরাও একদিন বড় হয়ে ঠিক ওইভাবে তোমাদের শিশুদেরও গুলি করে মারবে।'

'ও বাব্বাঃ, মাগীর তেজ তো কম নয়!' মুয়েকে চোখ পাকিয়ে মেয়েটার দিকে কটমট করে তাকালো।

'যাকগে মুয়েকে, ছেড়ে দাও। মিছিমিছি আর চটাচটি করে কোন লাভ নেই।' মুয়েলার মুয়েকেকে পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর সামরিক কায়দায় আদেশ দিলেন, 'অ্যাটেন-শন্!'

সৈনিকেরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। গ্রেবার তার কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিলো। হাত থেকে দাস্তানাদুটো খুলে ফেললো। বরফের মতো ঠাণ্ডা ইস্পাত যেন তার আঙুলগুলো জমিয়ে দিচ্ছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে হির্শলাণ্ড। গ্রেবার প্রথমে ভেবেছিলো—ওর ওপর যখন গুলি করার আদেশ দেওয়া হবে, ও তখন বাতাসে ফাঁকা গুলি করবে। কিন্তু এখন ওর কাছে

মনে হলো সেটা অবাস্তব। কেননা এতে কোন লাভ নেই, গুলি করে মারা ওদের হবেই। আচ্ছা, অন্য সৈন্যরা এখন কি ভাবছে? ওরাও কি ভাবছে ইচ্ছে করে লক্ষ্য ভুল করবে! আচ্ছা, কোন গুলিই যদি কারুর গায়ে না লাগে, তাহলে কি আবার নতুন করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হবে? যদি কোন কারণে আদেশ দেওয়া না হয়! গুলি লাগার আগেই হয়তো মেয়েটা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো, তারপর অশ্রুসজল চোখে গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো! মেয়েটার জন্যে ওর সত্যিই ভীষণ খারাপ লাগলো। তবু বাস্তবে সেসব কিছুই ঘটলো না। হঠাৎ ওর চমক ভাঙলো মুয়েলারের কণ্ঠস্বরে।

'টেক এ-ম্!'

রাইফেলের নলের ওপর দিয়ে গ্রেবার দেখতে পেলো রাশিয়ান বৃদ্ধের শুভ্র দাড়ি আর নীল চোখ দুটো। দৃষ্টির কেন্দ্র থেকে মুখটা যেন দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। গ্রেবার রাইফেলের নলটা একটু নিচের দিকে নামিয়ে নিলো। এদিক থেকে বুকই সবচেয়ে ভালো। গ্রেবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো হির্শলাণ্ডের রাইফেলের মুখ অনেকটা উঁচুর দিকে তোলা রয়েছে। গ্রেবার ফিসফিস করে বললো, 'মুয়েকে তোমাকে লক্ষ্য করছে। বুকের কাছে গুলি করার চেষ্টা করো।' হির্শলাণ্ড রাইফেলের নলটা একটু নিচের দিকে নামিয়ে নিলো।

ঠিক তখনই আদেশ এলো—'ফায়ার!'

ভোরের নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলা চারটে গুলির শব্দ।

বৃদ্ধ একটু লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। তারপর পেছনে ঘুরে পড়লো। যেন ছায়াছবির রুপোলী পর্দায় আয়নার সামনে দাঁড়ানো কোন মানুষ, হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গেলো। বৃদ্ধ ঘাড় গুঁজে পড়লো কবরের ভেতরে, শীর্ণ পাদুটো বেরিয়ে রইলো গর্তের বাইরে। অন্য তরুণ দুজন যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। খালি-পা বন্দী একেবারে শেষ মুহূর্তে দু হাত দিয়ে তার মুখটা ঢেকে ফেলেছিলো। একটা হাত তার বাহুসন্ধি থেকে মুচড়ে ভাঙা ডানার মতো ঝুলছে। যদিও সামরিক রীতি, তবু কোন বন্দীরই হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা বা চোখ কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়নি। হয়তো কারুর মনেই ছিলো না।

মেয়েটা পড়েছিলো সামনের দিকে এগিয়ে এসে। তখনও মরেনি। দু হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুলে নিষ্পলক চোখে সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে ছিলো। যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠছিলো ওর দাঁতে চাপা

পাতলা ঠোঁট দুটো। স্টেইনব্রেনারের মুখ দেখে মনে হলো ও যেন ঠিক এই-ই চেয়েছিলো। নইলে ও পেটে গুলি করতো না।

বৃদ্ধের পা দুটো দু-একবার মৃদু নড়ে স্থির হয়ে গেলো।

মেয়েটি এবার অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে কি যেন বললো। কেউ একবর্ণও বুঝতে পারলো না। বৃদ্ধ বেঁচে থাকলে হয়তো বোঝা যেতো। মেয়েটি দু হাতে ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো। নীল হয়ে ফুটে উঠেছে ওর কপালের শিরাগুলো। তবু পারলো না। কিন্তু জ্বলজ্বলে নির্নিমেষ চোখের দৃষ্টি ও একবারের জন্যেও সরিয়ে নেয়নি। যন্ত্রণা আর ঘৃণায় মেশা অদ্ভুত এক স্বরে বিড়বিড় করে ও আবার কি যেন বললো। খোলা পিস্তল হাতে মুয়েকে যে কখন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা লক্ষ্যই করেনি। মুয়েকে যখন ঝুঁকে এলো, মুহূর্তের জন্যে ও পিস্তলটা শুধু দেখতে পেলো। এক ঝটকায় মাথাটা একপাশে সরিয়ে ও মুয়েকের হাতটা কামড়ে ধরলো। মুয়েকে অশ্লীল গালাগালি দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে মেয়েটার চোয়ালে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো। মেয়েটা ঘুরে পড়তেই মুয়েকে হাত ছাড়িয়ে নিলো এবং চোখের পলক পড়ার আগেই গলার নিচে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করলো।

'আশ্চর্য!' মুয়েলার এই প্রথম যেন বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন। 'একজন সৈনিক হয়ে কোথায় কিভাবে গুলি করতে হয়, তাই-ই জানো না?'

'আমি না, হির্শলাণ্ড করেছে, স্যার।' স্টেইনব্রেনার নির্জলা মিথ্যেটা চালিয়ে দিলো।'

গ্রেবার প্রতিবাদ করলো, 'না। হির্শলাণ্ড ওকে গুলি করেনি।'

'চুপ করো।' মুয়েকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তোমাকে কেউ সদ্দারী করতে বলেনি।'

গ্রেবার কোন কথা বললো না। মুয়েলারের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওঁর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুয়েকে এবার অন্য রাশিয়ানদের ওপর ঝুঁকে পড়লো। হঠাৎ বুট পায়ে তরুণটির কানের ওপর পিস্তল ঠেকিয়ে ও গুলি করলো। মাথাটা সামান্য ঠিকরে উঠেই আবার স্থির হয়ে গেলো। মুয়েকে পিস্তলটা খাপে ভরে রাখলো। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতের রক্ত মুছে ফেললো।

মুয়েলার বললেন, 'যাও, দাঁত-বসানো জায়গাটা ডেটল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলো।'

'যাচ্ছি, স্যর।'

'মুয়েকে চলে গেলো। মুয়েলার মৃতদেহগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মেয়েটার চোখের মণিত্নটো তখনও আকাশের দিকে স্থির তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ কেন জানি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উনি স্টেইনব্রেনারকে বললেন, 'ওর চোখের পাতাত্নটো বন্ধ করে দাও।'

দুই

সেদিন রাত্তিরেই মেঘ-গর্জনের মতো চাপা অথচ গম্ভীর আওয়াজে দিগন্ত কেঁপে উঠলো। মুহুর্মুহু কামানের গোলা বর্ষণে ঝলসে উঠছে আকাশের বুক। দশদিন আগেই সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধসীমান্ত থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে এখানে। রাশিয়ানরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। দিন দিন সীমান্ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন প্রকৃতপক্ষে সীমান্তরেখা বলতে আর কিছু নেই। গত কয়েক-মাস ধরেই রাশিয়ান সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে আসছে আর জার্মান সৈন্যবাহিনী পিছু হঠছে।

গুমগুম চাপা আওয়াজে গ্রেবারের ঘুম ভেঙে গেলো। তু-একবার কান পেতে শুনলো। তারপর আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলো। পারলো না। একটু পরেই বুটজোড়া পায়ে গলিয়ে ও বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে নক্ষত্রখচিত স্বচ্ছ রাত্রি। খুব একটা ঠাণ্ডাও নেই। ডানদিকে বনাঞ্চলের ওপার থেকে বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে শূন্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে প্যারাশুট। তারপর বড় একটা জেলিমাছের মতো জ্বলতে জ্বলতে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আরও দূরে থেকে থেকে অনুসন্ধানী আলোর তীব্র রেখা আকাশের বুকে বোমারু বিমান খুঁজে বেড়াচ্ছে।

গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। তারায় তারায় ভরা নিথর নিস্পন্দ আকাশ। আকাশে ও একটাও বিমান দেখতে পেলো না। অথচ স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো, হানা দেবার পক্ষে রাতটা উপযুক্ত।

'ছুটিতে যাওয়া মানুষদের জন্যে রাতটা সত্যিই চমৎকার, তাই না?' ওর পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো।

চমকে মুখ ফেরাতেই গ্রেবার দেখতে পেলো—ইম্মেরমান। হাতে রাইফেল, সাস্ত্রীর পোশাকে সজ্জিত। যদিও সৈন্যবাহিনীকে সীমান্ত থেকে

দূরে সরিয়ে আনা হয়েছে, তবু চারদিকেই ওত পেতে রয়েছে গেরিলারা। তাই রাত্তিরেও এই সর্তক পাহারার ব্যবস্থা।

ইম্মেরমান ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। 'কি ব্যাপার, গ্রেবার! এত তাড়া-তাড়ি যে চলে এলে? তোমার তো পাহারা দেবার পালা শুরু হতে এখনও আধ ঘণ্টা বাকি? যাও যাও, আর খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। বরং সময় এলে আমি তোমাকে জাগিয়ে দেবো।'

'না, ঘুম আর আসবে না।'

'কেন, ছুটির খবর শুনেই ঘুম চটে গেছে বুঝি?' ইম্মেরমান চোখ মিটমিট করে হাসলো। 'তবে যাই বলো, আজকের দিনে ছুটি পাওয়া নেহাত বরাতের ব্যাপার!'

'বরাতের চেয়ে খুঁটির জোর দরকার বেশি। তাছাড়া অনেক দিন আমি কোন ছুটি পাইনি। অবশ্য শেষ মুহূর্তেও ওরা আমার ছুটি বাতিল করে দিতে পারে। আগে তিন-তিনবার ঠিক একই জিনিস ঘটেছে। যাবো বলে সবে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় জারুরী খবর এলো এখন যাওয়া চলবে না।'

'এখানে কিছুই অসম্ভব নয়, গ্রেবার। তোমার কতদিনের ছুটি পাওনা আছে?'

'পাওনা তো অনেক দিনের। প্রতিবারেই কোন-না-কোন ফ্যাকড়া বাধিয়ে আটকে দিয়েছে। শেষবার তো মরতে মরতেই বেঁচে গেলাম।'

'সেটা তোমার মনের জোর, গ্রেবার। মনের জোরেই আমাদের মতো সৈনিকরা বীরের গৌরব অর্জন করার জন্যে টিকে থাকি। নইলে কামানের গোলা আর সৈনিকের মৃত হাড়ে রাইখের মাটি আরও হাজার বছরের জন্যে উর্বর হয়ে উঠতো।'

গ্রেবার চকিতে ওর মুখের দিকে একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকালো। ইম্মেরমান ওর ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললো। 'ভয় নেই, সবাই এখন নাক ডাকাচ্ছে। এমনকি স্টেইনব্রেনারও।'

'না, আমি সেকথা ভাবছি না।' মুখে না বললেও, গ্রেবার ঠিক ওই ভয়টাই করছিলো—আশেপাশে কেউ আছে কি না।

ইম্মেরমান আবার হাসলো। 'দোষ শুধু তোমার একার নয়, গ্রেবার। ভয় এখন আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। সত্যি, আমাদের এই গৌরবোজ্জ্বল যুগে বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মতন যে হারে গুপ্তচর গজিয়ে উঠছে, তাতে অবশ্য ভয় পাবারই কথা।'

গ্রেবার বিরক্ত হলো। 'এতই যদি বোঝো, স্টেইনব্রেনারকে এড়িয়ে চললেই পারো।'

ইম্মেরমান চটে উঠলো। 'বানচোতের মুখে আমি মুতে দিই। ও আমার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে তোমার, কেন না ওকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কেউ কেউ আমাকে ভালোবাসে তাতেই আমি খুশি। তাছাড়া খুব বেশি লেজ নাড়ানাড়ি আমি একটুও পছন্দ করি না।'

গ্রেবার কোন কথা বললো না। মনে মনে ও রাজনীতির প্রসঙ্গটা এড়িয়ে চলতে চাইছিলো। ছুটির আগে নতুন করে কোন বিপদআপদ ঘটুক এটা ওর পছন্দ নয়। যদিও ইম্মেরমান ঠিকই বলেছে—অবিশ্বাস আর সন্দেহ তৃতীয় রাইখের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। আজ আর কেউ কোথাও নিরাপদ নয়। কিন্তু কেউ যখন সত্যিই নিরাপদ নয় তখন তার মুখ বন্ধ করে রাখাই ভালো।

ইম্মেরমান বোধ হয় গ্রেবারের মানসিক অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। তাই ও-প্রসঙ্গ আর উত্থাপন না করে জিজ্ঞেস করলো, 'শেষ কবে তুমি বাড়ি গিয়েছিলে ?'

'দু বছর আগে।'

'সে তো অনেকদিন ! এখন তুমি ফিরে গিয়ে দেখবে অনেক কিছু বদলে গেছে।'

'নতুন করে আর কি বদলাবে ?'

'সে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না।'

এই মুহূর্তে একটা আশঙ্কা একটা আহত যন্ত্রণায় গ্রেবারের বুকের ভেতরটা যেন টনটন করে উঠলো। ও জানে আজকের দিনের পৃথিবীতে যে-কোন জায়গায় যে-কোন মুহূর্তে অনেক কিছুই আমূল বদলে যেতে পারে। এসব কথা ও বহুবার ভেবেছে। বহুবারই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে—এসব ভেবে কিছু লাভ নেই, কেবল নিজেই নিজেকে কষ্ট দেওয়া। তাই ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কেমন করে জানলে ? তুমি তো আর ছুটিতে ছিলে না ?'

'নিশ্চয়ই না। তবু জানি। স্বাভাবিকভাবে যা জানা যায়, শাস্তিশিবিরে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু শোনা যায়।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছিলো। গ্রেবার এবার থমকে দাঁড়ালো। এই মুহূর্তে ওর যেন কিছু ভালো লাগলো না। কেন ও বাইরে এলো ? ও তো কারুর সঙ্গে কথা বলতে চায়নি ? চেয়েছিলো একটু

একলা থাকতে। নিরিবিলি, সম্পূর্ণ একা। ঠিক এখানে নয়, এখানের গোলাবারুদ আর রক্তের গন্ধ থেকে দূরে, বাড়িতে। ভেবেছিলো ছুটির তিনটে সপ্তাহ সম্পূর্ণ একা স্বপ্নাচ্ছন্ন আবিল একটা ভাবনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে। অনেক কিছু ও ভাবতে চায়, এখন অনেক কিছু সম্পর্কে ওকে ভাবতে হবে। তার আগে নিজেকে একটু নির্জন দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে।

'আমার পাহারা দেবার সময় হয়ে এলো। আমি পোশাকটা পালটে এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

গ্রেবার ফিরে চললো।

হঠাৎ মনে পড়ায় ইম্মেরমান দূর থেকে চেঁচিয়ে বললো, 'জাউয়েরকেও জাগিয়ে দিও।'

সারারাত ধরে আকাশে আকাশে চললো বুক-কাঁপানো গুরু-গুরু তোপধ্বনি। প্রতি মুহূর্তেই আরক্তিম হয়ে ঝলসে উঠছে দিগন্তের বুক। গ্রেবার অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। উনিশশো একচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে ফুয়ার ঘোষণা করলেন, আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছি। সবাই তা বিশ্বাস করলো। বিয়াল্লিশ সালেও তিনি আবার ঘোষণা করলেন, আমরা অপরাজেয়। তখনও সবাই বিশ্বাস করলো। তারপর হঠাৎ মস্কো আর স্তালিনগ্রাদের সীমান্তে এলো এক অভাবনীয় সময়। তখন থেকে আর একচুলও এগোনো গেলো না। ঠিক যেন ভেল্কির খেলা। সেদিন রাশিয়ার সবকটা কামান একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছিলো। কেঁপে উঠেছিলো ইউরোপের প্রতিটা আকাশ। আর তার সে গুরু-গুরু ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ডুবে গিয়েছিলো ফুয়ারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর। তার পর থেকে একটি বারের জন্যেও থামেনি মেঘ-মন্দ্রিত কামানের গর্জন, বিমানের ব্যস্ত তৎপরতা। সেদিন থেকে জার্মান সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে শুরু করলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুজব রটে গেলো জার্মান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, অনেকেই আত্মসমর্পণ করেছে এবং বাকি অপরাজেয় বীরেরা পালিয়ে পিঠ বাঁচাচ্ছে। ঠিক যেমন কায়রোর সীমান্তে মার খেয়ে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে একদিন পালিয়ে আসতে হয়েছিলো আফ্রিকা থেকে।

গ্রেবার গ্রামের দিক দিয়ে ঘুরে চললো। জ্যোৎস্নাবিহীন আবছা আলোয় সবকিছু কেমন যেন অদ্ভুত, অবাস্তব মনে হচ্ছিলো। এলোমেলো তুষার পড়ছে। বাড়িঘর, উঁচু নিচু টিলাগুলো মনে হচ্ছে দূরে, আর দূরের অরণ্যটা

তার স্বাভাবিক দূরত্বের চেয়ে মনে হচ্ছে যেন অনেক কাছে। গ্রেবারের মনে হলো বাতাসে কোথায় যেন একটা রহস্য, একটা অজানা আতঙ্ক ওত পেতে রয়েছে। হঠাৎ ওর গাটা ছমছম করে উঠলো।

উনিশশো চল্লিশ সালের ফ্রান্স। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রতিরোধের শেষ খুঁটিটাও নড়ে গেছে। প্যারিস তখন হাতের বাইরে। বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঢুকে পড়েছে ফ্যাসিস্ট বাহিনী। বিশৃঙ্খল শহরের অলিতেগলিতে শোনা যাচ্ছে, স্তুকাসের উন্মাদ আস্ফালন। ভীতসন্ত্রস্ত নর নারী শিশু বৃদ্ধ, দল-ভেঙে ফেরা সৈনিক আর যানবাহনে প্রতিটি রাস্তার অবস্থা তখন নাভিশ্বাস-ওঠা মুমূর্ষু মানুষের মতো। ভরা গ্রীষ্ম। ঢেউ-খেলানো মাঠের পর মাঠ, অরণ্য, প্রান্তর পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। তারপরেই রুপোলী আলোয় ঝলমল করা রূপসী শহর—প্যারিস। তার রাজপথ জনপথ, তার দোকানপাট, তার রেস্তরাঁ—রাইফেলের শব্দবিহীন সবকিছুই আমাদের জন্যে উন্মুক্ত, অবারিত। তখন কি ও এসব কিছু ভেবেছিলো? তখনও কি তার বুকের ভেতরটা এমন নিঃশব্দ যন্ত্রণায় ভরে উঠেছিলো? না। যুদ্ধলিপ্সু শত্রুর সঙ্গে জার্মানি সেদিন ছিলো একই সুতোয় গাঁথা। তাই তখন সবকিছুই মনে হয়েছিলো বুঝি স্বাভাবিক।

তারপর আফ্রিকায়। সাঁজোয়ার যান্ত্রিক আওয়াজ আর তারা-ভরা আকাশের নিচে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ওরা তখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রতিদিনই দূরত্ব আসছে কমে। তখন কি ও কিছু ভেবেছিলো? না। এমন কি সেখান থেকে পিছু হটে আসার সময়েও না। আফ্রিকা আর বিদেশী ভূখণ্ডের মাঝে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ফ্রান্স, তারপর সেখান থেকে আবার জার্মানিতে। আচ্ছা, তখন কি ভাবতে পারতো? একজন সব জায়গায়ই জিতবে এমন কোন মানে নেই, তাই না?

তারপর এলো রাশিয়া। এখানে আর মাঝখানে কোন সমুদ্র নেই। ফলে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মেখে জার্মানি পর্যন্ত পিছু হটে আসতে কোন অসুবিধেই হলো না। আফ্রিকার মতো, এখানের পরাজয় খুব সামান্য নয়—ফিরে আসতে হয়েছিলো সমগ্র জার্মান বাহিনীকেই। তখন থেকেই ও ভাবতে শুরু করেছিলো। শুধু ও একা নয়, ওর মতো আরও অনেকেই। এইটেই নিয়ম। যতক্ষণ ওরা বিজয়ী ছিলো, সবকিছু মনে হতো স্বাভাবিক। আর যা সুসংবদ্ধ নয়, তাকে উপেক্ষা করা হতো লক্ষ্যে পৌঁছবার মহতী উদ্দেশ্যের মুখ চেয়ে। লক্ষ্যে পৌঁছবার! কিসের লক্ষ্য? চিরদিনই কি এর একটা দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন আর অমানবিক নয়? তাহলে আরও আগে থেকে ও ভাবতে

শুরু করলো না কেন ? সত্যি কি ও আগে একবারও ভাবেনি ? সত্যি কি আগে বহুবার ও সন্দেহের দোলায় দোলেনি ? সত্যিই কি ও তার ব্যর্থ হতাশাকে বারবার মুছে ফেলতে চায়নি ?

কার যেন কাশির শব্দে গ্রেবার চমকে ফিরে তাকালো। দেখলো ধসে পড়া বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে জাউয়ের বড় বড় পা ফেলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক তখনই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে দক্ষিণের আকাশ থরথর করে কেঁপে উঠলো, ঠিকরে লাফিয়ে উঠলো দাউ দাউ আগুনের লেলিহান শিখা।

'এটা কি রাশিয়ানদের গোলা বলে তোমার মনে হয় জাউয়ের ? এই যে, এক্ষুনি যেটা ফাটলো ?'

জাউয়ের মাথা নাড়লো। 'না, ওটা আমাদের। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ডিনামাইট দিয়ে জায়গাটা উড়িয়ে দিচ্ছে।'

'তার মানে আমাদের আরও পিছু হটে যেতে হবে।'

'তাছাড়া আর কি ?'

দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। একটু নিস্তব্ধতার পর জাউয়ের বললো, 'দীর্ঘদিন কোথাও একটা গোটা বাড়ি চোখে পড়লো না।'

'কেন, গির্জার পাশে কম্যাণ্ডারের বাড়িটা ? ওটা এখনও কিছুটা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।'

'ওটাকে অক্ষত অবস্থা বলে না। সারা দেওয়াল মেসিনগানের গুলিতে শতছিদ্র। ছাদটা জ্বলে গেছে, কড়ি-বরগা ঝুলে পড়েছে।' জাউয়ের গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'বাড়ি তো দূরের কথা, এ অঞ্চলে কোথাও না গাছ, না একটা অক্ষত রাস্তা—কিছুই চোখে পড়লো না।'

'আমিও দেখিনি।'

জাউয়ের ঠোঁট টিপে হাসলো 'খুব শিগগিরি দেখবে, বাড়ি গিয়ে।'

'ধন্যবাদ

আকাশের বুক রাঙিয়ে-ওঠা গনগনে অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে জাউয়ের চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। 'রাশিয়াকে আমরা কিভাবে ধ্বংস করছি, মাঝে মাঝে কথাটা মনে হলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আচ্ছা, ওরা যদি আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে, তাহলে কি করবে, এ সম্পর্কে তুমি কিছু ভেবেছো ?'

'না।'

'আমি ভেবেছি।' একটু নীরবতার পর জাউয়ের বললো, 'পূর্ব প্রুসিয়ায় আমাদের একটা খামার বাড়ি আছে। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, চোদ্দ সালে রাশিয়ানরা যখন এলো, আমরা তখন সেখানে পালিয়ে গিয়েছিলুম। তখন আমার বয়েস মাত্তর দশ বছর।'

'সীমান্ত থেকে প্রুসিয়া এখনও অনেক দূরে।'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বলা যায় না। তোমার মনে পড়ে গ্রেবার, গোড়ার দিকে আমরা কি দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলুম ?'

'না। আমি তখন আফ্রিকায় ছিলুম।'

জাউয়ের দক্ষিণের আকাশে তাকালো। রূপকথার মতো চোখের নিমেষে কে যেন টকটকে লাল আগুনের একটা দেওয়াল তুলে দিলো আকাশে। আর তখনই শোনা গেলো পর পর ভারী কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। 'তুমি জানো ওখানে আমরা কি করছি ? একবার কল্পনা করো —ঠিক একই জিনিস যদি রাশিয়ানরা আমাদের দেশে করে তখন আর কোন চিহ্ন থাকবে ?'

'ওরা এখনও সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। তুমি ফুয়ারের বক্তৃতা শুনেছো ? পরশুদিন আমি শুনেছি। গোপন অস্ত্র না এসে পৌঁছনো অব্দি আমরা সীমান্তরেখা সংক্ষিপ্ত করবো। তারপর সুযোগ বুঝেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

'আরে রাখো তোমার···,' জাউয়ের অশ্লীল একটা খিস্তি দিলো। 'ওসব ছেঁদো কথায় আজকাল আর কারুর চিঁড়ে ভেজে না। একটা কথা তোমাকে আমি বাজি রেখে বলতে পারি—যখনই ওরা সীমান্ত অতিক্রম করবে, আমরা তখন ওদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হবো।'

'কেন ?'

'কেন আবার কি ? নইলে আমাদের মতন ওরাও জার্মানিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে দেবে।'

'কিন্তু ওরা যদি সন্ধি করতে রাজী না হয় ?'

'কারা ?'

'রাশিয়ানরা।'

'কেন রাজী হবে না ? আমরা প্রস্তাব করলেই ওরা রাজী হবে। যুদ্ধের চেয়ে শান্তিকে ওরা বেশি ভালবাসে। আর যুদ্ধ বন্ধ হলে আমরাও মুক্তি পাবো।'

'ওরা শান্তি চাইতে পারে তখনই, আমরা যদি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

করি। তারপর ওরা সমস্ত জার্মানি অধিকার করবে এবং সেই মুহূর্তে তুমি তোমার খামার বাড়িটাও হারাবে।'

অল্পক্ষণের জন্যে জাউয়ের বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'তোমার কথা মেনে নিলেও—আমরা যদি আত্মসমর্পণ করি, তাহলে ওরা আর কিছু ধ্বংস করবে না।' আড়চোখে ও গ্রেবারের মুখের দিকে তাকালো। 'ওদের দেশ তো বিধ্বস্ত হয়েছেই, কিন্তু আমরা থাকবো অক্ষত। তারপর একসময় না একসময় ওরা জার্মানি ছেড়ে চলে যাবে, পারতপক্ষে তখন আমরাই হবো জয়ী।'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না। ভাবলো বেশ তো এতক্ষণ ভালো মানুষের মতো চুপচাপ ছিলাম, কেন আবার এসব বলতে গেলাম? তাছাড়া অহেতুক তর্ক করে কি লাভ। সবাই জানে এরকম একটা মারাত্মক পরিবেশে এ ধরনের কথা বলা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি তুচ্ছ। তাই ও আর কোন কথা বললো না।

উলটো পথে গ্রেবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। তুষারগলা খানাখন্দগুলো পেরিয়ে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে তক্তা পাতা। খুব সন্তর্পণে পেরোতে না পারলে পিছলে পড়তে হবে সোজা গাড্ডায়।

গির্জাটা এবার ওর চোখে পড়লো। চূড়াটা উড়ে গেছে, বুলেটে বুলেটে সারা দেওয়াল পোকায়-কাটা পুরনো পোশাকের মতো ক্ষতবিক্ষত। দরজার কপাট দুটো হাট হাট করে খোলা। এর ভেতরেই রাখা হয়েছে লেফটেনান্ট রাইকের মৃতদেহ। সন্ধ্যের আগে আরও দুটো মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কম্যাণ্ডার রয়ের আদেশে ওদের তিনজনকে আগামীকাল ভোরে সামারিক মর্যাদায় কবর দেওয়া হবে। অন্য দুজনের মধ্যে একজন লান্স কর্পোরাল। তাঁকে সনাক্ত করা যায়নি। চোখ মুখ গলে গেছে। পেটের কাছটা হাঁ হয়ে রয়েছে। অন্ত্রটা নেই। খুব সম্ভব শেয়াল কিংবা ইঁদুরের কাজ। কিন্তু মাটির অত নিচে থেকে ওরা পেলো কি করে!

দরজার কপাট দুটো টেনে দিয়ে গ্রেবার এগিয়ে চললো। ধ্বংসস্তূপের আনাচে কানাচে চাপচাপ অন্ধকার। আবছা আলোয় ভুতুড়ের ছায়াগুলো যেন নড়ছে। গাটা ওর ছ্যাত করে উঠলো। অনেক অনেক দূর কোন গ্রাম থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। গ্রেবার খোঁড়া-কবরের ঢিপিটার ওপর উঠে এলো। রাইকের জন্যে খোঁড়া গর্তটা এত চওড়া যে দুজন মৃত সৈনিককে অনায়াসে পাশাপাশি শুইয়ে কবর দেওয়া যায়। ও কান পেতে

শুনলো গর্তে জল চুঁইয়ে পড়ার টিপটিপ শব্দ। যার যার নাম লেখা ক্রুশগুলো গর্তের মধ্যে আলতো করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে পরে কারুর চিনতে কোন অসুবিধে না হয়। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে, হয়তো আর কদিনের মধ্যেই গ্রামটা আবার রণাঙ্গনে পরিণত হয়ে যাবে।

ফিরে আসার সময় পায়ের চাপে কিছু মাটি ঝুরঝুর করে গিয়ে পড়লো গর্তে। জলের মধ্যে শব্দ হলো—ছল ছল ছলাত।

গ্রেবার ফিরে চললো। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। কোথাও কোন আলো নেই, না উত্তাপ। সবকিছুই কেমন যেন অপরিচিত মনে হলো। মনে হলো নিস্পন্দ নিথর আর মৃত্যুলীন। মৃত্যুর সংখ্যা এখন কম নয়। গোড়ার দিকে রাশিয়ানদের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি, কিন্তু শেষের দিকে নিজেদের সংখ্যাই বাড়তে লাগলো ক্রমশ। ফলে সেনাবাহিনীকে এখন প্রায়ই নতুন করে সাজাতে হচ্ছে নবাগত রঙরুটদের নিয়ে। কমতে কমতে পুরনো কমরেডদের সংখ্যা এখন এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে তলানিতে। ওর পুরনো দিনের সঙ্গীদের মধ্যে টিকে আছে কেবল ফোর্থ কম্পানীর কম্যাণ্ডার ফ্রেজেনবুর্গ। অন্যেরা হয় মরে গেছে, না-হয় বদলি হয়ে গেছে, না-হয় তো হাসপাতালে পড়ে পড়ে পচছে। নেহাত যাদের কপাল ভালো পঙ্গু হয়ে সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিয়েছে। সত্যি, এখানকার সবকিছু অদ্ভুত—বহুরূপীর মতো ক্ষণে ক্ষণে কেবলই রঙ পালটে চালছে।

পায়ের শব্দে গ্রেবারের চমক ভাঙলো। দেখলো জাউয়ের হনহন করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

'কি ব্যাপার জাউয়ের, কিছু হয়েছে নাকি?'

'না···মানে, একটু আগে মনে হলো কাদের যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম।'

'সে কি! কোথায়?'

'গির্জার সামনের খোলা মাঠটায়।'

'ওঃ নির্ঘাত সেই মানুষ-খেকো ইঁদুরগুলো। মড়ার গন্ধে গির্জার চার-পাশে ঘুরঘুর করছে।'

'তাই হবে!'

জাউয়েরের আড়ষ্ট ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা গেলো, ও রীতিমতো ভয় পেয়েছিলো। এবার একটু অশ্বস্ত হলো। গেরিলাদের কবরের উঁচু উঁচু ঢিপিগুলোর দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'যাক, শেষ পর্যন্ত ওরা তবু কবরের মাটি পেলো।'

'হ্যাঁ। যেহেতু আমরা ওদের কবর ওদেরকে দিয়েই খোঁড়াতে বাধ্য করিয়েছি।'

জাউয়ের খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বুক খালি করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'ওরাও একদিন ঠিক এমনিভাবে আমাদের কবর আমাদেরই খোঁড়াতে বাধ্য করাবে।'

গ্রেবার চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো। জাউয়ের অনেক দিনের পুরনো সৈনিক এবং অনেকের চেয়ে কমই ভাবপ্রবণ। তবু ওর মনে হলো দিনের চেয়ে রাত্রে মানুষের ভাবনার স্পষ্ট একটা তারতম্য আছে—যা দিনের চারিত্রিক রূঢ়তার চেয়ে অনেক কোমল, যা রাত্রে অনেক সহজে উচ্চারণ করা যায়। কেননা ঠিক এই কথাটাই যতবার ঘুরেফিরে ওর বুকের মধ্যে দানা বাঁধতে চেয়েছিলো, ও ততবারই চেয়েছিলো তাকে নির্মমভাবে মুছে ফেলতে। বোধ হয় সম্পূর্ণ পারেনি, নইলে রাত্রির ভাবনা তার বুকের অতল থেকে টেনে আনতো না এই গভীর দীর্ঘশ্বাস। 'হ্যাঁ, অপরের যন্ত্রণা কেউ বুঝতে পারে না, সে যখন নিজেই নিজের গাধার গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে মারে! থাকগে, এখনও যখন তেমন কিছু ঘটেনি তখন এসব না ভাবাই ভালো।'

'তা তো বটেই,' জাউয়ের বিহ্বল চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটার ওজন বোঝার চেষ্টা করলো। 'বিশেষ করে আমরা দুজনে যখন এই যুদ্ধ শুরু করিনি বা আমরা যখন এই যুদ্ধের জন্যে দায়ী নই। আমরা কেবল আমাদের কর্তব্য পালন করে চলেছি, তাই কিনা বলো?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই।' গ্রেবার তার ক্লান্ত আয়ত চোখের দৃষ্টি মেলে দিলো দূর অন্ধকারের দিকে।

তিন

কামানের চাপ-চাপ ধোঁয়া আর ধুলোয় ঢেকে গেছে সারা আকাশ। যেন কেশর-ফোলানো একপাল বুনো ঘোড়া তাড়া খেয়ে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। স্থির হয়ে বসে-থাকা দাঁড়কাকগুলো একটুও নড়ছে না। কবরের মধ্যে নামিয়ে রাখা হয়েছে তিনটে মৃতদেহ। চোখ মুখ গলে যাওয়া দেহটা ক্যাম্বিসের কাপড়ে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাঝখানে রাইকে। বুট-

সমেত বিচ্ছিন্ন পাটা গির্জা থেকে বয়ে আনার সময় একপাশে গড়িয়ে গিয়েছিলো। এখন আর কেউ সেটাকে নতুন করে সাজিয়ে দেয়নি।

ভিজে মাটির চাপড়ায় গর্তগুলো ভর্তি করে দেবার পরেও কিছু মাটি তখনও কবরের চারপাশে রয়ে গেলো। মুয়েকে লেফটেনাণ্ট মুয়েলারের দিকে তাকালো। 'কবরগুলো একটু পিটে দেবো, স্যর ?'

'কি ?'

'এই কবরগুলো···প্রথমে মাটি, তার ওপর কিছু পাথর চাপিয়ে দিলে শিয়াল নেকড়েতে আর টেনে বার করতে পারবে না।'

'ওরা এখানে আসবে না। কবরগুলো এমনিতেই অনেক গভীর, তাছাড়া···' মুয়েলার ভাবলেন, খোলা প্রান্তরে মানুষের মাংস খেয়ে খেয়ে শিয়াল নেকড়ের পেট এমনিতেই ভরে আছে। কবর খুঁজে মৃতদেহ টেনে বার করবার কোন মানেই হয় না। তাই তিনি একটু বিরক্ত হলেন, 'তুমি এসব মিছিমিছি ভাবছো কেন ?'

'মিছিমিছি নয়, স্যর', আহাম্মক আর কাকে বলে! মুয়েকে ভাবলো, চিরকাল অকম্মার ঢেঁকিগুলোই অফিসারের পদ পায়, আর রাইকের মতো যারা সত্যিকারের সাহসী, তারাই বীরের মতো দেশের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। মনের ভাব অবশ্য মুখে প্রকাশ হতে দিলো না। তাই ও বললো, 'এরকম অনেক ঘটেছে।'

'বেশ, যা ভালো বোঝ করো। আর মাথার দিকে ক্রুশগুলো বেশ শক্ত করে পুঁতে দিও।'

মুয়েলার তাঁর অন্য সৈন্যদের সমবেত হতে এবং কুচকাওয়াজ করে যেতে আদেশ দিলেন। আদেশটা উনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরেই উচ্চারণ করলেন। ওঁর ধারণা পুরনো সৈন্যরা ওঁকে বুঝি গুরুত্ব দিচ্ছে না। গুরুত্ব অবশ্য ওরা সত্যিই দেয় না।

জাউয়ের, ইম্মেরমান আর গ্রেবার কবরের ওপর মাটি টেনে দেওয়ার কাজে রয়ে গেলো। জাউয়ের বললো, 'এত নরম মাটি, ক্রুশগুলো এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়!'

'বেশিদিন টিকবে না।'

'বেশিদিন তো দূরের কথা, তিনদিনও টিকবে কি না দেখ।'

ইম্মেরমান ঠাট্টা করলো। 'কেন, রাইকে এসে তোমাকে বলে গেলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। যেহেতু আমরা ওদের কবর ওদেরকে দিয়েই খোঁড়াতে বাধ্য করিয়েছি।'

জাউয়ের খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বুক খালি করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'ওরাও একদিন ঠিক এমনিভাবে আমাদের কবর আমাদেরই খোঁড়াতে বাধ্য করাবে।'

গ্রেবার চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো। জাউয়ের অনেক দিনের পুরনো সৈনিক এবং অনেকের চেয়ে কমই ভাবপ্রবণ। তবু ওর মনে হলো দিনের চেয়ে রাত্রে মানুষের ভাবনার স্পষ্ট একটা তারতম্য আছে—যা দিনের চারিত্রিক রূঢ়তার চেয়ে অনেক কোমল, যা রাত্রে অনেক সহজে উচ্চারণ করা যায়। কেননা ঠিক এই কথাটাই যতবার ঘুরেফিরে ওর বুকের মধ্যে দানা বাঁধতে চেয়েছিলো, ও ততবারই চেয়েছিলো তাকে নির্মমভাবে মুছে ফেলতে। বোধ হয় সম্পূর্ণ পারেনি, নইলে রাত্রির ভাবনা তার বুকের অতল থেকে টেনে আনতো না এই গভীর দীর্ঘশ্বাস। 'হ্যাঁ, অপরের যন্ত্রণা কেউ বুঝতে পারে না, সে যখন নিজেই নিজের গাধার গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে মারে! থাকগে, এখনও যখন তেমন কিছু ঘটেনি তখন এসব না ভাবাই ভালো।'

'তা তো বটেই,' জাউয়ের বিহ্বল চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটার ওজন বোঝার চেষ্টা করলো। 'বিশেষ করে আমরা দুজনে যখন এই যুদ্ধ শুরু করিনি বা আমরা যখন এই যুদ্ধের জন্যে দায়ী নই। আমরা কেবল আমাদের কর্তব্য পালন করে চলেছি, তাই কিনা বলো?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই।' গ্রেবার তার ক্লান্ত আয়ত চোখের দৃষ্টি মেলে দিলো দূর অন্ধকারের দিকে।

তিন

কামানের চাপ-চাপ ধোঁয়া আর ধুলোয় ঢেকে গেছে সারা আকাশ। যেন কেশর-ফোলানো একপাল বুনো ঘোড়া তাড়া খেয়ে ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে। স্থির হয়ে বসে-থাকা দাঁড়কাকগুলো একটুও নড়ছে না। কবরের মধ্যে নামিয়ে রাখা হয়েছে তিনটে মৃতদেহ। চোখ মুখ গলে যাওয়া দেহটা ক্যাম্বিসের কাপড়ে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাঝখানে রাইকে। বুট-

সমেত বিচ্ছিন্ন পাটা গির্জা থেকে বয়ে আনার সময় একপাশে গড়িয়ে গিয়েছিলো। এখন আর কেউ সেটাকে নতুন করে সাজিয়ে দেয়নি।

ভিজে মাটির চাপড়ায় গর্তগুলো ভর্তি করে দেবার পরেও কিছু মাটি তখনও কবরের চারপাশে রয়ে গেলো। মুয়েকে লেফটেনান্ট মুয়েলারের দিকে তাকালো। 'কবরগুলো একটু পিটে দেবো, স্যর ?'

'কি ?'

'এই কবরগুলো···প্রথমে মাটি, তার ওপর কিছু পাথর চাপিয়ে দিলে শিয়াল নেকড়েতে আর টেনে বার করতে পারবে না।'

'ওরা এখানে আসবে না। কবরগুলো এমনিতেই অনেক গভীর, তাছাড়া···' মুয়েলার ভাবলেন, খোলা প্রান্তরে মানুষের মাংস খেয়ে খেয়ে শিয়াল নেকড়ের পেট এমনিতেই ভরে আছে। কবর খুঁজে মৃতদেহ টেনে বার করবার কোন মানেই হয় না। তাই তিনি একটু বিরক্ত হলেন, 'তুমি এসব মিছিমিছি ভাবছো কেন ?'

'মিছিমিছি নয়, স্যর', আহাম্মক আর কাকে বলে! মুয়েকে ভাবলো, চিরকাল অকম্মার ঢেঁকিগুলোই অফিসারের পদ পায়, আর রাইকের মতো যারা সত্যিকারের সাহসী, তারাই বীরের মতো দেশের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। মনের ভাব অবশ্য মুখে প্রকাশ হতে দিলো না। তাই ও বললো, 'এরকম অনেক ঘটেছে।'

'বেশ, যা ভালো বোঝ করো। আর মাথার দিকে ক্রুশগুলো বেশ শক্ত করে পুঁতে দিও।'

মুয়েলার তাঁর অন্য সৈন্যদের সমবেত হতে এবং কুচকাওয়াজ করে যেতে আদেশ দিলেন। আদেশটা উনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরেই উচ্চারণ করলেন। ওঁর ধারণা পুরনো সৈন্যরা ওঁকে বুঝি গুরুত্ব দিচ্ছে না। গুরুত্ব অবশ্য ওরা সত্যিই দেয় না।

জাউয়ের, ইম্মেরমান আর গ্রেবার কবরের ওপর মাটি টেনে দেওয়ার কাজে রয়ে গেলো। জাউয়ের বললো, 'এত নরম মাটি, ক্রুশগুলো এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়!'

'বেশিদিন টিকবে না।'

'বেশিদিন তো দূরের কথা, তিনদিনও টিকবে কি না দেখ।'

ইম্মেরমান ঠাট্টা করলো। 'কেন, রাইকে এসে তোমাকে বলে গেলেন বুঝি ?'

'বাজে বোকো না। কি জানো তুমি ওঁর সম্পর্কে? শান্তিশিবিরে গিয়ে উনি তো আর তোমার সঙ্গে দেখা করে আসেননি?'

'আচ্ছা গোঁয়ার তো! তোমার মাথায় দেখছি ওটা এখনও গজগজ করছে।' ইম্মেরমান হঠাৎ রেগে উঠলো। 'শান্তিশিবির সম্পর্কে তুমিই বা কি জানো? ওখানে তোমার চেয়ে ঢের সাচ্চা মরদের পাত্তা পাওয়া যায়, বুঝলে?'

প্রসঙ্গটা হয়তো চাপা দেবার জন্যেই গ্রেবার ওদের তাড়া লাগালো। 'নাও নাও, ক্রুশগুলোয় এবার হাত লাগাও।'

ইম্মেরমান হেসে ফেললে। 'এত তাড়াতাড়ি কিসের? বাড়ি যাবার জন্যে প্রাণটা বুঝি ছটফট করছে?'

'আর তাই বুঝি তুমি হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছো?' জাউয়ের ফোড়ন কাটলো।

'আমার যে ছুটি পাওনা নেই—সেটা তুমি ভালো করেই জানো, বিটলে বামন!'

'সে তো নিশ্চয়ই। একবার ছুটি পেলে তুমি কি আর ফিরতে, চাঁদ? সোজা পিটটান দিতে।'

জাউয়ের থুতু ফেললো।

ইম্মেরমান বাঁকা ঠোঁটে হেসে ওর মুখের দিকে তাকালো। 'হয়তো তখন দেখা যেতো একমাত্র আমিই, যে আবার স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছি।'

'হয়তো আসতে।' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো জাউয়েরের কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু কার মনে কি আছে, কেউ জোর করে বলতে পারে না।'

বেগতিক দেখে গ্রেবার নিজেই একটা ক্রুশটা বয়ে এনে ছুঁচলো দিকটা মাটিতে গেঁথে দিলো। জাউয়ের বেলচার চওড়া দিক দিয়ে কয়েক ঘা পিটলো। ক্রুশটা মাটির মধ্যে গভীরভাবে পুঁতে গেলো।

'দেখলে তো?' গ্রেবারকে ও বললো, 'আগেই বলেছিলুম না, তিনটে দিনও টিকবে না।'

'তিনদিনের এখন ঢের দেরি।' ইম্মেরমান যেন এতক্ষণ মুখিয়ে ছিলো, তাই গ্রেবার মুখ খোলার আগেই ও ঝটপট জবাব দিলো, 'বরং অভিজ্ঞ সৈনিকের উপদেশ যদি কানে নাও তো বলি, ওখান থেকে একটা পাথরের ক্রুশ তুলে এনে এখানে বসিয়ে দাও। তাতে তোমার পরিশ্রমটাও সার্থক হবে আর মৃত আত্মাও শান্তি পাবে।'

জাউয়ের চোখ কপালে তুললো। 'ওই রাশিয়ান ক্রুশ!'

'রাশিয়ান তো কি হয়েছে ? মাথায় ষাঁড়ের গোবর না থাকলে ঠিকই বুঝতে পারতে ঈশ্বরের কোন দেশ বা জাত নেই।'

'বুঝি বৈকি।' জাউয়ের বেলচার গায়ে ঠেসান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'অন্তত এটুকু বুঝি, ঈশ্বর আর যাই হোন—তোমার মতন আন্তর্জাতিক ভাঁড় নন।'

'হলে সুখী হতাম।'

গ্রেবার তার বেলচাটা মাটি থেকে তুলে নিলো। 'নাও, তোমরা এবার যত খুশি তর্ক করো। আমি চললুম।'

ইম্মেরমান মুচকি হেসে ওর দিকে আড়চোখে তাকালো। 'নাঃ, বাড়ির জন্যে বেচারার প্রাণটা সত্যিই খাবি খাচ্ছে দেখছি!'

নিচের তলার একটা কুঠরিতে সেনাবাহিনীর লোকেরা আশ্রয় নিয়েছে। ফাটা ছাদের একটা গর্ত থেকে দিনের আলো এসে পড়েছে ভেতরে। গর্তটার ঠিক নিচে চারজন গোল হয়ে বসে স্কাট্ খেলছে। কোণের দিকে দুজন নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। জাউয়ের মেঝের উপর উপুড় হয়ে চিঠি লিখছে। কুঠরিটা বেশ বড়। স্পষ্টই বোঝা যায় একসময়ে কোন জাঁদরেল লোকের সম্পত্তি ছিলো। তলাটা আবার মোজেক করা।

স্টেইনব্রেনার হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলো। 'তোমরা কেউ আজকের শেষ সংবাদটা শুনেছো নাকি ?'

'না, রেডিওটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কেন ? একটু ঠিক করে রাখতে পারো না ?'

'তোমার যদি অত মাথাব্যথা, নিজেই ঠিক করে নাও না,' ইম্মেরমান তেড়ে উঠলো। 'এটা যে দেখাশোনা করতো আজ পনেরো দিন হলো সে পটল তুলেছে।'

'কেন, এটার কি হয়েছে কি ?'

বেরনিং বললো, 'ব্যাটারি নেই।'

'ব্যাটারি নেই !'

'না।' ইম্মেরমান খেঁকিয়ে উঠলো। 'তোমার মগজে তো ঘিলুর বদলে বিদ্যুৎ ঠাসা রয়েছে, দেখো না একবার চেষ্টা করে যদি তোমার নাকের ফুটো থেকে তার বার করে রেডিওটাকে চালানো যায়।'

স্টেইনব্রেনার খানিকক্ষণ গুম মেরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর

মাথার পেছনে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'নাঃ, মাঝে মাঝে দাওয়াই না হলে দেখছি অনেকেরই তেল বাড়ে।'

'তার জন্যে আর এত ভনিতা করার দরকার কি? এর আগে তো অনেকবারই আমার নামে লাগিয়ে কত্তাদের কান ভারী করেছো, দেখো না আর একবার চেষ্টা করে?' ইম্মেরমান ঠোঁট টিপে হাসলো। 'তবে দুঃখের কথা কি জানো, ওরা ভালো করেই জানে আমার মতো ওস্তাদ মেসিনগান চালিয়ে আর একটিও নেই। তাই তোমার মতন মাই-ছাড়ানো দুধের-ছোকরার চেয়ে আমার কদর ওরা কম অনুভব করে না, বুঝলে? সত্যি ম্যাক্স, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে—অনেক চেষ্টা করে তুমি আমার একগাছা বালও ছিঁড়তে পারলে না। বলি, এখন বয়েস কত হলো?'

'চোপরাও।'

ইম্মেরমান সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না। 'কুড়ি না উনিশ? এখনও তো গোঁফ গজায়নি। অথচ এরই মধ্যে ইহুদিদের গর্ত থেকে টেনে বার করতে আর তেল লাগাবার যত রকম আদব-কায়দা রপ্ত করতে করতেই তো যৌবন পার করে দিলে। অথচ তোমার মতো বয়েসে আমরা মেয়েদের ছাড়া আর কারুর পেছনে ছুটিনি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'না, তখন তুমি জন্মাওনি।'

মুয়েকেকে এবার দরজায় দেখা গেলো। 'কি ব্যাপার, কি হচ্ছে এখানে?'

কেউ উত্তর দিলো না। নাটকটা জমে ওঠার আগে এভাবে ভেস্তে যাবে কেউ আশা করেনি।

মুয়েকে এগিয়ে এলো। 'জিজ্ঞেস করছি, কি হচ্ছে এখানে?'

'কিছু না,' বেরনিং ছিল সবচেয়ে কাছে, ও-ই উত্তর দিলো। 'এমনি সবাই গল্পগুজব করছি।'

মুয়েকে অবিশ্বাসের চোখে স্টেইনব্রেনারের দিকে তাকালো। 'কিছু হয়েছে নাকি?'

'শেষ সংবাদের খবর জিজ্ঞেস করছিলুম।'

স্টেইনব্রেনার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কেউ আর কোন দিকে তাকালো না। খেলুড়েরা যেন খেলায় কত না মগ্ন। জাউয়ের এখন চিঠি লেখায় আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলো। নিদ্রালস মানুষ দুটো সমানে নাক ডেকে চলেছে।

'তোমরা ভেবেছোটা কি?' মুয়েকের চাপা গর্জনে ঘরের ভেতরের নিস্তব্ধতা থরথর করে কেঁপে উঠলো। 'তোমরা জানো এখনকার প্রচারিত

সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকের শোনা উচিত? এটা সামরিক নির্দেশ?'

ইম্মেরমান তাস থেকে চোখ না তুলে সোজা উত্তর দিলো, 'নিশ্চয়।'

মুয়েকে চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকালো। তারপর চিৎকার করে উঠলো, 'অ্যাটেন-শন্!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেলুড়েরা তাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কেউ সামনে হাত একত্র করলো না। ভঙ্গিটা এই রকম যেন একটুও সময় নষ্ট না করে পর মুহূর্তেই ওরা আবার খেলা শুরু করতে পারে। জাউয়ের লেখা ফেলে অর্ধেক সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

স্টেইনব্রেনার কাঁধ বাঁকালো। 'এত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ অথচ কারুর শোনা হলো না। আমেরিকায় মারাত্মক ধর্মঘট···ইস্পাত শিল্পে দারুন মন্দা··· সমর উপকরণের কাজকর্ম প্রায় অচল···বিমান তৈরির কারখানায় ব্যাপক ক্ষতিসাধন···শান্তি স্থাপনের জন্যে সর্বত্র বিক্ষোভ-মিছিল···প্রশাসন ক্ষমতা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা···'

মুয়েকে হঠাৎ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। স্টেইনব্রেনার মাঝপথে বাধা পেয়ে থমকে গেলো। কেউ কোন কথা বললো না। শুধু ওপরের গর্তটা থেকে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়লো কিছু তুষারকণা।

'···অবশ্য অন্য দিকে আমাদের বিশেষ ধরনের ডুবো যুদ্ধ-জাহাজগুলো আমেরিকার সমুদ্র উপকূল প্রায় সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছে। দু জাহাজ সৈন্য এবং সমরাস্ত্র বোঝাই তিনটি বিমানকে গতকাল জলমগ্ন করা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের দুরবস্থা এখন চরম সীমায়। আমাদের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর হাতে জাহাজ চলাচল প্রায় বিধ্বস্ত। নতুন ধরনের রণকৌশলে আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। এখন আমাদের বোমারু বিমানগুলো কোথাও না থেমে আমেরিকা পর্যন্ত বোমাবর্ষণ করে আবার ফিরে আসতে পারে। আমাদের অতলান্তিক উপকূল এখন দুর্ভেদ্য এক দুর্গ বিশেষ। শত্রু যদি আক্রমণ করে, চল্লিশ সালের মতো আবার আমরা তাদের সমুদ্র অব্দি ধাওয়া করে নিয়ে যেতে পারবো। হাইল হিটলার!'

'হাইল হিটলার।' ওদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন এলোমেলো স্বরে প্রতিধ্বনি দিয়ে যেন কোন রকমে দায় সারলো।

মুয়েকে বেরিয়ে গেলো।

খেলুড়েরা আবার তাদের তাস তুলে নিলো।

ঝুরঝুর করে ঝরে পড়লো তুষারকণা।

ইম্মেরমান হঠাৎ বলে উঠলো, 'মহামান্য পার্টি সদস্যকে কি রাশিয়ার কোন খবর জিজ্ঞেস করতে পারি ?'

স্টেইনব্রেনার রেগে উঠলো, 'কেন ?'

'যেহেতু আমরা এখন রাশিয়ায়। তাছাড়া আমাদের মধ্যে কারুর কারুর হয়তো খবরটা কাজে লাগতে পারে—যেমন গ্রেবার—ও খুব শিগ্‌গিরি ছুটিতে যাচ্ছে।'

স্টেইনব্রেনার ইতস্তত করলো। কেননা ইম্মেরমানকে ও বিশ্বাস করে না। এ কথা যেমন সত্যি, অন্যদিকে আবার পার্টির প্রতি আনুগত্য তাকে সচেতন করে তুললো। তাই ও সতর্ক ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে বললো, 'রণাঙ্গনকে সংক্ষিপ্ত করার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতিতে রাশিয়া এখন সর্বস্বান্ত। এদিকে আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীকে নতুন করে সাজিয়ে নিচ্ছি। খুব শিগ্‌গির নতুন অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আমরা আবার দুর্বার গতিতে প্রতিআক্রমণের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো...', বুকের সমান্তরালে হাতটা তুলে ও আবার নামিয়ে নিলো। এবার আর হাইল হিটলার বললো না। রাশিয়া এবং হিটলার, দুটো শব্দকে ও বোধহয় একসঙ্গে মেলাতে চায়নি। তাছাড়া বাস্তব পরিস্থিতি সৈনিকদের সব জানা তাই নতুন করে আর কিছু বলার নেই। এই মুহূর্তে ওর মুখ দেখে মনে হলো ও যেন কঠিন পরীক্ষকের মুখোমুখি দাঁড়ানো কোন শান্ত সুবোধ বালক। তবু ও হাল ছাড়লো না। আগের কথার জের টেনে বলে চললো, '...এবং এর চেয়ে সঠিক খবর বেতারে প্রচার করা যায় না, অন্তত উচিতও নয়। শত্রুপক্ষ তাতে সতর্ক হয়ে যাবে। তবে এবছরেই আমরা শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবো।'

কথাটা কোন রকমে শেষ করে স্টেইনব্রেনার পাশের ঘরে কেটে পড়লো।

'বানচোৎ!' দুজনের একজন ঘুম ভেঙে জেগে কখন থেকে যে মটকা মেরে পড়েছিলো, কেউ টের পায়নি। হঠাৎ ওর সরস মন্তব্যে সবাই সেদিকে চোখ তুলে তাকালো। ও আবার দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুলো, 'শালা হারামি বাচ্ছা, সাত সকালে দিলো আমার কাঁচা ঘুমটা মাটি করে।'

হাতের তাস সাজাতে সাজাতে শনাইডার ভেংচি কাটলো, 'পরাস্ত! একবার কেন, বছরে দুবার করে আমরা ওদের পরাস্ত করবো। আহাঃ, তাস কি, যেন বাঘের বাচ্ছা! কে ডাকবে ডাকো, আমি পাশ।'

'রাশিয়া যে কি শক্ত ঠাঁই সে ওদের মাথায় ঢুকবে না,' ইম্মেরমান

বললো। 'গতবার ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধেই সেটা বোঝা গেছে। প্রথমে শত্রুকে কিছু বুঝতে দেবে না, এইটেই বলশেভিকদের সবচেয়ে বড় কৌশল।'

জাউয়ের এবার তার লেখা থেকে মুখ তুললো।' কমিউনিস্টদের নাড়িনক্ষত্র তোমরা সব জানো দেখছি।'

'নিশ্চয়ই। একদিন ওরাই ছিলো আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। তাছাড়া, ফিনল্যাণ্ডে ওদের এই চালাকির ফাঁদে পা দেবার জন্যে আমাদের রাইখমার্শাল গোয়েরিংই দায়ী, তাই নয় কি?'

'আরে বাবা, তোমাদের রাজনীতির কচকচানি এবার একটু থামাবে?' গ্রেবার এতক্ষণ চুপচাপ একমনে বসে ছিলো, এবার তেড়ে উঠলো। তোমাদের আজ কি হয়েছে বলো তো—সেই সকালে কাক ডাকতে না ডাকতে শুরু করেছো, এখনও পর্যন্ত মুখের আর বিরাম নেই?'

কেউ কোন কথা বললো না। গ্রেবারকে সবাই ভালবাসে। সবাই জানে ওকে এখন ঘাঁটানো ঠিক হবে না। সব সময় ঠাট্টা-ইয়ার্কি ও পছন্দ করে না। দেখতে দেখতে তাসের আড্ডা আবার জমে উঠলো।

কোথা থেকে যেন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ ভেসে এলো—টপ্‌টপ্‌ টপ্‌টপ্‌।

বিকেলের দিকে আহত সৈনিকরা এসে পৌঁছলো। তাদের কয়েকজনকে তক্ষুনি আবার সেই গাড়িতেই সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে গাড়িটা এঁকেবেঁকে ছুটে চললো। দূর থেকে দেখে মনে হলো—ছোট থেকে আরও ছোট হতে হতে গাড়িটা বুঝি দিগন্তের গায়েই মিলিয়ে যাবে, কোনদিন আর হাসপাতালটা খুঁজে পাবে না।

রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অন্য আহত সৈনিকরা তখন আর কেউ চেঁচাচ্ছে না। খিদেয় তৃষ্ণায় প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। শুধু দু-একজন, যাদের জন্যে অ্যাম্বুলেন্সের কোন ব্যবস্থা করা যায়নি, তাদের জন্যে গির্জার মধ্যে জরুরী অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হলো। জারের আমলের পুরনো গির্জা। ছাদটা উড়ে গেছে। তবু যথেষ্ট আলোর জন্যে দরজা জানলার কপাটগুলো সব খুলে দেওয়া হয়েছে। অসম্ভব ক্লান্ত একজন ডাক্তার, দুজন সহকারী তাকে অপারেশন টেবিলে সাহায্য করছে। এবার এক এক করে স্ট্রেচারগুলো বয়ে আনা হলো। গোধূলির রাঙা আলোয় টেবিলের ওপরের উজ্জ্বল বড় বাতিটাকে মনে হলো ঠিক যেন হলদে রঙের একটা তাঁবু। সামনের দেওয়ালে মেরী আর যিশুর পাথরের প্রতিমূর্তি। মেরী যিশুর দিকে দু হাত বাড়িয়ে আছে ন

অথচ ওঁর দুটো হাতই ভেঙে গেছে। যিশুর একটা পা নেই। টেবিলে আহতরা খুব একটা চিৎকার করছে না। তবু অস্ত্রোপচারের আগে ডাক্তার অঙ্গপ্রতঙ্গগুলো অসাড় করে নিচ্ছেন। বড় একটা কেটলিতে জল ফুটছে। ঘরের এককোণে কলায়ের বড় গামলাটা বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গে প্রায় ভরে উঠেছে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কুকুর এসে হাজির হলো। যতবারই কেউ না কেউ ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, ততবারই ও লেজ নাড়তে নাড়তে আবার দরজার কাছে ফিরে আসছে।

'এটা আবার কোত্থেকে এলো?' গ্রেবার কুকুরটাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো। ফোর্থ কম্পানীর কম্যাণ্ডার ফ্রেজেনবুর্গ আর ও, দুজনে গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলো।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরটার দিকে তাকিয়ে ফ্রেজেনবুর্গ বললো, 'বোধহয় বন থেকে?'

'বন থেকে আসবে কি করে?'

মাথা ঘোরাতেই কুকুরটা ওদের দেখতে পেলো। চকিতে কান খাড়া করে এমন ভঙ্গিতে ঝুঁকে দাঁড়ালো যেন যে-কোন মুহূর্তে ও ছুটে পালাতে পারে। কিন্তু ওরা কেউ নড়লো না। কুকুরটাও সতর্ক ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। পাটকেল রঙের ঝাকড়া ঝাঁকড়া লোম বেশ লম্বা, সরু কোমর। মাথা থেকে মুখের দিকটা ছুঁচলো হয়ে নেমে এসেছে।

ফ্রেজেনবুর্গ চুপিচুপি বললো, 'বেশ ভালো জাতের কুকুর বলে মনে হচ্ছে।'

গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি মনে হয় ও খাবার জন্যে এখানে এসেছে?'

ফ্রেজেনবুর্গ মাথা নাড়লো। 'ওদের খাবার অভাব এখানে কোথাও নেই। আমার মনে হয় পোষা, আহতদের কাউকে খুঁজতে এসেছে।'

সত্যিই তাই। অল্পক্ষণ পরে একটা স্ট্রেচার বাইরে বার করে আনা হলো। সৈনিকটা অপারেশন টেবিলেই মারা গেছে। কুকুরটা প্রথমে দুপা পেছিয়ে এলো, তারপর স্ট্রেচারের পেছন পেছন গুটিগুটি এগুলো। বাতাসে মাথা উঁচু করে দু-একবার ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করলো। একটু এগিয়ে হঠাৎ আকশের দিকে মুখ তুলে হাউহাউ করে চিৎকার করে উঠলো। তারপর চকিতে গির্জার উল্টো দিকে ছুটে পালালো।

'কুকুরটা কাঁদছিলো।'

'হ্যাঁ।' ফ্রেজেনবুর্গ ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'ওটা কিন্তু সত্যিই ভালো জাতের কুকুর।'

'এবং যথারীতি মানুষ-থেকো।'

ফ্রেজেনবুর্গ ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমরা সবাই তাই।'

'কেন ? অন্য মানুষদের চাইতেই আমরা কি ভিন্ন ?'

'ঠিক তা নয়, এর্নস্ট। আমরা আমাদের মানবিক মূল্যবোধটাই হারিয়ে ফেলেছি। এই দশ বছর আমরা সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন—বিচ্ছিন্ন এমন একটি নারকীয় পরিবেশে, যেখানে অযথা ঔদ্ধত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আকাশে।' ফ্রেজেনবুর্গ বাঁকা ঠোঁটে হাসলো। ঘৃণায় কুঁচকে উঠলো ওর আয়ত চোখদুটি। 'অথচ আমরাই গর্ব-অন্ধ জাতীর বর্ণশ্রেষ্ঠদের ডেকে এনে বসিয়েছি শোষণের সিংহাসনে। ক্রীতদাসের মতো সহ্য করেছি ওদের ভণ্ডামি। কিন্তু তার বিনিময়ে কি পেলাম ? নিশ্চয়ই, এ প্রশ্ন এখন করার সময় এসেছে বইকি, এর্নট।'

নিজের মনে এ প্রশ্ন বারবার করেছে। কিন্তু কোন উত্তর পায়নি। তাই গ্রেবার অবাক চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। শুধু বয়েসেই বড় নয়, ফ্রেজেনবুর্গ আশপাশের একমাত্র মানুষ, যাকে ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। তাছাড়া ওরা দুজনে একই শহরের পুরনো বাসিন্দা এবং পরস্পরে দীর্ঘদিনের চেনাজানা। 'তুমি যদি সব জানতে তাহলে তুমি এখানে কেন এলে, ফ্রেজেনবুর্গ ?'

ফ্রেজেনবুর্গ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এলাম, যেহেতু যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার অপরাধে গুলি খেয়ে বা বন্দীশিবিরে পচে মরতে রাজী নই।'

'না, আমি তা বলছি না। স্বেচ্ছায় রাজী না হলে, উনচল্লিশ সালে বয়সের অজুহাতে তুমি নিশ্চয়ই এড়িয়ে যেতে পারতে।'

'হয়তো পারতাম। যদিও এখন আমার চেয়ে অনেক বেশি বয়েসের লোকদের জোর করে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে, তবু এটা কোন উল্লেখযোগ্য কারণই নয়। আমার আসা বা না-আসাতে কোন সমস্যারই সমাধান হতো না। তাছাড়া যুদ্ধের এই বিপদের মুহূর্তে আমি চাইনি আমার জন্মভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও পালাতে—সে যার দোষ কিংবা যেকোন কারণেই হোক না কেন। এবং তা করলে, সেইটেই হতো মিথ্যে অজুহাত।'

প্রতিটা শব্দের অর্থ গ্রেবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো। কিন্তু কি বলবে কিছু ভেবে পেলো না।

গোধূলির রাঙা আলোয় গাঢ় হয়ে উঠলো দিগন্ত।

ফ্রেজেনবুর্গ ম্লান হেসে ওর দিকে তাকালো। 'যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, এর্নস্ট। দায়িত্বশীল যেকোন সেনাপতি ইচ্ছে করলে অনেক আগেই ফিরে

আসতে পারতেন। এখানে আমরা অর্থহীন যুদ্ধ করছি—সম্পূর্ণ অর্থহীন। এমনকি আত্মসমর্পণের সহ্যসীমাও আমরা অতিক্রম করে গেছি। ওরা আমাদের সঙ্গে আর কোনদিনই সন্ধির কথা বলবে না। আমরা ওদের সঙ্গে অ্যাটিলা কিংবা চেঙ্গিস খাঁর মতো ব্যবহার করেছি। যাকিছু যুক্তি, যাকিছু মানবিক অধিকার আমরা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছি। আমরা…'

'না, আমরা নই।' গ্রেবার প্রতিবাদ করলো। 'এর জন্যে দায়ী এস এস সৈন্যরাই।'

কথাটা বলতে পেরে গ্রেবার যেন একটু স্বস্তি পেলো। এতক্ষণ ও হাঁপিয়ে উঠেছিলো, বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথা টনটন করছিলো। সত্যি, ফ্রেজেনবুর্গকে যে-কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, ইম্মেরমান, জাউয়ের কিংবা হির্শলাণ্ডকে তা বলা যায় না। শুধু আজ নয়, অতীতেও কতদিন দুজনে একসঙ্গে গল্প করতে করতে নদীর বাঁধ ধরে এগিয়ে গেছে। যদিও সেদিন আর আজকের দিনের মধ্যে অনেক তফাত, তবু সেই পিছু হটার সময় থেকে ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তাই প্রাণখুলে দুদণ্ড শান্তিতে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য ও ভেবেছিলো বাড়িতে ফিরে একা একা নিরিবিলিতে বসে এসব ভাববে। কেননা এখানের কোন কিছুর ওপর ও তেমন আস্থা রাখতে পারেনি।

'আলবত!' ম্লান গোধূলি আলোয় ফ্রেজেনবুর্গের চোখদুটো চকচক করে উঠলো। 'এস এস, গেস্টাপোর মতো নচ্ছার কতকগুলো খুনে বদমাশের জন্যে আমরা এখনও যুদ্ধ করছি, যাতে ওরা আরও কিছুদিন লোভের আসনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে পারে। অথচ যুদ্ধে আমরা অনেক আগেই হেরে গেছি।'

বাইরে এখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। গির্জার দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে বাইরে না আলো এসে পড়ে। জানলায় দু-একজনকে কালো পর্দা টাঙাতে দেখা গেলো। কুঠরিতে প্রবেশের মুখটাও ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

গ্রেবার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে ফ্রেজেনবুর্গের দিকে এগিয়ে ধরলো। ফ্রেজেনবুর্গ হাতটা সরিয়ে দিলো। 'ওটা তুমি রেখে দাও, আমার অনেক আছে।'

গ্রেবার মাথা নাড়লো। 'উঁহু, একটা অন্তত নিতেই হবে।'

ফ্রেজেনবুর্গ একটা সিগারেট তুলে নিলো। 'কবে ছুটিতে যাচ্ছো?'

নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে গ্রেবার দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা ওর

দিকে তুলে ধরলো। 'ঠিক জানি না। কাগজপত্তর তো এখনও কিছু এসে পৌঁছয়নি।' বড় বড় কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়াটা ও ফুসফুসের মধ্যে চালান করে দিলো, তারপর গলগল করে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো। ঠিক এমন একটা পরিবেশে সিগারেটটাকে ও দারুণ ভালবেসে ফেললো। মাঝে মাঝে সিগারেট বন্ধুর চাইতেও অন্তরঙ্গ এবং অপরিহার্য, অন্তত কম বিপজ্জনক তো বটেই। তাছাড়া বিদেশের এই সিগারেটটা সত্যিই চমৎকার। 'কবে যে এসে পৌঁছবে, তাও জানি না। কিছু দিন হলো আমার যেন আর কিচ্ছু জানতে ইচ্ছে করছে না। আগে যা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, এখন যেন সেগুলো সব গুলিয়ে ফেলছি—যেন এক যুগ পর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। সত্যি, ভাবতেও লজ্জা করে!'

'এ লজ্জা শুধ্ তোমার একার নয়, এর্নস্ট।' ফ্রেজেনবুর্গ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ওর কাঁধ ধরে নাড়া দিলো। যেন ও নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙাতে চায়। 'এ লজ্জা আমাদের এই অরণ্য-আদিম বর্বরতার। যুদ্ধের শুকনো প্রচার আমাদের দু কানে এমন ঠেসে ঢোকানো হয়েছে, যাতে নতুন কিছু শুনতে না পাই। বিদ্বেষে বিদ্বেষে আমাদের মানবিক সত্তাকে বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সুস্থভাবে কিছু ভাববার কোন অবকাশ না পাই। যাগ্‌গে ওসব কথা···তুমি তো পোলমানকে চেনো, এর্নস্ট তাই না?'

'নিশ্চয়ই! উনি আমার ইতিহাসের মাস্টারমশাই ছিলেন।'

'বাড়ি ফিরে যদি সম্ভব হয়, ওঁর সঙ্গে একবার দেখা কোরো। হয়তো উনি এখনও বেঁচে আছেন। ওঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানিও।'

'নিশ্চয়ই জানাবো। কিন্তু উনি তো সৈনিক নন।'

'না।'

'ওঁর বয়েসও এমন একটা কিছু খুব বেশি হয়নি। তাহলে বেঁচে না থাকার কি কারণ থাকতে পারে?'

এই মুহূর্তে ফ্রেজেনবুর্গ কোন উত্তর দিলো না। একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'তুমি ওঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বলবে আমি ভালো আছি।'

'বলবো।'

'এবার তাহলে আমি চলি, এর্নস্ট। আর হয়তো আমাদের কোনদিন দেখা নাও হতে পারে।'

'অন্তত ছুটি থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তো বটেই। তবে সেও খুব বেশি দিনের জন্যে নয়, মাত্র তিন সপ্তার ছুটি।'

'নিশ্চয়ই, তিন সপ্তার ছুটি কিছুই নয়।' ফ্রেজেনবুর্গ গ্রেবারের একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো। 'আমি এবার চলি, এর্নস্ট। নিজের শরীরের যত্ন নিও। বিদায়।'

'বিদায়।'

ফ্রেজেনবুর্গ ফিরে গেলো। ওদের সৈন্যবাহিনী আশ্রয় নিয়েছে পাশের গ্রামে, ভেঙে-পড়া ঘরবাড়ির নিচে। আবছা আঁধারে ওকে যতক্ষণ দেখা গেলো, গ্রেবার সেদিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর ফিরে এলো। গির্জার সামনের কপাট চুঁইয়ে সামান্য আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। ভেতরের অনেকটা অংশ এখনও অক্ষত। কেউ যদি না ভাবে কেন এখানে আছি, তাহলে অনেকটা বাড়িরই মতো মনে হবে। গ্রেবার তার কুঠরির দিকে এগিয়ে চললো। গলা-তুষারের নিচে থেকে আরও তিনটে অক্টোবরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের পাশেই শোয়ানো রয়েছে আহতদের মধ্যে আজ বিকেলে যারা মারা গেছে তাদের দেহগুলো। ডান দিকে বাঁক নিতেই গ্রেবার চমকে উঠলো। দেখলো পান্নার মতো নীলচে দুটো চোখ অন্ধকারে ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। তাড়া দিতেই চোখদুটো অন্ধকারে চট্ করে মিলিয়ে গেলো।

চার

ওদের ঘুম ভেঙে গেলো। মাটির নিচে কুঠরিটা থরথর করে কাঁপছে। ওরা কান খাড়া করলো। দেওয়াল থেকে চুনবালি ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে। গ্রামের ওপার থেকে একটানা ভেসে আসছে শত্রু-বিমান-বিধ্বংসী কামানের ক্রুদ্ধ গর্জন। রঙরুটদের মধ্যে থেকে কে যেন বললো, 'বাইরে চলো।'

'খবদ্দার! কেউ আলো জ্বালবে না।'

'বাইরে, ইঁদুরের গর্ত থেকে সব বাইরে চলো।'

'কোথাকার গবেটার এটা!'

'এখনও রঙরুট বুঝি?'

'বাইরে কোথায় যাবে, চাঁদু?'

'হুঁউ, অত ধমকিও না। প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলবে।'

'কি হচ্ছে কি? চুপ, চুপ করো সব।'

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে কুঠরিটা আবার থরথর করে কেঁপে উঠলো। অন্ধকারে ওপর থেকে কি যেন একটা ভেঙে পড়লো। চিড়-খাওয়া কড়ি-বরগার মধ্যে দিয়ে ম্লান এককালি আলোর রেখা চলকে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতরে। বাইরে সবে তখন ভোর হচ্ছে।

'হুঁশিয়ার হো ভাই সব, হুঁশিয়ার হো!' বাইরে থেকে কে যেন সতর্ক করে দিলো।

'কেন, কেউ এখানে চাপা পড়েছে নাকি?'

'আচ্ছা পাঁঠা তো! ছাদের ওপর থেকে শুধু পলস্তারা খসে পড়েছে।'

প্রবেশ পথের সামনে অস্পষ্ট কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে নড়তেচড়তে দেখা গেলো। বাইরে থেকে সেই কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বললো, 'যে যেখানে আছো, চুপ করে থাকো। বাইরে বোমার টুকরোর চেয়ে ওখানে অনেক নিরাপদ।'

অনেকে ওর কথা কানেই তুললো না। মাটির নিচের এই কুঠরিটাকে ওরা ঠিক ভরসা করতে পারছিলো না। সিমেন্টের জমানো ছাদ হলে তবু না হয় কথা ছিলো। তবু চুপ করে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। সৈনিক বাঁচে কপালের জোরে। ভাগ্যে যদি থাকে, এ যাত্রায় টিঁকে গেলে।

ওরা অপেক্ষা করলো। রুদ্ধশ্বাসে ওরা অপেক্ষা করে রইলো পরবর্তী বিস্ফোরণের আশঙ্কায়। যে-কোনো মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ঘটলো না। বরং একটানা অস্পষ্ট ভেসে-আসা বিস্ফোরণমালা এখন শোনা গেলো অনেক অনেক দূরে।

'অপদার্থ!' কে যেন জোরে জোরে বললো, 'শত্রুকে তাড়া-করে-ফেরা আমাদের বিমানগুলো যে এখন কোন চুলোয় কে জানে!'

'হয়তো এখন ইংল্যাণ্ডে।'

'চুপ করো,' মুয়েকে ধমক দিলো।

ইম্মেরমান বললো, 'হয়তো এখন স্তালিনগ্রাদের আকাশে ধাওয়া করে ফিরছে।'

'চোপরাও!'

এমন সময় দূর থেকে বিমানের গুরুগুরু গর্জন শোনা গেলো।

স্টেইনব্রেনার বললো, 'এগুলো আমাদের বিমান।'

সবাই কান খাড়া করে শুনলো। বাইরে গুরুগুরু শব্দের মধ্যে হঠাৎ মেসিন্‌গানগুলো গর্জে উঠলো। ঠিক তখনই শোনা গেলো পর পর

তিনটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। খুব কাছেই। অস্পষ্ট একটা আলোর ঝাপটায় কেঁপে উঠলো ভেতরের তরল অন্ধকার। যেন স্বপ্নের মধ্যে তিরতির করে কেঁপে গেলো হালকা নীল লাল হলদে রঙের ঢেউগুলো আর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ছিটকে লাফিয়ে উঠলো, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো সীমাহীন গাঢ় অন্ধকারে। একটু স্থির হবার পর বাইরে থেকে ভেসে এলো আর্তনাদ আর এপারে দেওয়াল ধ্বসে পড়ার ভীষণ আওয়াজ। চোখের নিমেষে গ্রেবার বুকে হেঁটে ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে দিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলো। ধুলোবালি ঝেড়ে ও যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। গির্জাটা ছাড়া আর সবকিছুই ওর চোখের সামনে থেকে ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেন ধ্বংসের এই পৃথিবীতে ও একা। চোখ ধাঁধানো আলোয় কুঠরির প্রবেশ-পথটা আবছা চোখে পড়লো। তার সামনে কালো কালো ছায়ার মতন কি যেন সব নড়ছে।

'শালার সরষে ফুল কাকে বলে এই প্রথম চোখে দেখলাম!' জাউয়ের কখন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গ্রেবার টেরও পায়নি। তাই জাউয়েরের কণ্ঠস্বরে ও ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলো। 'আমি তো ভাবলাম সারা কুঠরিটাই বুঝি মাথার ওপরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো।'

বাইরে কাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলো এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। গ্রেবার মুয়েকেকে ছুটে আসতে দেখলো। সম্ভবত কোন কিছুর আঘাতে ওর কপার ফেটে গেছে। গাল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। হাত নেড়ে নেড়ে ও চিৎকার করে বললো, 'সবাই বাইরে বেরিয়ে এসো। প্রত্যেকে। ওদের খুঁজে বার করতে হবে···জলদি···কে কে চাপা পড়েছে কেউ জানো?'

কেউ উত্তর দিলো না। দেওয়া সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ অবান্তর প্রশ্ন।

বড় বড় পাথরের চাঁই আর লোহার বিমগুলো জোড়ের মুখ থেকে খুলে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে। ভেতরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু চাপচাপ অন্ধকার আর মাথার ওপরে ধোঁয়ায়-ঢাকা এক চিলতে বিবর্ণ আকাশ। তখনও দূর থেকে শোনা যাচ্ছে বিস্ফোরণের চাপা গুমগুম আওয়াজ।

খানিকটা চুনবালি, ভাঙা পাথরের টুকরো সরিয়ে গ্রেবার অগেই গুঁড়ি মেরে ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। এবার মাটির ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ও খুঁজতে শুরু করলো। একটু পরে হঠাৎ ও শুনতে

পেলো একটা চাপা গোঙানির শব্দ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর হাত গিয়ে পড়লো কার যেন শরীরে। একটা হাত। হাতটা মৃদু নড়ছে। গ্রেবার চিৎকার করে উঠলো, 'এই যে, এখানে একজন।' অন্ধকারেই ধুলোবালির মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ও মাথাটা খোঁজার চেষ্টা করলো। পেলো না। তখন হাতটা ধরে টানলো। 'কি ব্যাপার! এই যে! কোথায় তুমি? কিছু বলো?'

চাপা-পড়া মানুষটা যন্ত্রণায়-ভেজা আর্তস্বরে কি যেন বললো। কিন্তু ঠিক তখনই আকাশ বিদীর্ণ করা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে গ্রেবার কিছু শুনতে পেলো না। তবু গলার স্বরের দূরত্ব আন্দাজ করে গ্রেবার ওর মুখটা খুঁজে পেলো। হ্যাঁ, এই তো! গ্রেবার আবার চিৎকার করে বললো, 'এই যে, এখানে একজন। তোমরা কেউ আমাকে সাহায্য করো।'

ওদিকের কোণে দুটি ছায়ামূর্তিকে নড়তে দেখা গেলো। কণ্ঠস্বরে গ্রেবার স্টেইনব্রেনারকে চিনতে পারলো। 'তুমি ওখানেই থাকো। মাথাটা একটু তুলে রাখো, আমরা এদিক থেকে টেনে বার করার চেষ্টা করছি।'

গ্রেবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো, তারপর একপাশ থেকে ডান হাতটা চালিয়ে দিলো ওর মাথার নিচে। অন্য দুজন অন্ধকারেই দ্রুত হাতে ভাঙা দেওয়ালের ইঁট পাটকেল সরাতে শুরু করলো। জাউয়ের জিজ্ঞেস করলো, 'কে, চিনতে পেরেছো নাকি?'

'না।'

এবার হির্শলাণ্ড এসে ওদের সঙ্গে হাত লাগালো। সম্ভবত পাদুটো ওরা খুঁজে পেয়েছে। গ্রেবার ওদের সাবধান করে দিলো, 'খুব জোরে টেনো না, হাতটা ভীষণ মুচড়ে রয়েছে।'

স্টেইনব্রেনার জিজ্ঞেস করলো, 'বেঁচে আছে তো?'

গ্রেবার বাঁ হাত দিয়ে ওর মুখটা স্পর্শ করলো। নাকের কাছে আঙুল রাখলো। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। মিনিট দুয়েক আগেও বেঁচে ছিলো।'

বাইরে আবার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলো। গ্রেবার ঝুঁকে পড়ে মুখটা ওর মুখের কাছে নিয়ে এলো। 'এই যে, শুনতে পাচ্ছো? কোন ভয় নেই, এক্ষুনি আমরা তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবো! কি বলছি, বুঝতে পারছো?'

বোধহয় ও কিছু বুঝতে পেরেছিলো। গ্রেবারের মনে হলো চিবুকে ও যেন মৃদু একটা নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করলো। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারলো না। ওদিকে স্টেইনব্রেনার, জাউয়ের আর হির্শলাণ্ড তখন রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছে।

'না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'অসম্ভব! এভাবে হবে না।' জাউয়ের কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'এত বড় লোহার বিম যন্ত্রপাতি ছাড়া সরানো যাবে না। তাছাড়া আলো চাই।'

'যাও না মুয়েকের কাছে, আলো নেওয়া তোমার বার করে দেবে।'

সবাই জানে বিমান আক্রমণের সময়ে আলো জ্বালানো নিষিদ্ধ। শুধু নিষিদ্ধই নয়, এখন আলো জ্বালানো মানে মুহূর্তের মধ্যে সবায়ের মৃত্যুকে নিঃশব্দে ডেকে আনা।

'তাহলে এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই!'

'তাইতো দেখছি।'

গ্রেবার দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালো। যেন স্পষ্ট করে কিছু চিনতে পারলো না। শুধু শুনতে পেলো আকাশের বুক বিদীর্ণ করে যাওয়া বিরামবিহীন শব্দের তরঙ্গমালা আর অদৃশ্য মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। ওর কাছে এসব কিছুই নতুন নয়। এর আগেও বহুবার ও ঠিক এমনিভাবে প্রতীক্ষা করে থেকেছে।

গ্রেবার আবার অজানা মানুষটার ওপর ঝুঁকে এলো। সন্তর্পণে হাত রাখলো ওর মুখে। স্পর্শ করলো ঠোঁট দুটো। মুখটা অল্প হাঁ-হয়ে রয়েছে। হঠাৎ ও আঙুলে দাঁতের খুব সামান্য একটা চাপ অনুভব করলো। চাপটা একটু বাড়লো। তারপরেই শিথিল হয়ে গেলো। গ্রেবার বললো, 'এ এখনও বেঁচে আছে!'

'কাউকে বলো শিগ্‌গির দুটো শাবল নিয়ে আসতে।'

ভাঙা ইটকাঠ পাথরের মধ্যে থেকে লোকটাকে যখন উদ্ধার করা হলো, সবাই চিনতে পারলো। লেমারস্। চোখে চশমা, বেতের মতো লিকলিকে লম্বা চেহারা। চশমাটা সম্ভবত কোথাও ছিটকে পড়েছিলো। পরিষ্কার একটা জায়গা থেকে ওটাকে খুঁজে পাওয়া গেলো—সম্পূর্ণ অক্ষত, এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি।

কেবল লেমারস্‌ই শুধু মারা গেছে।

শনাইডার আর গ্রেবাবের এখন পাহারা দেবার সময়। ওরা বেরিয়ে পড়লো। এলোমেলো বাতাস বইছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। গির্জার একটা দিক সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। গ্রেবার স্তব্ধ বিস্ময়ে সেদিকে তাকালো। কম্যাণ্ডার রায়ের কিছু হয়নি তো! অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই ও স্বস্তি

পেলো, দেখলো ভেতরের আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে কম্যাণ্ডার রায়ে নিজে গির্জার উদ্ধার কাজ দেখাশোনা করছেন। আহতদের আগেই বাইরে বার করে আনা হয়েছিলো। কয়েকজন ইতিমধ্যেই মারা গেছে। বাকিদের কম্বল কিংবা ক্যানভাসের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। বিমান আক্রমণের ভয়ে আতঙ্ক-বিহ্বল চোখে ওরা অপলক আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বোমায় বিধ্বস্ত বড় বড় গর্তগুলো এড়িয়ে দুজনে এগিয়ে চললো। গর্তের ভেতরে চাপ চাপ জমাট অন্ধকার। অল্প অল্প কুয়াশা পড়েছে। পাহাড়ের গায়ে যেখানে কবরগুলো খোঁড়া হয়েছিলো, তার পাশে ছোট গর্তটা দেখিয়ে শনাইডার বললো, 'এই গর্তটাকে আমরা কবর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তাছাড়া এতগুলো মৃতদেহের জন্যে আলাদা আলাদা করে কবর খুঁড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে।'

গ্রেবার মাথা নাড়লো। 'তা হয় না। গর্তটা ভর্তি করার মতো অত মাটি কোথায় পাবে?'

'কেন, গর্তটার চারপাশ থেকে!'

'ওতে হবে না। গর্তটা কত গভীর সে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। এর চাইতে নতুন কবর খুঁড়ে নেওয়া অনেক সোজা।'

ওরা এগিয়ে চললো। গ্রেবার দেখলো রাইকের কবর থেকে ক্রুশটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ছিটকে কোথায় পড়েছে কে জানে। শনাইডার হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। দুজনেই কান পেতে শুনলো সীমান্তে গোলাগুলি ছোটার শব্দ। আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো চোখের নিমেষে সারাটা সীমান্ত যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। একটা প্যারাস্যুট জ্বলতে জ্বলতে নিচে নেমে গেলো। দিগন্তের গায়ে কারুকার্য করা জ্বলন্ত নক্ষত্রের মতো ফুটে উঠছে রকেটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণে ভারী হয়ে উঠছে আকাশের বুক, তার সঙ্গে মাইনের চাপা গুমগুম আওয়াজ।

'ভারী কামানের শব্দ বলে মনে হচ্ছে!' শনাইডার বললো, 'তার মানে সীমান্তের জন্যে আবার আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ছুটির ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেছে নাকি?'

'হুঁ।'

গ্রেবার কান পেতে শুনলো। শনাইডার ঠিকই বলেছে। সারা সীমান্ত জুড়ে ভারী কামানের প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে আসল ঝড়ের ঝাপটাটা এসে পড়বে খুব শিগ্‌গির। হয়তো কাল ভোরেই। এখন ঘন কুয়াশায় চারদিকের

'না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'অসম্ভব! এভাবে হবে না।' জাউয়ের কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'এত বড় লোহার বিম যন্ত্রপাতি ছাড়া সরানো যাবে না। তাছাড়া আলো চাই।'

'যাও না মুয়েকের কাছে, আলো নেওয়া তোমার বার করে দেবে।'

সবাই জানে বিমান আক্রমণের সময়ে আলো জ্বালানো নিষিদ্ধ। শুধু নিষিদ্ধই নয়, এখন আলো জ্বালানো মানে মুহূর্তের মধ্যে সবায়ের মৃত্যুকে নিঃশব্দে ডেকে আনা।

'তাহলে এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই!'

'তাইতো দেখছি।'

গ্রেবার দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালো। যেন স্পষ্ট করে কিছু চিনতে পারলো না। শুধু শুনতে পেলো আকাশের বুক বিদীর্ণ করে যাওয়া বিরামবিহীন শব্দের তরঙ্গমালা আর অদৃশ্য মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। ওর কাছে এসব কিছুই নতুন নয়। এর আগেও বহুবার ও ঠিক এমনিভাবে প্রতীক্ষা করে থেকেছে।

গ্রেবার আবার অজানা মানুষটার ওপর ঝুঁকে এলো। সন্তর্পণে হাত রাখলো ওর মুখে। স্পর্শ করলো ঠোঁট দুটো। মুখটা অল্প হাঁ-হয়ে রয়েছে। হঠাৎ ও আঙুলে দাঁতের খুব সামান্য একটা চাপ অনুভব করলো। চাপটা একটু বাড়লো। তারপরেই শিথিল হয়ে গেলো। গ্রেবার বললো, 'এ এখনও বেঁচে আছে!'

'কাউকে বলো শিগ্‌গির দুটো শাবল নিয়ে আসতে।'

ভাঙা ইটকাঠ পাথরের মধ্যে থেকে লোকটাকে যখন উদ্ধার করা হলো, সবাই চিনতে পারলো। লেমারস্। চোখে চশমা, বেতের মতো লিকলিকে লম্বা চেহারা। চশমাটা সম্ভবত কোথাও ছিটকে পড়েছিলো। পরিষ্কার একটা জায়গা থেকে ওটাকে খুঁজে পাওয়া গেলো—সম্পূর্ণ অক্ষত, এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি।

কেবল লেমারস্‌ই শুধু মারা গেছে।

শনাইডার আর গ্রেবাবের এখন পাহারা দেবার সময়। ওরা বেরিয়ে পড়লো। এলোমেলো বাতাস বইছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। গির্জার একটা দিক সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। গ্রেবার স্তব্ধ বিস্ময়ে সেদিকে তাকালো। কম্যাণ্ডার রায়ের কিছু হয়নি তো! অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই ও স্বস্তি

পেলো, দেখলো ভেতরের আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে কম্যাণ্ডার রায়ে নিজে গির্জার উদ্ধার কাজ দেখাশোনা করছেন। আহতদের আগেই বাইরে বার করে আনা হয়েছিলো। কয়েকজন ইতিমধ্যেই মারা গেছে। বাকিদের কম্বল কিংবা ক্যানভাসের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। বিমান আক্রমণের ভয়ে আতঙ্ক-বিহ্বল চোখে ওরা অপলক আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বোমায় বিধ্বস্ত বড় বড় গর্তগুলো এড়িয়ে তুজনে এগিয়ে চললো। গর্তের ভেতরে চাপ চাপ জমাট অন্ধকার। অল্প অল্প কুয়াশা পড়েছে। পাহাড়ের গায়ে যেথানে কবরগুলো খোঁড়া হয়েছিলো, তার পাশে ছোট গর্তটা দেখিয়ে শনাইডার বললো, 'এই গর্তটাকে আমরা কবর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তাছাড়া এতগুলো মৃতদেহের জন্যে আলাদা আলাদা করে কবর খুঁড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে।'

গ্রেবার মাথা নাড়লো। 'তা হয় না। গর্তটা ভর্তি করার মতো অত মাটি কোথায় পাবে?'

'কেন, গর্তটার চারপাশ থেকে!'

'ওতে হবে না। গর্তটা কত গভীর সে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। এর চাইতে নতুন কবর খুঁড়ে নেওয়া অনেক সোজা।'

ওরা এগিয়ে চললো। গ্রেবার দেখলো রাইকের কবর থেকে ক্রুশটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ছিটকে কোথায় পড়েছে কে জানে। শনাইডার হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। তুজনেই কান পেতে শুনলো সীমান্তে গোলাগুলি ছোটার শব্দ। আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো চোখের নিমেষে সারাটা সীমান্ত যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। একটা প্যারাস্যুট জ্বলতে জ্বলতে নিচে নেমে গেলো। দিগন্তের গায়ে কারুকার্য করা জ্বলন্ত নক্ষত্রের মতো ফুটে উঠছে রকেটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণে ভারী হয়ে উঠছে আকাশের বুক, তার সঙ্গে মাইনের চাপা গুমগুম আওয়াজ।

'ভারী কামানের শব্দ বলে মনে হচ্ছে!' শনাইডার বললো, 'তার মানে সীমান্তের জন্যে আবার আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ছুটির ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেছে নাকি?'

'হুঁ।'

গ্রেবার কান পেতে শুনলো। শনাইডার ঠিকই বলেছে। সারা সীমান্ত জুড়ে ভারী কামানের প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে আসল ঝড়ের ঝাপটাটা এসে পড়বে খুব শিগ্‌গির। হয়তো কাল ভোরেই। এখন ঘন কুয়াশায় চারদিকের

দৃশ্যাবলী, সারাটা পৃথিবী যেন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কুয়াশা হয়ে উঠবে দুর্ভেদ্য। আর এই গাঢ় কুয়াশার আড়ালে আত্মগোপন করে রাশিয়ানরা এগিয়ে আসবে। তারপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, দুসপ্তা আগে ঠিক যেমন একবার করেছিলো। সেবার নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো বিয়াল্লিশে।

গ্রেবার প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি ওর ছুটি মঞ্জুর হবে। কেননা এ সময়ে ছুটি পাওয়া সত্যিই কল্পনাতীত। এমনকি বাড়িতে বাবা-মার কাছে ও কোন খবরও পাঠায়নি। সৈনিক জীবনে ও মাত্র দুবার বাড়িতে যেতে পেরেছিলো। শেষবারের ছুটিটা আজ ওর কাছে অতীত স্বপ্নের মতো ম্লান মনে হয়। দুবছর যেন বিগত দুটি যুগ। তবু আজকাল ওর আর খারাপ লাগে না। হতাশাও না। শুধু বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা যেন কেবলই আর্তনাদ করে ওঠে।

'তুমি কোন দিকে যাবে ?' শনাইডার জিজ্ঞেস করলো।

'জানি না। যেদিকে হোক গেলেই হলো।'

'বেশ। তাহলে তুমি ডান দিকে যাও, আমি বাঁ দিকে যাচ্ছি।'

দেখতে দেখতে কুয়াশা গাঢ় হয়ে উঠলো। শনাইডারকে এখন আর দেখা গেলো না। গ্রেবার ডান দিকের পথ ধরে এগিয়ে চললো। ক্ষণে ক্ষণে হালকা কুয়াশায় ও ঢেকে যাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে সীমান্তের রাঙা আলোয় আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। গোলাগুলির শব্দ এখন আরও কাছে আরও স্পষ্ট মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ হাঁটছে ওর খেয়াল নেই, হঠাৎ চমক ভাঙলো পরপর দুটি গুলির শব্দে। ভাবলো, শনাইডার হয়তো ভয় পেয়েছে। ঠিক তখনই শুনলো আর একটা গুলির শব্দ এবং চাপা আর্তনাদ। গ্রেবার সতর্ক হয়ে উঠলো। কুয়াশার মধ্যে গুঁড়ি মেরে শব্দ আন্দাজ করে ও এগলো। শক্ত মুঠোয় উদ্ধত রাইফেল। শব্দটা আরও কাছে মনে হলো। কে যেন ওর নাম ধরে ডাকলো। গ্রেবার উত্তর দিলো।

'তুমি কোথায় ?'

'এখানে।'

কুয়াশার মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে ও সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপরেই চট করে একপাশে সরে দাঁড়ালো। না, কেউ গুলি করলো না। এবার কণ্ঠস্বরে ও স্টেইনব্রেনারকে চিনতে পারলো। 'কি ব্যাপার ?'

'শয়তানগুলো শনাইডারের মাথায় গুলি করেছে।'

গাঢ় কুয়াশার মধ্যে ঘাপটি মেরে গেরিলারা কখন এগিয়ে এসেছে কেউ টেরও পায়নি। শনাইডারের লালচে দাড়ি খুব সহজেই এদের চোখে পড়েছে এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে মাথাটা প্রায় গুড়িয়ে দিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে ওরা ভেবেছিলো জার্মান-সৈন্যবাহিনী আজ পরিশ্রান্ত, হয়তো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা শনাইডারকেই হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলো।

'এই কুয়াশার মধ্যে বেজন্মাদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।' অন্ধকারেও স্টেইনব্রেনারের ক্রুদ্ধ চোখের মণিছুটো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। 'কম্যাণ্ডার রায়ের আদেশ, এবার থেকে তুজন তুজন করে রাত্রে পাহারা দেবে এবং যতটা সম্ভব কাছাকাছি।'

'ভালোই তো।'

পরস্পরকে চেনার মতো কাছে এসে তুজনে প্রায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালো। স্টেইনব্রেনার তীক্ষ্ণ চোখে কুয়াশা একোঁড় ওফোঁড় করে তাকাবার চেষ্টা করলো। 'চেষ্টা করলে হয়তো এখনও ওদের কাউকে না কাউকে ধরা যেতে পারে,' ফিসফিস করে ও বললো। 'কিন্তু মুস্কিল হয়েছে শনাইডারকে নিয়ে। এসো, এক কাজ করি—রুমাল গুঁজে ওর মুখটা বন্ধ করে দিই, যাতে কোন রকম শব্দ না করতে পারে। আপাতত ও এখানেই থাক। বরং চলো, আমরা গ্রামটা একবার ঘুরে আসি। বানচোৎদের পেলে···' দাঁতের বিচিত্র শব্দের সঙ্গে হাতের মুঠোটা ওর আপনা থেকেই শক্ত হয়ে এলো।

গ্রেবার হাসলো, 'পেলে তবে তো!'

সত্যি পেলে ওর পক্ষে কিছুই করা অসম্ভব নয়, গ্রেবার ভাবলো। আর ঠিক তখনই শনাইডারের জন্যে মনটা ওর ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। ডান দিকে না গিয়ে আমি যদি বাঁদিকে যেতাম তাহলে ওরা আমার মাথাটাই ঠিক এমনিভাবে গুঁড়িয়ে দিতো। বিতৃষ্ণার মতো কেমন যেন একটা তিক্ততা ওর বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠলো। সাথীদের মধ্যে কেউ যখন মারা গেছে, ঠিক এমনই একটা অনুভূতি ও বহুবার অনুভব করেছে। ও বিশ্বাস করে, কোন সৈনিক হঠাৎ করেই বেঁচে যায় তার কপালের জোরে।

তুজনে যতটা সম্ভব তন্নতন্ন করে খুঁজলো, কিন্তু কাউকে পেলো না। কামানের আওয়াজে তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে আকাশ। বাতাসের বুক চিরে একটানা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মেশিনগানের শব্দ।

'ওরা কিন্তু আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে', চাপা স্বরে স্টেইনব্রেনার বললো, 'অথচ আমরা যে এখানে বসে বসে কি করছি তা ভগবানই জানেন।'

গ্রেবার ভাবলো, মহামান্য ফুরারও তার চেয়ে কিছু কম জানেন না! কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

'এই হারে আক্রমণ চালালে, আমাদের অনেক নতুন সৈন্যের প্রয়োজন হবে। চাই কি তখন তুমি উচ্চপদস্থ কোন অফিসারও হয়ে যেতে পারো।'

'কিংবা সাঁজোয়ার তলায় পিষে তালগোলও পাকিয়ে যেতে পারি।'

'অপদার্থ! সব সময় তোমরা কেবল একটা দিক থেকেই ভাবো। ভুলে যেও না, সবসময় সবাই মরে না।'

'নিশ্চয়ই না। তাহলে তো কোন যুদ্ধই হতো না।'

পালা বদল করে ওরা যখন কুঠরিতে ফিরে এলো, পরিষ্কার এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। স্টেইনব্রেনার কম্বল বিছিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। গ্রেবার উদাস চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। বয়েস এখন কুড়ি, অথচ জীবনে মানুষ মেরেছে অজস্র। লড়ায়ের ময়দানে নয়, সীমান্ত থেকে দূরে নির্জন বন্দীশিবিরে। এবং এ নিপুণতার জন্যে ও গর্বিত।

গ্রেবার আপ্রাণ ঘুমোবার চেষ্টা করলো। পারলো না। চুপচাপ কান পেতে শুনলো কামানের একটানা চাপা গুমগুম আওয়াজ। আওয়াজটা এখন অনেক অনেক দূর কোন স্বপ্নের দেশ থেকে যেন ভেসে আসছে। অথচ স্টেইনব্রেনার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের মধ্যে ওর তরুণ মুখটা মনে হচ্ছে টলটলে শিশুর মতো কি আশ্চর্য সরল।

মেঘলা আকাশ ছিঁড়ে পরের দিন একটা আশ্চর্য সকাল এলো। বিক্ষুব্ধ সীমান্ত। ট্যাংক নামানো হয়েছে রণাঙ্গনে। দক্ষিণ সীমান্ত থেকে সৈন্য-বাহিনীকে ইতিমধ্যেই পেছিয়ে আনা হয়েছে। ভূপাতিত করে নামানো হয়েছে কয়েকটি বোমারু বিমানকে। যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আহত সৈন্যরা ফিরে আসছে। ওদের সৈন্যবাহিনী এখন রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।

দশটার সময় কম্যাণ্ডার রায়ে গ্রেবারকে ডেকে পাঠালেন। উনি আবার ঘর পাল্টেছেন। এখন বাস করছেন গির্জার সামনের দিকের একটা ঘরে। পাশেরটা আফিস ঘর। দুটো ঘরই মাটির নিচে। আসবাব বলতে তিন পায়ার একটা চেয়ার, বড় একটা টেবিল আর ভাঙা অগ্নিকুণ্ডের ওপর দুটো কম্বল পাতা। জানলার ফ্রেমগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ঘরটা রীতিমত ঠাণ্ডা, হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। টেবিলের ওপর স্টোভে কফির জল ফুটছে।

'ইয়েস মাই ফালো বয়!' হাতলবিহীন উজ্জ্বল-রঙ-করা একটা মগে চামচ নাড়তে নাড়তে উনি গ্রেবারকে অভ্যর্থনা জানালেন। দু ঠোঁটের কোণে চাপা একটুকরো হাসি। 'তোমার ছুটি তো মঞ্জুর হয়ে গেছে। তুমি খুব অবাক হয়ে গেছো, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'আমিও।' কেটলি থেকে খানিকটা গরম জল উনি মগের মধ্যে ঢেলে নিলেন। 'কাগজপত্তর সব অফিসে আছে, এক্ষুনি নিয়ে নাও এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করো। সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোন ফিরতি অ্যাম্বুলেন্স ধরতে পারো। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে সব ছুটিই যে কোন মুহূর্তে বাতিল হয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে যদি বেরিয়ে পড়তে পারলে তো তোমার যাওয়া হলো, নাহলে বুঝতেই পারছো...'

'হ্যাঁ, স্যর।'

গ্রেবারের মনে হলো উনি যেন আরও কিছু বলতে চান। কিন্তু বললেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন। টেবিলের সামনে দু-একবার পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ গ্রেবারের কাঁধে হাত রাখলেন। 'আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো। দ্যাখো, যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারো। তোমার অনেক দিনের ছুটি পাওনা ছিলো। জেনো, এ ছুটি তুমি নিজে অর্জন করেছো।'

আর কিছু না বলে উনি সোজা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওঁর দেহের উচ্চতার তুলনায় জানলাটা অনেক নিচু। তাই ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গ্রেবার পাশের আফিস ঘরে গেলো। কেরানিবাবু সরকারী ছাপমারা ছুটির কাগজপত্তর ওর দিকে ঠেলে দিলেন। 'একেই বলে কপাল, বুঝলেন মশাই, একেই বলে কপাল। নইলে এ সময়ে ছুটি কারুর বাপের ভাগ্যেও জোটে না। তবু তো এখনও বিয়েই করেননি, তাই না?'

'না। কিন্তু দু বছরের মধ্যে এই আমার প্রথম ছুটি।'

গ্রেবার প্রায় ছুটতে ছুটতেই তার কুঠরিতে ফিরে এলো। প্রথমে ও ভেবেছিলো শেষ পর্যন্ত ছুটিটা বুঝি আটকেই যাবে, তাই জিনিসপত্তর কিছু গোছগাছ করেনি। অবশ্য জিনিসপত্তর বলতে তেমন কিছু নেই, আর গোছগাছটা নিতান্তই মানসিক প্রস্তুতি। সামান্য যাকিছু ছিলো সব এক জায়গায় জড়ো করে ফেললো। সুন্দর কারুকার্য করা যিশুর মূর্তিটা ও মার

জন্যে নিতে ভুললো না। অনেক দিন আগে পথে ওটা কোথায় যেন কুড়িয়ে পেয়েছিলো।

ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতেই গ্রেবার দেখলো হির্শল্যাণ্ড ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে ভাঁজ করা একটা কাগজ।

'কি ব্যাপার ?' গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। ভাবলো শেষ মুহূর্তে ছুটিটা আবার বাতিল হয়ে গেলো না তো !'

হির্শল্যাণ্ড সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো। ঘরের ভেতরে তখন আর কেউ ছিলো না। তবু ও ফিসফিস করে বললো, 'তুমি তো ছুটিতে যাচ্ছো, আমার একটা কাজ করে দেবে ?'

'বলো।'

'এই ঠিকানায় যদি চিঠিটা একটু পৌঁছে দাও···আর তুমি যদি নিজে বাড়িতে দেখা করে ওঁদের বলো, আমি বেশ ভালো আছি···'

'কিন্তু, তুমি তো নিজেই বাড়িতে চিঠি লিখতে পারো ?'

'হয়তো পারি,' নিঃশব্দ ব্যথায় হির্শল্যাণ্ডের দুচোখ ছলছল করে উঠলো। 'কিন্তু ওঁরা আমার কথা বিশ্বাস করেন না। মার ধারণা আমি ইহুদি বলে···' গলার স্বর ওর বুজে এলো। হির্শল্যাণ্ড ভাঁজ করা চিঠিটা গ্রেবারের হাতে গুঁজে দিলো। 'যদি আমার সহযোদ্ধা কোন বন্ধুর কাছ থেকে তিনি চিঠিটা পান, তাহলে হয়তো বিশ্বাস করবেন। তুমি একটু কষ্ট করে চিঠিটা পৌঁছে দিও, গ্রেবার।'

'নিশ্চয়ই দেবো।' পরিচয়-পত্রের ব্যাগে ও চিঠিটা ভরে রাখলো।

হির্শল্যাণ্ড পকেট থেকে দু প্যাকেট সিগারেট বার করে গ্রেবারের দিকে এগিয়ে ধরলো। 'এ দুটো তুমি রেখে দাও।'

'কি হবে ?'

'আমি তো সিগারেট খাই না, পথে এগুলো তুমি ব্যবহার করতে পারবে।'

ঠিক তাই, হির্শল্যাণ্ডকে ও কোনদিন সিগারেট খেতে দেখেনি। 'বাঃ মন্দ কি !' প্যাকেট দুটো গ্রেবার পকেটে চালান করে দিলো।

'এখানকার পরিস্থিতির কথা ওঁদের কিছু বোলো না, বলবে আমি বেশ ভালোই আছি।'

'নিশ্চয়ই। আর কিছু বলতে হবে ?'

'না।'

হির্শল্যাণ্ড দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

গ্রেবার ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

অ্যাম্বুলেন্সে চালকের পাশে ও কোনরকমে একটা জায়গা করে নিলো : গাড়িটা মারাত্মক জখমী আর আহত সৈনিকে ভর্তি। গ্রামটাকে পাক দিয়ে যে পথটা সোজা মাঠের মধ্যে নেমে গেছে, সেই পথ ধরে গাড়ি ছুটে চললো। দুদিকে ধুধু করছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাঝখানে চওড়া সিঁথির মতো এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া এই পথ। মাঝে মাঝে খুঁটি পুঁতে পথের নিশানা দেওয়া রয়েছে।

গাড়িটা বাঁক নিতেই গ্রেবার দেখতে পেলো গির্জার সামনে ওদের সৈন্যবাহিনীকে সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছে।

চালক বললো, 'ওদের সীমান্তে পাঠানো হবে, এটা তারই প্রস্তুতি।'

'জানি।'

'রাশিয়ানরা এত ট্যাংক, গোলাবারুদ কোত্থেকে পেলো বলুন তো?'

'কি জানি! হয়তো আমেরিকা থেকে। সাইবেরিয়াতেও ওদের বড় বড় কয়েকটা কারখানা আছে।'

শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে চালক ঝড়ের মতো গাড়িটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। তুষারে ঢাকা খানাখন্দগুলো আসার আগে গাড়ির গতি কমিয়ে নিচ্ছে, তারপর সাবধানে গিয়ার পাল্টে আবার ছুটছে। অনেকগুলো জীবনের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে ওর গুরুদায়িত্বের ওপর। গ্রেবার কম্বলে তার পাদুটো ঢেকে নিলো। এই মুহূর্তে ওর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ আর অপরাধী অপরাধী মনে হলো। মনে হলো ওর সাথীরা যখন যুদ্ধ-সীমান্তের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, ও তখন নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছে। ও কি তাহলে পালাচ্ছে? কিন্তু এ ছুটি পাওয়ার অধিকার তো আমি নিজেই অর্জন করেছি—তাহলে আমার এমন মন খারাপ লাগছে কেন?

কয়েকটা গ্রাম পেছনে ফেলে আসার পর ওরা দেখলো অন্য আর একটা অ্যাম্বুলেন্স পথের ধারে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। সামনের একটা চাকা তুষারে ডুবে গেছে। ওরা গাড়ি থামিয়ে নিচে নেমে এলো।

'কি ব্যাপার?'

'অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।'

'একটু দেখে চালাবেন তো। নইলে এই বরফের মধ্যে কারুর আবার অ্যাক্সেল ভাঙে নাকি?'

অন্য অ্যাম্বুলেন্সের চালক খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলালো। 'আর বলবেন না, এ যেন সেই নাক খুঁজতে আঙুল ভাঙার মতো অবস্থা।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

গ্রেবার চালককে অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের দিকে ডেকে নিয়ে গেলো। ওদের দুজন আহত সৈনিক ইতিমধ্যে মারা গেছে। ধরাধরি করে ওদের নামিয়ে তার জায়গায় অন্য তিনজন আহত সৈনিককে তুলে নেওয়া হলো। স্ট্রেচার রাখার জায়গা নেই বলে অন্য কোন সৈনিককে নেওয়া সম্ভব হলো না। যারা পড়ে রইলো চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলো। এমন একটা খোলা মাঠে শুধু বোমা নয়, শীতে জমে যাবার ভয়টাও নিতান্ত কম নয়। ওদের অনেক করে বুঝিয়ে, স্টেশন থেকে এক্‌খুনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে, ওরা গাড়িতে উঠে বসলো। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিলো।

'মাস দুয়েক আগে আমারও একবার এ-রকম হয়েছিলো। অনেক মেহনত করে যখন গাড়িটাকে সারিয়ে তুললুম, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। স্ট্রেচারেই দু-তিনজন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত যখন এসে পেঁ ৗছলুম, মাত্র ছজন তখন বেঁচে আছে। সত্যি, শীতকালে রাশিয়ায় আহত হওয়া মানে জঘন্য ব্যাপার। অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে অনেককে সারা পথই হেঁটে আসতে বাধ্য হয়। শীতের রাতে···দৃশ্যটা একবার কল্পনা করে দেখুন। অথচ কোন উপায় নেই। অ্যাম্বুলেন্সে তখন সরষে ফেলার জায়গা নেই, পাদানিতে দাঁড়িয়ে দরজার হাতল ধরেই ঝুলতে ঝুলতে সব যাচ্ছে।'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না। স্তব্ধ বিস্ময়ে চারদিকে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। ঘর বাড়ির কোথাও কোন চিহ্ন যেন কোনদিন ছিলোও না। মাথার ওপরে নীলিম আকাশ আর সামনে অন্তবিহীন তেপান্তরের মাঠ। এখন ভরা দুপুর, অথচ রোদ্দুরের তেমন তেজ নেই। হঠাৎ ওর বুকের মধ্যে থেকে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠলো। যন্ত্রণার মতন, অথচ ঠিক যন্ত্রণা নয়। এই প্রথম ওর মনে হলো ও পালাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই-ই। মৃত্যুর এই কদর্য নরক থেকে ও পালাচ্ছে। চাকার নিচে তুষার ছাওয়া পথের চিহ্ন ধরে একটু একটু করে বাড়ির দিকে, দিগন্তের ওপারে অবিশ্বাস্য জীবনের দিকে ও পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ও তো পালাতে চায়নি। চেয়েছিলো একটু নির্জনতা, নিজেকে সম্পূর্ণ করে পাবার মতো একটুকরো নিটোল নির্জনতা।

গর্তে পড়ে গাড়িটা লাফিয়ে উঠতেই চলকে উঠলো গ্রেবারের আবিল নির্জনতা। পকেটে অনুভব করলো হির্শল্যাণ্ডের দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট দুটো। আর ঠিক তখনই মনে হলো, সিগারেটের অভাবটাই ও যেন সবচেয়ে বেশী করে অনুভব করছিলো। প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে একটা ও চালকের দিকে এগিয়ে দিলো।

'নিন।'

'ধন্যবাদ। সিগারেট আমি খাই না। কাঁচা তামাকই বেশি ভালবাসি।'

পাঁচ

মাঠের মাঝে ছোট্ট একটা স্টেশন। নামেই মাত্র স্টেশন। চারদিক খাঁখাঁ করছে। ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেকটা দেওয়াল তখনও দাঁড়িয়ে ছিলো, তার ওপর ছাউনি ফেলে অস্থায়ী একটা শিবিরের মতো তৈরি করে নেওয়া হয়েছে; যাতে ওপর থেকে শত্রুরা কিছু অনুমান করতে না পারে। প্রধান রেলসড়ক থেকে ছোট একটা লাইন এনে এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে।

রাশিয়ান বন্দীদের রাখা হয়েছিলো অন্য একটা তাঁবুতে। যারা হাঁটতে পারে তারা মাথা গুঁজে বসে রইলো সামনের বেঞ্চিতে। সবাই রীতিমত ক্লান্ত। ছুটিতে যাওয়া অন্য দু-একজন সৈনিককেও দেখা গেলো। ওরা যতটা সম্ভব কাছাকাছি ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছে, পাছে কেউ না এসে আবার ওদের রণাঙ্গনে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

হঠাৎ দূর থেকে শোনা গেলো বিমানের পাখার গুঞ্জন। আকাশে নয়, মাটিতেই। হয়তো আশপাশে কোথাও গোপন বিমানঘাঁটি আছে। শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এলো। সবাইয়ের বুক দুরুদুরু করে কেঁপে উঠলো। গ্রেবারেরও তন্দ্রা ছুটে গেলো। ও দেখলো একঝাঁক বিমান মাথার ওপর দিয়ে দ্রুত উড়ে গেলো এবং ক্রমশ ছোট হতে হতে পাখির মতো পুব-আকাশে মিলিয়ে গেলো। পাখি নয়, ঠিক একঝাঁক শিকারী বাজের মতো। গ্রেবার ভাবলো, যাক, বাঁচা গেলো।

'কাগজ!' কার যেন স্তব্ধ গম্ভীর স্বরে গ্রেবার চমকে উঠলো।

মাথা ঘোরাতেই দেখলো দুজন সামরিক পুলিশ অফিসার। পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা। পরিচ্ছন্ন পোশাক, চকচকে মোম-পালিশ করা বুট, ঝকঝক করছে হাতের রাইফেল। গ্রেবার ভাবলো দুর্ভাগ্যের ঝড়ঝাপটা এখনও গায়ে লাগেনি, লড়ুয়ে সৈনিকের মতো মৃত্যুর মুখোমুখি কোনদিন দাঁড়াতে হলে এমন ফিটফাট থাকা বেরিয়ে যেতো।

'কাগজ দেখি।'

সৈনিকরা যে যার সামরিক-পরিচয় এবং ছুটির কাগজপত্তর সব বার করে

দিলো। অফিসাররা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সেগুলি দেখে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

'আহা, বুনো শুয়োরের মতো কি সব চেহারার ছিরি!' দুজনের মধ্যে বয়স্ক অফিসার ধমক দিলেন, 'যাও যাও, বাড়ি যাবার আগে সবাই ভালো করে খেয়েদেয়ে পরিষ্কার হয়ে নাও।'

'হ্যাঁরে, খানকির বাচ্চা!' অফিসার দুজনকে খানিকটা দূরে এগিয়ে যেতে দেখে সৈনিকদের মধ্যে থেকে কে যেন ভেংচি কাটলো, 'আমরা সব বুনো শুয়োর আর তোরা খুব ভদ্দরলোক!'

অন্য একজন বললো, 'সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আমাদের দলের চোদ্দ-পনেরোজন লোককে ওরাই সেদিন স্তালিনগ্রাদে গুলি করে মেরেছে।'

'ওদের কাজই তো ওই।'

'আপনি স্তালিনগ্রাদে ছিলেন নাকি?'

আগের সৈনিকটি চটে উঠলো, 'ছিলাম না তো কি মিছিমিছি বলছি?'

'এখন আর স্তালিনগ্রাদ থেকে কাউকে বেরুতে হচ্ছে না।'

'শোন শোন, আমার একটা কথা শোন।' গোলগাল চেহারার একজন সৈনিক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। 'তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি, এখন এসব কিছু আলোচনা না করাই ভালো।'

খাবার ডিশ হাতে ওরা সবাই সার বেঁধে দাঁড়ালো। শীত করছিলো, তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। কেউ এক পাও নড়লো না। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর সবাইকে একহাতা করে সুরুয়া দেওয়া হলো। শাক-সব্জী, মাংস আর আলুর টুকরো মেশানো। যেমন পরিমাণ, তেমনি তার চেহারা। গ্রেবার মনে মনে ভাবলো, মার হাতে তৈরি সুরুয়ার সঙ্গে এর কোথাও কোন মিল নেই। আলু পেঁয়াজের পুর দেওয়া ভেনিলা সসেজের কথা না হয় বাদই দিলাম। তবু সুরুয়ার শেষ কণাটুকু পর্যন্ত ও ফেলে রাখলো না। আর কিছু না হোক অন্তত গরম আছে।

প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ওদের অপেক্ষা করতে হলো। ইতিমধ্যে আরও দুবার কাগজপত্তর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আরও আহত সৈন্য এসে পৌঁছেছে। তিনজন পথেই মারা গেছে। স্ট্রেচারগুলো ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে দেওয়ালের গায়ে। যারা ছুটিতে যাবে, অস্থিরভাবে ছটফট করছে। ভয় পাচ্ছে কোন কারণে যদি যাওয়া না হয়। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যেরও অনেক পরে ট্রেন এলো।

পরিষ্কার আকাশ। মাথার ওপরের নক্ষত্রগুলোকে মনে হচ্ছে আশ্চর্য উজ্জ্বল আর অনেক নিচুতে। গ্রেবার অনেকক্ষণ পলক-হারা চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। চারদিক অন্ধকার। কোথাও কোন আলো নেই।

দেখতে দেখতে ট্রেনের কামরাগুলো ভর্তি হয়ে গেলো।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'কারা কারা ছুটিতে যাচ্ছে?'

কয়েকজন সৈনিক ভিড় ঠেলতে ঠেলতে সামনে এগিয়ে এলো। সন্ধ্যের আগে শেষবার পরীক্ষার সময় যে পুলিস অফিসারটি সবাইকে একটা করে চিরকুট দিয়েছিলেন, এবার সেগুলো ফিরিয়ে নিলেন এবং সবাইকে নির্দিষ্ট একটা কামরায় ওঠার নির্দেশ দিলেন। ওরা সবাই সেই কামরার সামনে ভিড় করলো। কে আগে উঠে ভালো জায়গাটা দখল করবে, তার জন্যে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিলো। আগে থেকেই কয়েকজন আহত সৈনিক নিচে কম্বল বিছিয়ে বসে ছিলো। গ্রেবার মাঝের আসনে কোন রকমে একটা জায়গা করে নিলো। জানলার ধারে ও বসতে চায়নি। ও জানে যেকোন মুহূর্তে বোমার টুকরো ছিটকে এসে লাগতে পারে।

ট্রেন তখনও ছাড়েনি। কামরার ভেতরটা অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যেই ওরা অপেক্ষা করে রইলো। বাইরেটা নিস্তব্ধ, নিঝুম। কোথায় যেন দুজন এস এস রক্ষী হেসে হেসে কথা বলছে। এখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। নিচে বসে থাকা আহত সৈন্যদের মধ্যে থেকে কে একজন অশ্লীল খিস্তি দিলো। ট্রেন কিন্তু নড়লো না, জগদ্দল পাথরের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। গ্রেবার আসনের পেছনে মাথা হেলিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলো, ভাবলো ট্রেন ছাড়লে আবার জেগে উঠবে। কিন্তু পারলো না, প্রতিটা শব্দ ও কান পেতে শুনলো। দেখলো অন্ধকারে অন্যদের চোখগুলো শুধু জ্বলজ্বল করছে। বাইরে থেকে নক্ষত্রের আলো তুষারে প্রতিফলিত হয়ে যতটুকু ভেতরে আসছে, তাতে কারুর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কেবল ওদের চোখগুলো, সাদা পটির নিচে ওদের উজ্জ্বল অশান্ত চোখের মণিগুলো কেবল অন্ধকারে কি যেন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে।

একটা ধাক্কা দিয়েই ট্রেনটা আবার থেমে গেলো। সারা ট্রেন জুড়ে শোনা গেলো একটা চাপা উল্লাস-ধ্বনি, দরজা বন্ধ হওয়ার ধুপধাপ শব্দ। আরও দুটো স্ট্রেচার প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে আনা হলো। অর্থাৎ দুজন মারা গেছে। গ্রেবার ভাবলো, শেষ মুহূর্তে যদি আর নতুন কোন আহত সৈনিক না আসে, তাহলে দুজনের জায়গাটা সবাই ভাগ করে নিতে পারবে। শুধু গ্রেবার নয়, অল্পবিস্তর সবায়ের ভাবনা প্রায় একই রকম।

ট্রেনটা আবার ধাক্কা খেলো। তারপর একটু একটু করে প্ল্যাটফর্ম সরতে শুরু করলো। সবাই তখন বাইরে ঝুঁকে পড়ছে। ওরা এখনও বিশ্বাসই করতে পারছে না। যেন ট্রেনটা যেকোন মুহূর্তে থেমে যেতে পারে। কিন্তু থামলো না। স্টেশনের অদূরে তাঁবুর সামনে দাঁড়ানো সৈন্যরা ট্রেনের কামরাগুলোর দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। গ্রেবারের মনটা আবার খারাপ হয়ে গেলো। মনে হলো ও পালিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ। চাকার প্রতিটা শব্দে একটু একটু করে বাড়ির দিকে, দিগন্তের ওপারে নতুন জীবনের দিকে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। নতুন জীবন! সত্যিই কি তাই?

·

পরের দিন ভোর। তখনও তুষার পড়ছে। কি একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন থামলো। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে-আসা শহরতলীর গা-ঘেঁষে দাঁড়ানো এই স্টেশন। কফি আর রুটি দেওয়া হবে। সবাই জানলার সামনে ভিড় করলো। অনেকে আবার হুড়দাড় করে নিচে নেমে গেলো। গ্রেবার নামলো না। জানলা থেকে ওর বরাদ্দ কফিটুকু নিয়েই আবার তার আসনে ফিরে এলো। একটুকরো রুটির বদলে বসার ভালো জায়গাটুকু ও কিছুতেই হারাতে রাজী নয়।

আর এক দফায় মৃতদেহগুলো নামিয়ে দেওয়া হলো।

হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়লো সামান্য আহতদের কামরা থেকে নামিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবরটা শুনেই কয়েকজন সৈনিক পেচ্ছাপখানায় ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। কয়েকজন আবার অন্য দরজা দিয়ে নিচে নেমে পড়লো।

বাইরে থেকে কে যেন বললো, 'ওই যে, মামারা আসছেন!'

ভেতর থেকে দু-একজন বললো, 'বন্ধ করে দাও, শিগগির দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

কে একজন দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

'না না, আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই,' সামনের আহত তরুণটি ভয়ে ককিয়ে উঠলো। মাথার পটি তখনও ওর রক্তে ভিজে জবজব করছে। 'আগে দু-দুবার ওরা আমাকে মাঠের হাসপাতাল থেকে সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়েছে। একবারও ছুটি দেয়নি। এখন আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।'

কেউ কোন উত্তর দিলো না।

বাইরে কারা যেন দরজা ধাক্কালো। তরুণ ভীরু চোখে সেদিকে তাকালো। দরজা খুলতেই একজন বয়স্ক ফিল্ড-সার্জেন এবং দুজন সামরিক পুলিস ভেতরে

প্রবেশ করলো। সার্জন আহত সৈনিকদের প্রমাণ-পত্রগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর হঠাৎ একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি নেমে যাও।'

যাকে বলা হলো—ছোটখাটো শুকনো চেহারার একটা মানুষ, কাঁধে চওড়া পটি বাঁধা। ও কিন্তু নামলো না।

একজন পুলিস এগিয়ে এলো। 'কি ব্যাপার, কানে শুনতে পাচ্ছো না নাকি? নামো নামো।' লোকটা কিন্তু নড়লো না! ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ও সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন সত্যিই শুনতে পায়নি। পুলিশটা গর্জে উঠলো, 'নাঃ বিশেষ দাওয়াই না হলে চলছে না দেখছি। উঠে দাঁড়াও!'

তবু ও উঠলো না। শক্ত কাঠ হয়ে বসে রইলো।

'উঠে দাঁড়াও বলছি।' এবার অন্য পুলিসটা চোখ পাকিয়ে তেড়ে এলো। 'তুমি তোমার ওপরওয়ালার আদেশ অমান্য করছো, জানো এর শাস্তি কি?'

সার্জন ততক্ষণে সেই তরুণ সৈনিকটাকে নিয়ে পড়েছেন। বেচারির চোখ মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে। সার্জন ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছেন, 'আমি বলছি তোমার কোন ভয় নেই। ওঁরা শুধু তোমায় নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবেন।'

'না।'

কান্নায় তরুণের গলার স্বর বুজে এলো। তখনই ওর চোখ পড়লো—পুলিস দুজন কাঁধে পটি-বাঁধা লোকটাকে বলির পাঁঠার মতো প্রায় বগল-দাবা করেই বাইরে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। ওই দৃশ্য দেখে কেউ আর টুঁ-শব্দ করলো না। তরুণ ছলছল চোখে সার্জনের দিকে তাকালো, 'ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে আমি আবার ট্রেনে ফিরে আসতে পারবো?'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে তোমার ব্যাণ্ডেজটা বদলানো দরকার।'

তরুণ ম্লান মুখে নেমে গেলো।

পুলিস দুজন আবার ফিরে এলো। ওদের একজন সার্জনকে বললো, 'পেচ্ছাপখানার মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ লুকিয়ে আছে, স্যর।' জোরে জোরে ও দরজা ধাক্কা দিলো, 'কে আছো, শিগ্‌গির বেরিয়ে এসো।'

দরজা খুলে একজন সৈনিক বেরিয়ে এলো।

'এই যে বাছাধন, ওটার মধ্যে কি করছিলে?'

'ভীষণ পেট খারাপ···'

'ভীষণ পেট খারাপ !' পুলিসটা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলো। 'বলি, এতক্ষণ কি করছিলে ? পেট খারাপের আর সময় পেলে না ?'

'বিশ্বাস করুন।'

'তোর বিশ্বাসের কাঁথায় আগুন !' অন্য পুলিসটা ওর কোটের কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো।

সার্জন এবার ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'দয়া করে নেমে যান।'

'আপনি আমাকে একবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন, ডাক্তারবাবু।'

'আমি আপনার ব্যাণ্ডেজ দেখেই বুঝতে পারছি।'

'ঠিক আছে।' সৈনিকটি আর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'এখানে আর কেউ নেই, বাকি সবাই ছুটিতে যাচ্ছে।' সার্জন দরজার দিকে এগুলেন। 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

'হ্যাঁ, স্যর।'

পুলিস দুজন ওঁর পেছন পেছন নেমে গেলো।

খানিকক্ষণ পরে পেচ্ছাপখানার দরজা দিয়ে আর একটা মুখ সন্তর্পণে উঁকি দিলো। তারপর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন ল্যান্স-কর্পোরাল, সারা মুখ ঘামে ভেজা। উনি ওঁর আসনে গিয়ে বসলেন। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'চলে গেছে ?'

'মনে তো হয়।'

ল্যান্স-কর্পোরাল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। 'উঃ এতক্ষণ একমনে প্রার্থনা করছিলাম !'

সবাই ওঁর দিকে তাকালো। কে যেন জিজ্ঞেস করলো, 'কার জন্যে ?'

'কার জন্যে আবার ? ওই বাঁদরহুটোর জন্যে।' অন্য আর একজন মন্তব্য করলো।

'না, বাঁদরহুটোর জন্যে নয়।' ল্যান্স-কর্পোরাল রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। 'আমি প্রার্থনা করছিলাম যে ছেলেটা ভেতরে ছিলো, তার জন্যে। কই, ওকে তো দেখছি না ?'

'নেমে গেছে।'

'নেমে গেছে ! আহারে, বেচারি বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করছিলো !'

কর্পোরাল মর্মাহত হলেন। 'ওর বউয়ের ক্যান্সার না কি যেন বলছিলো। ওর জন্যে আমার সত্যিই তুঃখু হচ্ছে।'

'রাখুন মশাই, আপনার তুঃখু,' কে যেন ধমক দিলো। 'আগে ট্রেন ছাড়ুক, তারপর যত খুশি তুঃখু করবেন।'

ট্রেন ছাড়লো আরও ঘণ্টাখানেক পরে। যে লোকটা অন্য দরজা দিয়ে গিয়েছিলো তাকে আর উঠতে দেখা গেলো না। গ্রেবার ভাবলো ওরা হয়তো তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

তুপুরের দিকে সামরিক পোশাক-পরা একজন লোক কামরায় প্রবেশ করলো। 'কেউ কামাতে চান ?'

'কি ?'

'কেউ দাড়ি কামাতে চান ? আমি নাপিত। খুব ভালো সাবান আছে। একেবারে ফ্রান্স থেকে আনানো।'

'চলন্ত ট্রেনে দাড়ি কামানো যায় বুঝি ?'

'কেন যাবে না ? দীর্ঘদিন আমি এই কাজ করছি। এই তো সবে অফিসারদের কামরা থেকে আসছি।'

'কত পড়বে ?'

'মাত্র পঞ্চাশ ফেনিগশ। কামানো হলে তখন দেখবেন কত সস্তা।'

'বাঃ, তাহলে আমার থেকেই শুরু করুন।'

বড় একটা কাগজ পেতে নাপিত তার কামানোর সরঞ্জাম সব সাজিয়ে ফেললো। পকেট থেকে চিরুনি কাঁচি বার করে রাখলো। ক্ষুরটা হাতের তালুতে তু-একবার ঘষে নিলো। সারা কামরায় ছড়িয়ে পড়লো ফেনা-ওঠা সাবানের মিষ্টি গন্ধ। চমৎকার হাতের টান, নাপিত হিসেবে ও সত্যিই কুশলী। চোখের নিমেষে তিনজনের কামানো হয়ে গেলো। আহতরা কেউ কামাতে রাজী হলো না। এবার গ্রেবার বসে পড়লো। কামানো তিনজনেরই মুখের দিকে ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। ওদের সমস্ত চেহারাটাই পাল্টে গেছে, কেমন যেন অচেনা লাগছে। ঝকঝকে কামানো চিবুকে ওদের মুখগুলো মনে হচ্ছে অর্ধেক সৈনিক, অর্ধেক বাড়িতে-থাকা মানুষদের মতো। গ্রেবার ক্ষুর ঘষার শব্দ শুনতে পেলো। প্রতিটা ক্ষুরের টানে ও যেন পালকের মতো নরম আর সোলার মতো হালকা হয়ে যেতে লাগলো।

সীমান্তের এপারে জার্মানিতে যখন ট্রেন এসে পৌঁছলো, বিকেল উতরে

গেছে। বড় একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই কামরা প্রায় খালি হয়ে গেলো। ছুটিতে-আসা সৈনিকদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্নানাগারে যাবার নির্দেশ দেওয়া হলো। দেহ থেকে উকুন নির্মূল করার জন্যেই এই সতর্কতা। ওরা সবাই জামা-কাপড় ছেড়ে প্রায় নগ্ন হয়ে একটা উষ্ণ কক্ষে প্রবেশ করলো। ভেতরে কার্বোলিক সাবানের কড়া গন্ধ। দীর্ঘদিন পরে গ্রেবার গরম জলে প্রাণ ভরে স্নান করলো। ও জানে ওর মাথায় উকুনের তেমন কোন উৎপাত নেই, যা আছে জামা কাপড়ে। জামা কাপড়ে-থাকা উকুন বড় একটা মাথায় হানা দেয় না, এটা ওদের প্রাচীন রীতি। উকুনেরা সাধারণত একে অপরের অঞ্চল অধিকার করতে চায় না এবং এ-সম্পর্কে ওরা কোনরকম যুদ্ধ বিগ্রহও পছন্দ করে না।

ঘরটা রীতিমত গরম। তন্দ্রার মতো উষ্ণ একটা আমেজে গ্রেবারের দু-চোখের পাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এলো। কিন্তু এই ভালো-লাগার প্রতিটা অনুকণা ও চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করতে চাইলো। চারদিকে তখন স্ফূর্তির ফোয়ারা ছুটছে। গ্রেবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ওর সহযোদ্ধা বন্ধুদের বিশীর্ণ ম্লান নগ্ন দেহগুলো, কারো পায়ে হাজা, কারো হাতে দগদগে গভীর ক্ষত। তবু ওরা যেন জীবনে ফিরে-আসা এক অন্য মানুষ। ওরা এখন আর কেউ যুদ্ধের কথা বলছে না। খাওয়া-দাওয়া পারিবারিক নানান স্মৃতি আর মেয়েদের কথায় সবাই এখন মশগুল।

'আমার বউয়ের তো একটা বাচ্ছা হয়েছে,' বের্নহার্ট বললো। ট্রেনেই ওর সঙ্গে আলাপ। ও বসে রয়েছে গ্রেবারের ঠিক পাশে। ছোট্ট একটা পকেট-আয়না নিয়ে চোখের পাতা আর ভ্রূ থেকে উকুন খুঁজে খুঁজে বার করছে। 'দু বছর বাড়ি যাইনি অথচ বাচ্ছার বয়েস এখন সবে চারমাস। বউ অবশ্য জানিয়েছে বাচ্ছার বয়েস চোদ্দ মাস এবং ওটা নাকি আমারই। মা কিন্তু চিঠিতে লিখেছেন বাচ্ছাটার বাবা নাকি কোন রাশিয়ান। তাছাড়া এইসব ব্যাপার মাত্র দশ মাস আগে থেকে ও লিখতে শুরু করেছিলো। কি জঘন্য কাণ্ড, একবার ভেবে দেখুন।'

'যুদ্ধের সময় এসব হয়,' মাথায় টাক, নাদুস-নুদুস চেহারার বয়স্ক এক ভদ্রলোক নির্লিপ্ত স্বরে কথাটা বললেন। 'অনেক সময় যুদ্ধ-বন্দীদেরও এসব কাজে ব্যবহার করা হয়।'

'বউয়ের নিকুচি করেছে!' অন্য একজন চাপা স্বরে বললো, 'আমি হলে লাথিয়ে মাগীকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতুম! যত সব নোংরামি!'

'নোংরামি! কিসের নোংরামি?' টাক-মাথা সেই বয়স্ক ভদ্রলোক ভ্রূ

কুঁচকে তাকালেন। 'যুদ্ধের সময় সব জিনিস আগের মতো একরকম হয় না। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকেরই সব কথা চিন্তা করে দেখা উচিত।'

'রাখুন মশাই, আপনার বাস্তব দৃষ্টিকোণ।' চাপা-স্বরে কে একজন ধমক দিলো।

অন্য একজন বের্নহার্টকে জিজ্ঞেস করলো, 'ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে। দেখতে নাকি ঠিক আমার মতন হয়েছে।'

'তাহলে রেখে দিন। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

'কিন্তু ধরুন যদি রাশিয়ানদের মতন দেখতে হয়?'

'অসুবিধেটা কোথায়? আমরাও আর্য, রাশিয়ানরাও আর্য। এবং জন্মভূমির জন্যে সৈনিকের প্রয়োজন।'

বের্নহার্ট আয়নাটা সরিয়ে রাখলো। 'মুখে বলা যতটা সহজ, আসলে কিন্তু ততটা নয়। আপনার নিজের হলে বুঝতে পারতেন।'

'ও মশাই,' দূর থেকে কে যেন টিপ্পনি কাটলো। 'তাহলে আপনি কি বলতে চান, স্থানীয় কোন কুঁদো ষাঁড় আপনার স্ত্রীকে পাল দিলে আপনি খুশী হতেন?'

গ্রেবার মনে মনে ভাবলো—এইরে, এবার শুম্ভ-নিশুম্ভ না বেঁধে ওঠে! নিজের স্ত্রীর নামে যাতা বলা অনেকে আবার সহ্য করতে পারে না। কিন্তু না, বের্নহার্ট চটলো না। বরং আগের চেয়ে আরও ম্লান স্বরে ও বললো, 'না, নিশ্চয়ই খুশী হতাম না।'

'তাহলে তো মিটেই গেলো।'

'ও আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারতো।'

'কেউ অপেক্ষা করে, কেউ আবার করে না।' টাক-মাথা ভদ্রলোক মুখ থেকে সাবানের ফেনা ধুয়ে ফেললেন। 'বছরের পর বছর আপনি বাড়ি ফিরতে পারবেন না অথচ সবকিছু আগেরই মতন আশা করবেন, তা তো আর হয় না।'

'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'ধন্যবাদ। এখনও ঠিক সুযোগ করে উঠতে পারিনি।'

এতক্ষণ ছুঁচলো-মুখো একজন চুপচাপ সব শুনছিলো আর কুঁতকুঁতে চোখে সবায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলো। এবার হঠাৎ ও দুম করে বলে বসলো, 'রাশিয়ানরা আর্য নয়।'

সবাই হেসে উঠলো।

টাক-মাথা ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কিন্তু ভুল করছো। রাশিয়ানরাও আর্য। একদিন ওরাই ছিলো আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী।'

'যখন ছিলো তখন। এখন ওরা বর্বর। কমিউনিস্ট-বর্বর।'

কে যেন বিদ্রূপ করলো। 'হ্যাঁ, ঠিক যেমন জাপানীরা আগে ছিলো বর্বর। এখন ওরা আর্য। পীত আর্য।'

'তাহলে বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করবেন, কিছু ঠিক করলেন?'

'ওটাকে বরং সরকারের হাতে তুলে দিন।'

'আর আপনার স্ত্রী···'

হঠাৎ কেন জানি বের্নহার্ট ভীষণ চটে উঠলো এবং অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলো, 'চুপ করুন! আমাকে একটু একা থাকতে দিন।'

বাইরে এসে ওরা জামাকাপড় পরে নিলো। এখন ওরা সবাই সৈনিক। কেউ লান্স-কর্পোরাল, কেউ সার্জেন্ট, কেউ বিমানচালক, কেউ সৈনিক, কেউ বা আবার সামরিক দপ্তরের সাধারণ আর্দালি। একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ছুটিতে-যাওয়া সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। মঞ্চের পেছনে টাঙানো ফুরারের বিরাট একটা প্রতিকৃতি। উনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, যেহেতু ওঁরা এখন নিজের স্বদেশভূমিতে ফিরে যাচ্ছেন, ওঁদের দায়িত্ব এখন অনেক। সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে এখন আলোচনা কিছু না করাই ভালো। বিশেষ করে রণকৌশল, সৈন্যবাহিনীর অবস্থান এবং তাদের গতিবিধি সম্পর্কে। সর্বত্রই গুপ্তচর ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং চুপ করে থাকাটাই এখন সবচেয়ে শ্রেয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন রকম বেচাল কথাবার্তা বা সমালোচনা সরকার বরদাস্ত করবেন না এবং শাস্তির যোগ্য বলে ধরে নিতে বাধ্য হবেন। জাতির সর্বশক্তিমান ফুরার নিজে এই যুদ্ধ পরিচালনা করছেন এবং এর ফলাফল সম্পর্কে উনি সম্পূর্ণ সচেতন। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রভূত ক্ষয়ক্ষতিতে রাশিয়ার অবস্থা শোচনীয়। এবং অচিরেই আমরা প্রতি-আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। আমাদের সৈন্যবাহিনী যেমন কষ্টসহিষ্ণু, তেমনি নিপুণ। তাছাড়া তাদের মনোবল এখনও আশ্চর্য অটুট রয়েছে। সবশেষে আবার আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই, সেনাবাহিনীর অবস্থান এবং জায়গার নাম ফাঁস করে দেওয়ার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। জেনে রাখবেন গেস্টাপোর সতর্ক দৃষ্টি এখন চারদিকে। সর্বত্র।

বক্তা থামলেন। স্তব্ধ বাতাসে তখনও যেন গমগম করছিলো ওঁর মিষ্টি অথচ ভরাট কণ্ঠস্বর—চারদিকে! সর্বত্র! সতর্ক ভঙ্গিতে উনি মঞ্চের পেছনে

ছবিটার দিকে তাকালেন। তারপর সৈনিকদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন—অজস্র ব্যস্ততার মধ্যেও ফুরার তাঁর প্রিয় সৈনিকদের সম্পর্কে অত্যন্ত যত্নবান। উনি চান ঘরে-ফেরা প্রতিটি জোয়ান তাঁর প্রীতিস্বরূপ এই উপহার বাড়িতে নিয়ে যান, যাতে পরিবারের সকলে বুঝতে পারেন সৈন্যবাহিনী বিদেশে থাকা সত্ত্বেও ওঁদের প্রতি কোনরকম অযত্ন হয়নি। কিন্তু সাবধান, খাবারের এই প্যাকেটগুলো বাড়িতেই নিয়ে যাবেন। পথে কোথাও খুলবেন না বা নিজেরা খেয়ে ফেলবেন না। মনে রাখবেন যেকোন সময় আপনাদের প্যাকেট পরীক্ষা করে দেখা হতে পারে। হাইল হিটলার!

সবাই বুক টানটান করে দাঁড়ালো। গ্রেবার প্রতিমুহূর্তে আশা করছিলো তৃতীয় রাইখের বিখ্যাত সমর-সংগীত 'জার্মানি, আমার জার্মানি' গানের রেকর্ডটা বুঝি বাজিয়ে শোনানো হবে। কিন্তু না, তার বদলে শোনা গেলো একটি আদেশ :

যাঁরা যাঁরা রাইনেলাণ্ডে যাচ্ছেন, তিন পা এগিয়ে আসুন।'

খুব অল্প কয়েকজন মাত্র সামনের সারি থেকে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলো।

'ছুটিতে রাইনেলাণ্ডে যাওয়া নিষিদ্ধ। তার পরিবর্তে আপনি কোথায় যেতে চান?'

'কলয়নে।'

'এই তো বললাম রাইনেলাণ্ডে প্রবেশ, এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আপনি অন্য আর কোথায় যেতে চান বলুন?'

শীর্ণ লিকলিকে চেহারার সৈনিকটি প্রথমে কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। অফিসার ওকে তাড়া লাগালেন, 'বলুন, বলুন—অমন চুপ করে থাকবেন না।'

'আমি কলয়নে জন্মেছি, এখন কলয়নেই যেতে চাই।'

'একটা কথা কেন বুঝতে পারছেন না, কলয়নে আপনি যেতে পারবেন না। অন্য আর কোন্ শহরে আপনি যেতে চান?'

'অন্য আর কোন শহরে যেতে চাই না। কলয়নে আমার বউ ছেলে পরিবারের আর সবাই রয়েছে। আগে ওখানে আমি কামারের কাজ করতাম। কলয়নের জন্যে আমার ছুটির মঞ্জুর-পত্রে সরকারী ছাপ মারা রয়েছে, এই দেখুন।'

'সবই বুঝলুম। কিন্তু ওখানে এখন আপনি যেতে পারবেন না। সাময়িকভাবে কলয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে!' কান্নায় ভিজে এলো সৈনিকের কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু কেন?'

'আপনি কি পাগল হয়েছেন? নইলে কোন্ সাহসে এসব প্রশ্ন করছেন?'

একজন ক্যাপ্টেন এসে অফিসারের কানেকানে কি যেন বললেন। উনি মাথা নাড়লেন। তারপর আবার সৈনিকদের দিকে ফিরে তাকালেন। যাঁরা 'হামবুর্গ আর আলজাসে যাবেন, সামনে এগিয়ে আসুন।'

কেউ এগিয়ে এলো না।

উনি সারি সারি উদ্বিগ্ন মুখগুলোর দিকে একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। 'রাইনেলাণ্ডের সৈন্যরা এখানে থাকুন। বাকি সবাই স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। আর যাবার আগে বাড়ির জন্যে খাবারের প্যাকেটগুলো যেন নিয়ে যেতে ভুলবেন না।'

ওরা আবার স্টেশনে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ পরেই রাইনেলাণ্ডের সৈনিকরা এসে ওদের সঙ্গে মিলিত হলো। বেচারিদের মুখগুলো কচি কলাপাতার মতো শুকিয়ে গেছে। টাক-মাথা গোলগাল চেহারার সেই বয়স্ক ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে শীর্ণকায় সৈনিকটির দিকে এগিয়ে এলেন।

'কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার যা তা তো নিজের কানেই শুনলেন।'

'হ্যাঁ, কলয়নে যেতে পারছেন না, সেটা শুনেছি। কিন্তু কোথায় যে যাচ্ছেন, সেটা শোনার সৌভাগ্য এখনও হয়নি।'

'রোটেনবুর্গে।'

'রোটেনবুর্গে?'

'হ্যাঁ। ওখানে আমার এক বোন থাকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি করবো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না! থাকি কলয়নে, অথচ এখনও পর্যন্ত বুঝতেই পারলাম না সেখানে কি হয়েছে, কেন সেখানে যেতে পারবো না।'

অদূরে দুজন এস এস পুলিসকে বুটের খটখট শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াতে দেখে কে যেন বললো, 'সাবধান! আস্তে কথা বলো।'

'তা নয় বললাম। কিন্তু রোটেনবুর্গে গিয়ে আমার লাভটা কি হবে? ছেলে বউ পড়ে রইলো কলয়নে…'

'ওরা হয়তো এখন রোটেনবুর্গে চলে গেছে।'

'না, রোটেনবুর্গে ওরা যেতে পারে না। আমার বোন আর বউ—দুজনে

সাপে-নেউলে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।' বেচারির ছুচোখ ছলছল করে উঠলো। 'সবাই যে যার বাড়ি যাচ্ছে, অথচ আমি যেতে পারবো না। বিশেষ করে এমন একটা সময়ে, যখন সত্যিকারের ওদের কি হয়েছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'শোন', টাক-মাথা ভদ্রলোক ওর কাঁধে হাত রাখলেন। 'এখনই এত ভেঙে পড়লে চলবে না। তুমি বরং বাড়িতে একটা তার করে দাও এবং ওদের সবাইকে রোটেনবুর্গে চলে আসতে বলো। নইলে হয়তো তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আর দেখাই হবে না।'

'সে অনেক ঝামেলা। এককাঁড়ি টাকা পয়সার ব্যাপার···তার ওপর মাথা গুঁজবে কোথায় ?'

ওরা যদি কলয়নে কাউকে ঢুকতে না দেয়, তবে বেরোতেও দেবে না। গ্রেবার মনে মনে ভাবলো। এবং কথাটা মনে হতেই হিমেল একটা স্রোত বয়ে গেলো ওর শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে। এমনই একটা আশঙ্কা দীর্ঘ-দিন ওকে তাড়া করে ফিরছিলো, অথচ তার চেহারাটা ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো না। এখন ঝাপসা হয়ে আসা বিশীর্ণ ম্লান মুখগুলোর দিকে ও একে একে তাকিয়ে দেখলো। দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে জীবনে যেটুকু শেষ সঞ্চয় ছিলো—একটু ভালবাসা, নিবিড় উষ্ণতা আর শান্তি, যার মোহে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসা—তা যেন জ্বলে ওঠার আগেই এক ফুঁয়ে কে দপ্ করে নিভিয়ে দিলো। আর ঠিক তখনই মনে হলো অলক্ষ্যে কি যেন একটা ওর বুকের ভেতর থেকে নিঃশব্দে ঝরে গেলো।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ছিঁড়ে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। আর তার চাকার প্রতিটা পাকে পাকে কে যেন আর্তনাদ করে উঠলো—ছুটি! এই আমার ছুটি!

ছয়

পরের দিন ভোরে প্রাকৃতিক দৃশ্যালী সম্পূর্ণ বদলে গেলো। বাইরে কুয়াশা কেটে গিয়ে সোনালী রোদ ঝলমল করছে। গ্রেবার এখন সরে এসে বসেছে জানলার ধারে। কাচের শার্সিতে মুখ রেখে নির্নিমেষ চোখছুটো মেলে দিয়েছে দূরে। লাঙল দেওয়া ঢেউ-খেলানো বিস্তীর্ণ মাঠ। অল্প অল্প তুষার

জমে রয়েছে এখানে ওখানে। রোদ্দুরে চিকচিক করছে। তার মাঝে হিন্দোলিত হাওয়ায় দোল খাচ্ছে রাইয়ের কচি শিষ। দুধারে দিগন্ত-ছোঁয়া রেশমের মতো মসৃণ সবুজ শ্যামলী মাঠ। কোথাও ধ্বংসের কোন চিহ্ন নেই। না তার ট্রেঞ্চ, না গোলাগুলির ক্ষতচিহ্ন।

তারপর এলো গ্রাম। সকালের আলো এসে পড়েছে গির্জার চূড়ায়। স্কুল বাড়ির ছাদে বাতাস-মোরগটা আস্তে আস্তে ঘুরছে। সরাইখানার সামনে লোকেরা গল্পগুজব করছে। খোলা দরজার ওপারে মেয়েরা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত। শাখা-প্রশাখা মেলে দেওয়া পাতাবহুল স্বচ্ছল গাছ। বাউলের পায়ের মতো এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া মেঠো পথ। শিশুরা খেলা করছে। অনেক অনেকদিন গ্রেবার কোন শিশু দেখেনি। ও গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। যেন এরই জন্যে ও এতদিন প্রতীক্ষা করে ছিলো। শুধু এর জন্যে নয়, এই মাঠ এই রোদ, গাছগাছালির এই সবুজ সমারোহ—সব সব কিছুর জন্যে।

'কেমন যেন অন্যরকম লাগছে, তাই না ?' পাশের সৈনিকটি বললো।

'নিশ্চয়ই। সম্পূর্ণ অন্যরকম।'

দিগন্তের ওপারে অরণ্যের রেখা এবার আরও স্পষ্ট হচ্ছে। টেলিফোনের তারে বসা হটটিটি পাখিটা ছোট্ট শিস দিয়ে উড়ে গেলো। সমস্ত ব্যাপারটাই গ্রেবারের কাছে একটা গানের সুরের মতো মনে হলো। সীমান্তের বুক-কাঁপানো কামানের গর্জন, বিমানের ব্যস্ত তৎপরতা এখানে নেই। ও যেন কতদিন এই দৃশ্যালীর ভেতর দিয়েই ছুটে চলতে চেয়েছিলো। এখন ওর সহযোদ্ধাদের স্মৃতিগুলোও ঝাপসা মনে হচ্ছে।

'আজ কি বার যেন ?' গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো।

'শুক্কুরবার।'

'শুক্কুরবার !'

'হ্যাঁ। কেন, কোন সন্দেহ আছে নাকি ?'

'না, ঠিক তা নয়। বারের হিসেবটা আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি না।'

কয়েকজন ইতিমধ্যেই ঝোলা থেকে রুটি বার করে চিবুতে শুরু করেছে। গ্রেবার পরের স্টেশনে কফির জন্যে অপেক্ষা করলো। রুটি এবং কফি, পাশাপাশি শব্দদুটো মনে হতেই ওর রান্নাঘরের ছবিটা ভেসে উঠলো। সাদা আর নীল ডোরাকাটা টেবিলের ঢাকার ওপর মায়ের নিজে হাতে সাজানো কফির সরঞ্জাম। প্লেটে মাখন মাখানো রুটি। খাঁচায় ক্যানারিটা

ডাকছে। জানলা দিয়ে বাগানে চোখে পড়ে জিরেনিয়াম আর গোলাপের মিষ্টি হাসি। তখন ও এমন বোকা ছিলো, ল্যাভেনডারের পাতা হাতে ঘসে ঘসে মুঠোর মধ্যে গন্ধ শুকতো। নির্যাসের স্নিগ্ধ গন্ধে চোখের পাতাদুটো ওর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসতো, আর ও স্বপ্ন দেখতো নাম না-জানা কত অচেনা দেশের। তারপর থেকে অজস্র অজানা দেশ ও দেখেছে। অথচ সেদিনের সে-স্বপ্নের সঙ্গে আজ যার আর কোন মিল নেই।

জানলা দিয়ে বের্নহার্টকে হাত নাড়তে দেখে গ্রেবার বাইরে তাকালো। মাঠে মেয়েরা কাজ করছে। মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা। কিন্তু ওর প্রত্যুত্তরে কাউকে হাত নাড়তে না দেখে বের্নহার্ট জানলায় আরও ঝুঁকে পড়লো। তবু কেউ চোখ তুলেও তাকালো না।

'আশ্চর্য!' বের্নহার্ট জানলা থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

টাক-মাথা বয়স্ক ভদ্রলোক ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।' 'অন্যসব কামরা আহত সৈনিকে ভর্তি। ওরা কেউ তোমার হাত নাড়া দেখতে পায়নি।'

'অসম্ভব! এত মেয়ের মধ্যে কেউ আমার হাত দেখতে পেলো না?'

'কলয়ন হলে এমন হতো না।' শীর্ণকায় সৈনিকটি এতক্ষণ পর এই প্রথম মন্তব্য করলো।

'সব জায়গাতেই হতো।'

বুক খালি করে বের্নহার্ট গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'অথচ এদেরই জন্যে আমরা লড়াই করে প্রাণ দিচ্ছি!'

'না, এদের জন্যে আমরা লড়াই করছি না।'

বের্নহার্ট অবাক হয়ে গেলো। 'কেন?'

'যেহেতু ওরা বন্দী রাশিয়ান কিংবা পোল, জোর করে ওদের খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

একবার ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে ট্রেন সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে পড়লো। সে এক নরক-যন্ত্রণা! একেই ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার ওপর কামরায় আবার আলো নেই। জ্বলন্ত সিগারেটের টিপটিপ আগুনগুলোকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন জোনাকির মতন—জ্বলছে নিভছে, উঠছে নামছে। যদিও সৈনিক হিসেবে ট্রেঞ্চে কাটাতে অভ্যস্ত, তবু কিছুক্ষণের মধ্যেই সুড়ঙ্গের এই অনড় অন্ধকার ওদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। বাড়ি ফেরার নেশায় মাতাল মনগুলো তখন চঞ্চল।

কে যেন বললো, 'উঃ, যেমন যান্ত্রিক জীবন, তেমনি তার পাওনা ছুটি!'

অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পেলো না।

কণ্ঠস্বরে কলয়নের সৈনিকটিকে চিনতে কারুর অসুবিধে হলো না। কিন্তু কাউকে উত্তর দিতে না দেখে গ্রেবার বললো, 'রোটেনবুর্গ কিন্তু খুব পুরনো শহর।'

'আপনি গিয়েছিলেন বুঝি?'

'না। আপনি?'

'উঁহু।'

অন্য একজন বললো, 'ছুটি যখন পেয়েছেন, বার্লিনটাও একবার ঘুরে আসুন।'

'ওসব এলাহি ব্যাপার। এত টাকা কোথায়? তাছাড়া, সত্যি বলতে কি কলয়ন ছাড়া আমি আর অন্য কোথাও যেতে চাই না।'

হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করলো।

'আঃ, বাঁচা গেল!'

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে চোখ যেন ঝলসে গেলো। যদিও তখন বিকেলের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। রোদ্দুরের রঙ এখন তরল মদের মতন। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা জুড়ে মদির মিষ্টি একটা আমেজ।

দু-একটা স্টেশন পেরোবার পরেই গোধূলি ছড়ালো তার রঙের মায়া। দুধারের ভূচিত্রাবলী গ্রেবারের কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলো। নির্দিষ্ট কোন মাঠ-ঘাট বন বা পাহাড় দেখে নয়—প্রাকৃতিক দৃশ্যালী হঠাৎ যেন নিজেই কথা বলে উঠলো। অতীত দিনের নানান রঙের স্মৃতির কথা। যার সঙ্গে স্বপ্নিল এই গোধূলির রাঙা আলোর একটা আশ্চর্য মিল আছে।

স্টেশনের নামগুলো এবার ওর ভীষণ চেনা মনে হলো। হঠাৎ চলমান জীবনে নানান টুকরো স্মৃতির মতো স্ট্রবেরি, লাক্ষা আর সূর্যস্নাত লতা-গুল্মের এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ ওর নাকে ভেসে এলো। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর গন্তব্যের শহর এসে পৌঁছবে। তাই গ্রেবার উঠে পড়লো। দ্রুত হাতে জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করলো।

ট্রেন থামতেই অনেকে হুড়মুড় করে নিচে নেমে গেলো। গ্রেবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নামটা পড়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু কোথাও কোন লেখা ওর চোখে পড়লো না।

কলয়নের সৈনিক বললো, 'আর কেন ? নেমে পড়ুন।'

'এখনও আসেনি। স্টেশনটা তো শহরের মাঝখানে।'

'হয়তো এখানে এখন সরিয়ে এনেছে। জিজ্ঞেস করুন না।'

প্লাটফর্মের আধো আলো-ছায়ায় গ্রেবার কয়েকজনকে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে যেতে দেখলো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি ভার্ডেন ?'

হু-একজন ওর দিকে তাকালো, কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিলো না। সবাই এখন মৌমাছির মতো ব্যস্ত। ও নিচে নেমে এলো। এমন সময় স্টেশন-মাস্টারের গলা শুনতে পেলো—'ভার্ডেন। যাঁরা ভার্ডেন যাবেন, নেমে যান।'

কাঁধের ঝোলাটা শক্ত করে চেপে গ্রেবার ভিড় ঠেলে এগুলো।

'ট্রেন এখন স্টেশনে থামছে না ?'

'আপনি ভার্ডেনে যেতে চান ?' কে যেন ক্লান্ত চোখহুটো টেনে তুললো।

'হ্যাঁ।'

প্লাটফর্মের পেছন দিকে চলে যান। দেখবেন বাস দাঁড়িয়ে আছে। ওরাই আপনাকে ভার্ডেনে পৌঁছে দেবে।'

গ্রেবার প্ল্যাটফর্ম ধরে হনহন করে এগিয়ে চললো। ওপরে সবুজ রঙ করা পুরনো টিনের ছাউনি। স্টেশনটা গ্রেবার এই প্রথম দেখলো। বাঁক নিতেই আবছা অন্ধকারে সারিসারি বাসগুলো ওর চোখে পড়লো।

"এটা কি ভার্ডেন যাবে ?' বাসচালককে ও জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ।'

'ট্রেন এখন আর শহর পর্যন্ত যাচ্ছে না ?'

'না।'

'কেন বলুন তো ?'

'যেহেতু ট্রেন শহরে ঢুকতে পারছে না।'

গ্রেবার অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। দেখলো নির্লিপ্ত উদাসীন হুটো চোখ, সামনের দিকে তাকিয়ে আপন মনে সিগারেট ফুঁকছে। গ্রেবার ভাবলো ওকে জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। প্রকৃত কারণ ওর কাছ থেকে কিছুই জানা যাবে না। গ্রেবার বাসে চড়লো। কোণের দিকের ফাঁকা একটা আসনে গুছিয়ে বসলো। বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। ডান-দিকে পার্কের কোণ ঘুরে যাওয়া চওড়া রাজপথে দেখলো অজস্র মানুষের নিঃশব্দ ছায়া-মিছিল। জ্বলন্ত সিগারেটের আলোগুলো অন্ধকার স্রোতের

ভাসা প্রদীপের মতো কাঁপছে। গ্রেবার ভাবলো ট্রেন হয়তো এতক্ষণে স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাসও ছেড়ে দিলো। একপাশের আসনে বসে রয়েছে কয়েকজন সামরিক অফিসার, তুজন এস এস পুলিস। অন্যপাশের আসনে কয়েকজন সাধারণ যাত্রী। সবাই হুহু করে ছুটে চলা বাসের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। কেউ কোন কথা বলছে না। কেবল ছোট্ট একটা বাচ্ছা মার কাঁধের ওপাশ থেকে তুষ্টুমি করছে। আর এপাশে সোনালী চুল হলদে রিবন-বাঁধা তুবছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে খিলখিল করে হাসছে।

বাইরে অক্ষত পীচ-বাঁধানো পথটা দেখে গ্রেবার স্বস্তি পেলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাস এসে পৌঁছে গেলো।

'সবাই নেমে যান।'

'আমরা কোথায় এলাম ?' গ্রেবার পাশের যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলো।

'ব্রামশেষ্ট্রাসে।'

'বাস আর যাবে না ?'

'না।'

ভদ্রলোক নেমে গেলেন। গ্রেবার ওকে অনুসরণ করলো।

'দেখুন, আমি ছুটিতে এসেছি···তুবছর পর···'

ভদ্রলোক ওর আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। কপালে দগদগ করছে গভীর একটা ক্ষত। সামনের কয়েকটা দাঁত নেই। 'কোথায় থাকেন আপনি ?'

'আঠারো নম্বর হাকেনষ্ট্রাসে।'

'সে তো পুরনো শহরে ?'

'হ্যাঁ, লুইজেনষ্ট্রাসের ঠিক পাশেই। কাথেরীনেনকির্খে থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়।'

'তাহলে তো পথঘাট সব এখনও মনে আছে দেখছি।'

'নিশ্চয়ই। এসব কেউ কখনও ভোলে না।'

'তাহলে এই দিক দিয়ে সোজা চলে যান। চিনতে আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

গ্রেবার ব্রামশেষ্ট্রাসে ধরে এগিয়ে চললো। তুধারের বাড়িগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। জানলাগুলোয় চাপচাপ জমাট অন্ধকার, বিমান আক্রমণের ভয়ে দরজায় কালো পর্দা টাঙানো। গ্রেবার ভেবেছিলো রাস্তায় অন্তত

আলো থাকবে। দোকানপাট তখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু সর্বত্রই একই সতর্কতা। কাঁচের শার্সি, শোকেসে কাগজের তাপ্পি মারা। আলোগুলোর চোখে ঠুলি পরানো। চওড়া রাস্তাটা মরুভূমির মতো খা-খাঁ করছে। এত নির্জনতায় গা যেন ছমছম করে। একটু এগিয়ে ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম বিক্রির দোকানটা গ্রেবার হঠাৎ চিনতে পারলো। দরজার সামনে দাঁড় করানো থাকতো খড়ের তৈরি খয়েরী রঙের একটা ঘোড়া। মাথাটা একপাশে ফেরানো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ঠিক যেন জীবন্ত। ছেলেবেলায় স্কুল পালিয়ে ফেরার পথে কতদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দেখেছে। আজও ওটাকে একইভাবে থাকতে দেখে গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। ঠিক তখনই ওর বাড়ির কথা মনে পড়লো। গ্রেবার জোরে পা চালালো। ভারী জুতোর শব্দ নিজের কানেই বেমানান ঠেকলো। সবার আগে এই জুতো জোড়াটাকে খাটের নিচে চালান করতে হবে। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে গরম জলে ভালো করে স্নান করবে। পরিষ্কার হালকা সার্টে ওকে কেমন মানাবে ভাবতেই গ্রেবারের হাসি পেলো। রাস্তাটা এখন ওর পায়ের নিচে যেন ছুটছে। হঠাৎ ও ধোঁয়ার গন্ধ পেলো।

গ্রেবার থমকে দাঁড়ায়।

গন্ধটা ঠিক চিমনি বা কয়লার ধোঁয়ার মতো নয়, বরং অগ্নিকাণ্ডে ইঁট-কাঠ পোড়া চাপা-গন্ধের মতো। ও চারদিকে তাকালো। কই, ঘর-বাড়ির তেমন তো কোন ক্ষতি হয়নি বা ছাদ জ্বলে যায়নি? মাথার ওপরে সীমাহীন গাঢ় নীল আকাশ। তাহলে?

ও সামনে এগিয়ে চললো। রাস্তাটা শেষ হয়েছে ফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা পার্কের সামনে। পোড়া গন্ধটা এখন যেন আরও কাছে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন বড় বড় গাছগুলোর ওপারেই। গ্রেবার জোরে জোরে নিশ্বাস নিলো। কিন্তু কোন্ দিক থেকে আসছে ঠিক বুঝতে পারলো না। এখন মনে হচ্ছে গন্ধটা চারদিকেই যেন আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে।

দু-মুখো একটা রাস্তার মোড়ে ও প্রথম ভাঙা বাড়ি দেখতে পেলো। গ্রেবার চমকে উঠলো, গত কয়েক বছর জীবনে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, কিন্তু এখানে এই ধরনের কিছু দেখবে ও কল্পনাও করতে পারেনি। অবাক বিস্ময়ে ও বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন জীবনে এই প্রথম ও ধ্বসে-পড়া বাড়ি দেখছে।

গ্রেবার ভাবলো হয়তো শুধু এই বাড়িটাই ধ্বসে গেছে। বাকি সব ঠিক আছে। একমুঠো ধুলোবালি নিয়ে ও শুঁকে দেখলো। না, কোন গন্ধ নেই। বাড়িটা নষ্ট হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। হয়তো কোন দুর্ঘটনা কিংবা ফেরার পথে বোমারু বিমান থেকে হঠাৎ খসে পড়া কোন বোমায় বাড়িটা চুরমার হয়ে গেছে।

এগিয়ে যেতে যেতে ও রাস্তার নাম খুঁজলো। ব্রামশেষ্ট্রাসে। হাকেনষ্ট্রাসে এখনও প্রায় আধঘণ্টার পথ। ও দ্রুত পা চালালো। পথে বড় একটা কাউকে চোখে পড়লো না। প্রতিটা বাঁকে ঠুলি পরানো এক একটা টিমটিমে বাতি। যক্ষ্মারুগীর মতন ফ্যাকাশে একটু আলো এসে পড়েছে নিচে।

এবার ধ্বংসের আসল চেহারাটা চোখে পড়লো। এখন আর একটা দুটো বাড়ি নয়, সারি সারি বাড়ি। কোনটা ভিত থেকে উড়ে গেছে, কোনটার পেছনের দেওয়াল শুধু অন্ধকারে প্রেতের মতো দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাঙা রেলিং, বাঁকানো শিকগুলো মনে হচ্ছে পাথরের গায়ে প্যাঁচানো সাপের মতন। একপাশ থেকে ভাঙা ইঁট পাটকেল সরানো দেখে গ্রেবার বুঝলো এটাও কয়েকদিন আগের ধ্বংসস্তূপ। হঠাৎ অন্ধকারে আরও গাঢ়-অন্ধকার কয়েকটা ছায়াকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসতে দেখে গ্রেবার আঁতকে উঠলো।

'কে ! কে ওখানে ?'

ঝুর ঝুর করে চুনবালি খসে পড়লো। ছায়াগুলো চট করে মিলিয়ে গেলো। গ্রেবার শুনতে পেলো ভারী নিশ্বাসের শব্দ। ও কান খাড়া করে রইলো। তারপর বুঝতে পারে এটা ওর নিজেরই নিশ্বাসের শব্দ।

এবার ও ছুটতে শুরু করলো। থমথমে বাতাসে গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠলো। ধ্বংসের নগ্নতা এখানে আরও ব্যাপক। পুরনো শহরে পৌঁছে ও অবাক হয়ে গেলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। মধ্যযুগীয় গথিক ধাঁচের পুরনো বাড়ি, উজ্জ্বল রঙ করা দেওয়ালে টাঙানো উপকথার নানান ধরনের ছবিগুলো যেন আজ চোখের নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেছে। তার জায়গায় রয়েছে বহ্ন্যুৎসবের বিশৃঙ্খল ধ্বংসাবশেষ—পোড়া কাঠ, ভাঙা দেওয়াল, পাথরের স্তূপ আর কুয়াশা ভেজা চাপচাপ জমাট অন্ধকার।

হঠাৎ ওর মনে পড়লো ওদের বাড়ির খুব কাছেই ছিলো একটা তামার কারখানা। হয়তো ওইটেই ছিলো শত্রু-বিমানের লক্ষ্যস্থল। কথাটা মনে

হতেই আদিমকালে তাড়া-খাওয়া বুনো জন্তুর মতো একটা ভয় ওর বুকে চেপে বসলো।

গ্রেবার ছুটলো।

যখন থামলো, ও আর কিচ্ছু চিনতে পারলো না। আশ্চর্য! অথচ আশৈশব এই শহর আর তার প্রতিটা অলিগলির সঙ্গে ছিলো ওর নাড়ির যোগ। আর আজ ও পথই খুঁজে পেলো না।

গ্রেবার অপেক্ষা করলো।

ব্যস্ত এক বৃদ্ধাকে হনহন করে হাঁটতে দেখে গ্রেবার দৌড়ে গেলো। 'এই যে, শুনছেন? হ্যাঁ, আমি···এই যে, হাকেনষ্ট্রাসে কোন্ দিকে বলতে পারেন?'

বৃদ্ধা প্রথমে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। তারপর ভ্রূ কুঁচকে ওর আপাদমস্তক জরিপ করে নিলেন। 'কি বললে, বাছা?'

'হাকেনষ্ট্রাসে।' গ্রেবার তখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

'ওই তো, ওখানে। দু-মুখো রাস্তার ডান দিকে ফিরেই প্রথম···'

গ্রেবার আর দাঁড়ালো না।

ডানহাতি বাঁক নিতেই চোখে পড়লো আধপোড়া বিশাল গাছগুলো। বহুদিনের প্রাচীন মহীরুহ। একদিন ওর স্তব্ধ ছায়ায় দাঁড়িয়ে কত গল্প করেছে। অথচ আজ তার পত্রপল্লব, ছোট ছোট ডালপালা সব জ্বলে গেছে, ঝরে গেছে। অবশিষ্ট দগ্ধ শাখাগুলো যেন প্রতিবাদে মুষ্টিবদ্ধ অগণন বাহু, তখনও আকাশে উঁচিয়ে রয়েছে।

এখান থেকে দাঁড়িয়ে কাথেরীনেনকির্খে গির্জার চূড়াটা স্পষ্ট দেখা যেতো। এখন আর দেখা গেলো না। হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গ্রেবার নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। এবার ও আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সামনে এগিয়ে হঠাৎ দেখলো—মানুষের ব্যস্ততা, স্ট্রেচারে কাদের যেন বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দমকলের লোকজনেরা ছুটছে, ঘন ধোঁয়ার মধ্যে জল ছেটাচ্ছে। ঠিক তার পাশেই তামার কারখানাটা তখনও ধিকধিক করে জ্বলছে। মাথার ওপর জমাট অন্ধকারে ঈষৎ লালচে একটা আভা। রাস্তার ওপারে ওদের বাড়িটা গ্রেবার এবার চিনতে পারলো।

সাত

রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা বড় গর্ত। ইট কাঠ, ভাঙা দেওয়ালের বড় বড় চাঁই দিয়ে গর্তের অনেকটা বোজানো। তার ওপর আড়াআড়ি করে ফেলে রাখা হয়েছে দোমড়ানো একটা ল্যাম্পপোস্ট। গর্তটা সাবধানে এড়িয়ে গ্রেবার ছুটে গেলো। বাড়িটার সামনে এসে যখন থামলো, আনন্দে রক্ত ওর চলকে উঠলো। আঠারো, এইটেই তো নম্বর! আশ্চর্য! শুধু আঠারো নম্বর বাড়িটাই এখনও টিঁকে রয়েছে।

কিন্তু ভুল ভাঙতে ওর দেরি হলো না। টিঁকে ছিলো কেবল সামনের দেওয়ালটা। অন্ধকারে মনে হচ্ছিলো বুঝি সম্পুর্ণ বাড়িটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু চোখে অন্ধকার সয়ে যেতেই দেখলো পেছনের দিকটা সম্পুর্ণ উড়ে গেছে। পিয়ানোটা ছিটকে উঠে এসেছে দোমড়ানো কড়ি বর্গার মাঝে। ঢাকনাটা নেই। চাবিগুলো মনে হচ্ছে ক্রুদ্ধ রাগে দাঁত মুখ খিঁচোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিরাটকায় কোন জন্তুর মতন। সামনের দরজাটা হাট করে খোলা।

গ্রেবার পা টিপে টিপে ভেতরে প্রবেশ করলো।

'খুব সাবধানে, দেখে দেখে…' ভরাট গলায় কে যেন বললো। 'কোথায় যাবে তুমি?'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না। সেই মুহূর্তে ও কোন উত্তর দিতে পারলো না। সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেলো। এইটেই ওদের বাড়ি তো? না, অন্য কারুর! অথচ সীমান্তে সারা বছর বাড়ির দরজা জানলা, প্রতিটা দৃশ্য যেন ওর চোখের সামনে ভাসতো। আর আজ ও সব গুলিয়ে ফেলেছে। এমনকি বাড়িটা রাস্তার কোন দিকে ও সেইটেই স্পষ্ট করে মনে করতে পারলো না।

'যদি মাথাটা বাঁচাতে চাও তো ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

গ্রেবার দেখলো সিঁড়ির মুখে একটা ছায়া। ছায়াটা ওর দিকে এগিয়ে এলো। একজন এয়ার-রেড ওয়ার্ডেন। 'কি চাই এখানে?'

গ্রেবার ঢোক গিললো। 'এটা কি আঠারো নম্বর?'

'আঠারো? কোথায় আঠারো?'

'কেন! এটা কি আঠারো নম্বর নয়?'

'হয়তো ছিলো। এখন আর নেই। এইটেই তো পৃথিবীর মজা!'

হঠাৎ গ্রেবারের রক্ত চড়ে গেলো। এক থাবায় ওয়ার্ডেনের কোটের কলার চেপে ধরে ও নাড়া দিলো। 'দেখুন, জ্ঞান দেবার চেষ্টা করবেন না। আঠারো নম্বর বাড়িটা কোথায় ?'

ওয়ার্ডেনও চোখ পাকালো। 'ছেড়ে দিন বলছি, নইলে পুলিস ডাকবো। এখানে কারুর দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার নেই। ওরা আপনাকে গ্রেফতার করবে।'

'না, করবে না।' গ্রেবার ওর কলার ছেড়ে দিলো। 'আমি সৈনিক। সীমান্ত থেকে আসছি।'

ওয়ার্ডেন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। হাসির দমকে চমকে চমকে উঠলো ভেতরের নিতল নিস্তব্ধতা। 'ওঃ হোঃ হোঃ, খুব একটা বললেন যা হোক! আপনার কি ধারণা এটা এখন আর সীমান্ত নয় ?'

'দেখুন, আমি আঠারো নম্বর বাড়িটা খুঁজছি। আঠারো নম্বর হাকেনষ্ট্রাসে। আমার বাবামা ওই বাড়িতে বাস করতেন।'

'হাকেনষ্ট্রাসে এখন আর কেউ বাস করে না।'

'কেউ না ?'

'কেউ না। আমি সব জানি। একদিন আমিও এখানে বাস করতুম। দশদিনে ছবার উড়ো জাহাজ থেকে বোমা ফেলা হলো। ব্যাস, সব শেষ।' লোকটা হিহি করে হাসলো। 'ওই যে বাড়িটা দেখছেন,' আঙুল দিয়ে ও সামনের ভগ্নস্তূপটা দেখালো। 'ওখানে আমার বউ চাপা পড়ে মরে আছে। কেউ ওকে খুঁড়ে বার করলো না। কেউ না। ওদের নাকি অনেক কাজ। কারুর কোন ধারণাই নেই কোথায় কি হচ্ছে। ওদের যখন সময় হলো, বাড়ির নিচে চাপা পড়ে সবাই তখন মরে ভূত হয়ে গেছে।' লোকটা আবার অদ্ভুতভাবে হাসলো। 'আপনারা সব পদক-পাওয়া সীমান্তের বীর জোয়ান, আপনারা এসব ঠিক বুঝবেন না। যান, আঠারো নম্বর বাড়ি ওইটা। যেখানে ওরা সব খোঁড়াখুঁড়ি করছে।'

'তাই কি!'

গ্রেবার এতক্ষণ দরদর করে ঘামছিলো, এবার হিমেল একটা শিহরণের ঢেউ খেলে গেলো ওর সারা শরীরে। যেখানে ওরা খোঁড়াখুঁড়ি করছে! না না, এ সত্যি নয়! সত্যি হতে পারে না! নিশ্চয়ই ও স্বপ্ন দেখছে। ঠিক তাই—এটা তো রাশিয়া নয়, জার্মানি। জার্মানি এখনও সম্পূর্ণ অক্ষত এবং নিরাপদ!

স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো ও পায়ে পায়ে ফিরে এলো। স্পষ্ট শুনতে পেলো লোকজনের চেঁচামেচি আর শাবল বেলচার ঠুংঠাং শব্দ। সামনের রাস্তাটা জলে জলাকার। হয়তো জল সরবরাহের বড় পাইপটাই ফেটে গেছে। ঢাকনা দেওয়া আলোর নিচে বহে যাওয়া স্রোতগুলো মৃদুল হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে।

উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যে লোকটা সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে, ধমকাচ্ছে, গ্রেবার তার কাছে দৌড়ে এলো। 'এটা কি আঠারো নম্বর?'

'কি?' লোকটা তেড়ে এলো। 'কি চাই এখানে? ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো।'

'আমি আমার বাবা-মাকে খুঁজছি, আঠারো নম্বরে থাকতেন। ওঁরা এখন কোথায় বলতে পারেন?'

'কি করে বলবো? আমি তো আর গণৎকার নই।'

'না, তা হয়তো নন', গ্রেবার ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। 'কিন্তু ওঁদের উদ্ধার করা হয়েছে কিনা নিশ্চয়ই বলতে পারেন?'

'না, তাও পারি না। ওসব খোঁজখবর রাখবার কাজ আমাদের নয়। আমাদের কাজ শুধু খোঁড়া। আপনি বরং অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন।'

'এখানে এখনও কেউ চাপা পড়ে আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। আপনার কি ধারণা আমরা এই রাতদুপুরে বসে বসে তামাশা করছি?' হঠাৎ ও ব্যস্ত হয়ে কাকে যেন চেঁচিয়ে বললো, 'উঁহু, ওভাবে নয়, উইলমান, ওভাবে নয়! থামো, থামো।'

উইলমান উঠে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে আর কয়েকজনও হাত গুটিয়ে নিলো। গায়ে ওদের শ্রমিকের নোংরা ফুলহাতা সোয়েটার, পরনে সামরিক ট্রাউজার। ধুলোময়লা-লাগা মুখগুলো তখন ঘামে জবজব করছে। ওদের একজন রাবিশের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে বড় একটা পাইপ পুঁতছিলো।

গ্রেবারের সামনে দাঁড়িয়েই ওভারসিয়ার চেঁচিয়ে উঠলো, 'চুপ, চুপ করো সবাই।'

সবাই চুপ করলো। আলোর বৃত্তের বাইরে গাঢ় অন্ধকার আর থমথমে নিটোল নিস্তব্ধতা। লোকটা হাতুড়ি ফেলে এবার পাইপের মুখে কান রাখলো। চোখ বুজে অনেকক্ষণ ও যেন কি শোনার চেষ্টা করলো। দূরে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে অ্যাম্বুলেন্স আর দমকলের ইঞ্জিনের গর্জন। লোকটা এবার সোজা হয়ে বসলো। 'এখনও নিশ্বাস আর গোঙানির শব্দ

শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আগের চেয়ে অনেক আস্তে। আমার মনে হয় নিচে খুব বেশি আর বাতাস নেই।'

'এটা যেমন আছে থাক। ডান দিকে আর একটা পাইপ পুঁতে দাও, যাতে ওরা আর খানিকটা পরিষ্কার বাতাস পায়।'

'পাইপটা কোথায় পুঁতবো? এখানে?'

'না। আর একটু এপাশে সরিয়ে···হ্যাঁ, ওখানে···'

গ্রেবার এতক্ষণ বিমূঢ় বিস্ময়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলো। এবার ব্যাপারটা ওর কাছে বোধগম্য হলো। ও জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি বিমান আক্রমণের চোরাকুঠরি?'

'অবশ্যই, নাহলে কেউ কি আর এতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে?'

গ্রেবার ইতস্তত করলো! 'ওরা সবাই কি এ বাড়ির লোক? ওয়ার্ডেন যে বললো এ রাস্তায় এখন আর কেউ থাকে না।'

'কে কি বললো না-বললো ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামালে চলে না। লোক নিচে চাপা পড়েছে এবং এখনও বেঁচে আছে—ব্যাস্, ওইটুকু জানতে পারলেই যথেষ্ট। ওরা কোথায় থাকে, কোত্থেকে এলো—এসব আমাদের জানার দরকার নেই।'

গ্রেবার তার সামরিক ঝোলাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিলো। ওর মন বললো ওঁরা নিশ্চয়ই এখানে চাপা পড়ে আছেন। 'দেখুন, আমি সৈনিক এবং যথেষ্ট জোয়ান। খুঁড়ে বার করার কাজে আমিও আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

'আপনি নিজে থেকে যদি সাহায্য করেন সে তো খুবই ভালো কথা। উইলমান, তোমাদের কোন বাড়তি শাবল আছে? থাকে তো এঁকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে নাও।'

প্রথম যাকে পাওয়া গেলো, ভারী লোহার বিমে পাছুটো তার থেঁতলে গেছে। লোকটা তখনও বেঁচে রয়েছে এবং জ্ঞান আছে। গ্রেবার ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো। কিন্তু চিনতে পারলো না। ধরাধরি করে ওকে স্ট্রেচারে তোলা হলো। লোকটা কোন শব্দ করলো না। কেবল ধীরে ধীরে ওর ফ্যাকাশে চোখের পাতাছুটো বন্ধ হয়ে এলো।

দরজার ঠিক সামনে আর তুজনকে পাওয়া গেলো। সম্পূর্ণ চেপ্টে গেছে। বাদামের খোলার মতো মাথাছুটো থ্যাতলানো। চোক নাক মুখ কিচ্ছু

বোঝা যাচ্ছে না। একতাল মাংসপিণ্ডের মধ্যে দুসারি দাঁত শুধু ঝিঝমিক করছে। মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল। গ্রেবার স্বস্তি পেলো। ওর বাবা-মা দুজনেরই চুল পেকে গেছে। টেনে মৃতদেহ দুটোকে ওরা রাস্তায় নামিয়ে রাখলো।

অন্ধকার এখন অনেক হালকা হয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে। মাথার ওপরে নিস্পন্দ নীলিম আকাশ। একটু অবকাশ পেতে গ্রেবার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কখন বিমান আক্রমণ হয়েছিলো?'

'কাল রাত্তিরে।'

গ্রেবারের হঠাৎ চোখ পড়লো তার হাতে। কনুয়ের নিচে থেকে গড়িয়ে আসা গাঢ় একটা রক্তের ধারা, শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। ও বুঝতেই পারলো না কখন কি ভাবে কেটেছে। বোঝার তখন কোন সময়ও ছিলো না। ভেতরে চাপা অ্যাসিড গ্যাসে সবার চোখ দিয়ে তখন টপটপ করে জল পড়ছে। বারবার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। গ্রেবার জামার হাতায় চোখ মুছে আবার তার কাজে মন দিলো।

'এই যে, ও সৈনিক···' কে যেন ওকে লক্ষ্য করে দূর থেকে চেঁচালো।

গ্রেবার ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমি? আমাকে বলছো?'

'হ্যাঁ। এখানে একটা ঝোলা ছিলো, ওটা কি তোমার?'

'কই, কোথায়?'

'ওই যে, একটা লোক নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো, এখনও চেষ্টা করলে ওকে ধরতে পারবে।'

গ্রেবার রাস্তায় নেমে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। একটু এগিয়ে দেখলো কালো একটা ছায়া ভগ্নস্তূপ বেয়ে ওপরে উঠছে। গ্রেবার অক্লেশে ওকে ধরে ফেললো এবং একটানে পেছন থেকে ঝোলাটা ছিনিয়ে নিলো। আবছা চাঁদের আলোয় দেখলো শীর্ণ কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ। তখনও হাঁপাচ্ছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। ঠেলে বেরিয়ে আসা জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। চোখের মণিদুটো স্থির লক্ষ্যে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কি রে বাবা, লোকটা পাগল নাকি! গ্রেবার ওকে কিছু না বলে আবার রাস্তায় নেমে এলো।

আর ঠিক তখনই একটা জিপ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়ালো ওর পেছনে। গ্রেবার ঘুরে তাকাবার আগেই দুজন সশস্ত্র এস এস পুলিস অফিসার জিপ থেকে লাফিয়ে নামলো।

'কি হচ্ছে এখানে?'

'কিছু না।' গ্রেবার ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো।

এস এস পুলিস তুজন ওকে তুপাশে ঘিরে ফেললো। 'তাহলে কি করছো এখানে ? কাগজ দেখি।'

'আমি লোকজনদের খোঁড়াখুড়ির কাজে সাহায্য করছি। ওই যে, ওখানে। আমার বাবা-মা হয়তো ওখানে চাপা পড়ে রয়েছেন। তাই আমি···'

'কাগজ দেখি।' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তুজনের মধ্যে বয়স্ক এস এস পুলিস অফিসারের কণ্ঠস্বর।

গ্রেবারের চোখতুটো ক্ষোভে জ্বলে উঠলো। ও জানে সীমান্ত-সৈনিকদের জেরা করার কোন অধিকার এস এসদের নেই। তবু ও আর কথা বাড়ালো না, ছুটির কাগজপত্তর বার করে দিলো। টর্চের আলো ফেলে বয়স্ক এস এস অফিসার পড়ে দেখলো। অন্ধকারে টর্চের আলোয় কাগজটা এমন গনগনে লাল হয়ে উঠলো, গ্রেবারের মনে হলো কাগজটা বুঝি পুড়েই যাবে। গ্রেবার অপেক্ষা করলো। হাতের একটা পেশীতে ও এখন যন্ত্রণা অনুভব করলো। অবশেষে আলোটা নিভে গেলো।

'আপনি তাহলে আঠারো নম্বর হাকেনষ্ট্রাসে বাস করতেন ?'

'হ্যাঁ,' গ্রেবার এবার অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'যেখানে আমি এতক্ষণ ওদের উদ্ধারকাজে সাহায্য করছিলাম।'

'কোথায় ?'

'ওই তো, ওখানে। ওরা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ওর নিচে···'

'ওটা আঠারো নম্বর নয়।'

গ্রেবার ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো, 'কি বললেন ?'

'ওটা আঠারো নয়, ওটা বাইশ নম্বর। আঠারো নম্বর এইটে।'

আঙুল দিয়ে যে জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়া হলো, গ্রেবার তাতে আর একবার চমকে উঠলো। বাড়িটা পিয়ানো-ওয়ালা ভাঙা বাড়িটার ঠিক পাশেই। আসার সময় ওখানে ও দেখে এসেছিলো জমাট অন্ধকার। হঠাৎ কেন জানি গ্রেবারের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠলো। আর ঠিক তখনই পিয়ানোর দৃশ্যটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই কুৎসিত জন্তুটা গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে ওর বুকের কাছে।

'আপনি ঠিক জানেন ?'

'নিশ্চয়ই।' বয়স্ক এস এস অফিসার ওর কাগজপত্তর ফিরিয়ে দিলো।

'কিন্তু রাস্তার এদিকটা তো দেখে মনে হচ্ছে না···'

'না, এদিকে বোমা পড়েছে সাত-আট দিন আগে।'

'আচ্ছা, ওখান থেকে কাউকে উদ্ধার করা হয়েছে কিনা বলতে পারেন ?'

'ঠিক বলতে পারবো না। তবে সবসময়েই কেউ না কেউ বেঁচে যায়। এমনও হতে পারে, আপনার বাবা-মারা তখন হয়তো ওখানে ছিলেন না। কেননা বিমান আক্রমণের আগে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং সাধারণত সবাই তখন কাছের কোন চোরাকুঠরিতে আশ্রয় নেন।'

'আচ্ছা, ওঁদের এখন কোথায় খুঁজে পাবো ?'

'এই রাত্তিরে কোথাও খুঁজে পাবেন না। আর সে চেষ্টাও করবেন না। আজ রাতটা বরং কোনক্রমে রেডক্রসের তাঁবুতে কাটিয়ে দিন, কেননা টাউন হলে এখন জায়গা পাবেন না। বাড়িটার অনেকটাই উড়ে গেছে, বুঝতেই পারছেন—সবকিছু এখন একটা তালগোল পাকিয়ে রয়েছে। কাল সকালে একবার আঞ্চলিক অফিসে গিয়ে খোঁজ নেবেন।'

'বাড়িটার নিচে এখনও কেউ চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?'

'আদৌ অসম্ভব নয়। চারদিকে এখনও অসংখ্য মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে। সবাইকে উদ্ধার করতে গেলে একশো গুণ বেশি লোকের দরকার। শহরে তো আর কোথাও বোমা পড়তে বাকি নেই।'

ওরা আর দাঁড়ালো না। গ্রেবার ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'আর একটা কথা, এটা কি নিষিদ্ধ এলাকা ?'

'না তো !'

'আঠারো নম্বর বাড়ির কাছে একজন এয়ার রেড ওয়ার্ডেন যে বললো…'

বয়স্ক এস এস অফিসার হেসে ফেললো। 'ওটার মাথার স্ক্রু একটু ঢিলে আছে।'

গ্রেবার আঠারো নম্বরে ফিরে এলো। তখন একপাশ থেকে ভগ্নস্তূপ খানিকটা পরিষ্কার করা হয়েছিলো, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করার মতো কোন ফাঁক ও খুঁজে পেলো না। ইঁট পাথর বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে স্তূপের মাঝে মাঝে জায়গা থেকে খানিকটা সিঁড়ি চোখে পড়লো। প্রায় অক্ষত। কিন্তু স্তূপের গা বেয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়িটা যেন মিলিয়ে গেছে কোন অতল শূন্যতায়। সিঁড়ির মাথায় ধুলোয় ঢাকা একটা চেয়ার। ঠিক যেন কে নিজে

হাতে সাজিয়ে রেখে গেছে। পাশের বাড়ির পেছনের দেওয়ালটা সোজা আড়াআড়িভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওদের ফুলের বাগানে। ওখানে কার যেন ছায়া নড়লো! না, একটা বেড়াল। কিছু না ভেবেই গ্রেবার ঢিল ছুঁড়ে মারলো। বেড়ালটা এক লাফে বাগান পেরিয়ে চলে গেলো। গ্রেবার তবু ছাড়লো না, তার দিকে তেড়ে গেলো। কে জানে হয়তো মড়ার লোভেই ও এখানে ঘুরঘুর করছে। বাগানের পরিষ্কার খানিকটা অংশ, বিশেষ করে গাছের ডালে বাঁধা কাঠের দোলনাটা দেখে ও বাড়িটা চিনতে পারলো। দোলনার ঠিক পেছনে বড় একটা বাতাবিলেবুর গাছ। ফুল ফোটার সময়ে মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে থমথম করতো। ছেলেবেলার অনেকগুলো স্মৃতি একসঙ্গে ভিড় করে এলো ওর মনে। অথচ এই ধ্বংসস্তূপ, ভেঙে পড়া প্রাচীন নগরীর সারাটা দৃশ্যালী, বাতাবিলেবুর এই গাছ—সবকিছুই এখন এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত আশ্চর্য রহস্যময় মনে হলো। যেন এর কোনটাই সত্যি নয়। স্বপ্ন! আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো এ-ও কোন অবাক কাণ্ড!

পেছনের দরজাটাও চাপা পড়ে গেছে। গ্রেবার কোন দিক দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করতে পারলো না। কি মনে হওয়ায় লোহার একটা বিমে ও শব্দ করলো। তারপর কান পেতে রইলো। হঠাৎ মনে হলো ও যেন চাপা গোঙানির মতো শব্দ শুনতে পাচ্ছে। নিশ্চয়ই বাতাস, ও ভাবলো। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আবার শুনলো। গ্রেবার দৌড়ে গেলো সিঁড়ির দিকে। বেড়ালটা ছুটে পালালো ওর পায়ের তলা দিয়ে। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ও আবার কান পাতলো। তখনই, ঠিক তখনই ওর হঠাৎ করে মনে হলো—অন্ধকারের নিচে চাপা পড়ে ওর বাবা-মা অসহায় আর্তনাদ করছেন আর ওর দিকে হাতগুলো মেলে দিয়ে কাতর চোখে তাকিয়ে আছেন।

'না, না না—'

গ্রেবার তরতর করে নিচে নেমে এলো। তারপর যেখানে উদ্ধারের কাজ চলছে সেই বাড়িটার দিকে ছুটে গেলো। হাঁটু দুটো তখন ওর থরথর করে কাঁপছে। সার্টে ভেতরটা ঘামে ভিজে উঠেছে।

'এই যে, শুনছেন? এটা আঠারো নম্বর নয়, আঠারো নম্বর ওটা। দয়া করে আপনারা একবার চলুন।'

'কি বলছেন আপনি?' তদবির তদারকে ব্যস্ত ওভারসিয়ার ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললো।

'বিশ্বাস করুন, এটা আঠারো নম্বর নয়। আমার বাবা-মা হয়তো এখনও···'

'কোথায় ?'

'ওখানে। শিগ্‌গির একবার দয়া করে চলুন।'

অন্য সবাই ওর দিকে ফিরে তাকালো।

'শুনুন,' ওভারসিয়ার বিব্রত বোধ করলো। 'ও বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো। এখন আর কিছু করার নেই। তাছাড়া এখানে আমাদের এখনও কয়েকজনকে উদ্ধার করতে হবে।'

'পরে করবেন।'

'অসম্ভব! দু-একজন এখনও বেঁচে আছে। আপনি কি চান ওরা মারা যাক।'

'নিশ্চয়ই না। কিন্তু···'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করে বৃথা সময় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই।' ওভারসিয়ার এবার অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওখানে এখন আর কেউ জীবিত নেই। থাকলে আমরা নিশ্চয়ই খবর পেতাম।'

ওভারসিয়ার আবার তার কাজে মন দিলো। গ্রেবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। ভেবেই পেলো না এবার ও কি করবে। ওর ঝাপসা উদাস চোখের সামনে শ্রমিকদের কালো কালো পিঠগুলো এদিকওদিক নড়ছে। অ্যাম্বুলেন্সের কর্মচারীরা স্ট্রেচারে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলোর নিচে বহে যাওয়া জলের ছোট ছোট ঢেউগুলো তিরতির করে কাঁপছে। গ্রেবার আগে ভেবেছিলো সারাক্ষণ ওদের সঙ্গে কাজ করবে। কিন্তু এখন ওর মনে হলো শক্তির যাকিছু সঞ্চয় সব যেন লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। সারাদিনের শ্রান্তি সর্বাঙ্গে মেখে কোন রকমে ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে ও আবার সেই আঠারো নম্বরে ফিরে এলো।

একার পক্ষে এখানে কিছু করা অসম্ভব! এতক্ষণ পর গ্রেবারের যেন চোখ ফেটে জল এলো। মামণি, আমি জানি না তুমি এখন কোথায়। ওরা হয়তো ঠিকই বলেছে—এই ধ্বংসস্তূপ থেকে হয়তো তুমি পালাতে পেরেছো। হয়তো তুমি এখন দক্ষিণ জার্মানির কোন গ্রামে! হয়তো তুমি রোটেনবুর্গে। হয়তো তুমি এখন নিরাপদ কোন আশ্রয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছো। সত্যিই তুমি নিরাপদ কিনা আমি জানি না—মা! মাগো! মামণি। তুমি নিজে চোখে দেখে যাও তোমার এর্নস্ট আজ কি ভীষণ নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেছে।

সিঁড়ির একটা ধাপে ও চুপচাপ বসে রইলো। আচ্ছা, সিঁড়িকটা যদি রাবণের তৈরি সিঁড়ির মতন উঠতে উঠতে আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে যেতো আর দেবদূতেরা সেই সিঁড়ি বেয়ে আমার সঙ্গে নিচে নেমে আসতো, তাহলে কি হতো ? তাহলে কি ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আমি ওঁদের উদ্ধার করতে পারতাম ? ধ্বংসস্তূপ আমি জীবনে অনেক অনেক দেখেছি। কিন্তু আজকে ছাড়া সত্যিকারের ধ্বংসস্তূপ কি আমি আর একটাও দেখেছি ? যেন জীবনে এই প্রথম দেখছি—যার সঙ্গে এ অনুভূতির কোন মিল নেই, এতদিন যা ছিলো সুপ্ত, সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত।

চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। সীমাহীন আকাশে নিঃসঙ্গ একটা চাঁদ। থৈথৈ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সারা শহর। যেন রূপকথার কোন্ অচিনপুরী। বেড়ালটা এতক্ষণ ঘাপটি মেরে কোথায় লুকিয়ে ছিলো, এবার বেরিয়ে এলো। জ্যোৎস্নার মায়ালোকে ওর সবুজ চোখের মণিদুটো পান্নার মতো জ্বলছে। গ্রেবারকে ও অনেক অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলো, তারপর খুব সাবধানে গুটি গুটি পায়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো। পায়ের কাছে দু-একবার ঘুরঘুর করে জুতোর সঙ্গে গা ঘসলো। তারপর পিঠ বেঁকিয়ে, লেজ ঘুরিয়ে খুব আস্তে আস্তে গরগর করে একটা আওয়াজ করলো—'ম্যাও !' সবশেষে ওর কোল ঘেঁষে চুপচাপ শুয়ে রইলো। গ্রেবার এসব কিছুই জানতে পারলো না।

আট

ভোরের দিকে গ্রেবার ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সকালের একফালি সোনালী আলোয় ওর ঘুম ভাঙলো। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি, এভাবে ঘুমনোর অভ্যেস ওর দীর্ঘদিনের। কিন্তু পরমুহূর্তে এক ঝটকায় ওর সব স্মৃতি যেন ফিরে এলো। সিঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসে ও ভাববার চেষ্টা করলো। বেড়ালটা একটু দূরে আধভাঙা স্নানের পাত্রটার পাশে বসে নিরুদ্বিগ্নে তার থাবা চাটছে। যেন এসব বীভৎস নারকীয় তাণ্ডব ওর কাছে কিছু নয়।

গ্রেবার ঘড়ি দেখলো। প্রায় সাতটা বাজে। আঞ্চলিক অফিস এখনও খোলেনি। আড়মোড়া ভেঙে ও উঠে পড়লো। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা, হাত-দুটো বিশ্রী নোংরা। স্নানের পাত্রে দেখলো পরিষ্কার খানিকটা জল। গ্রেবার

ঝুঁকে পড়লো। এর মধ্যে বৃষ্টিতো হয়নি! তাহলে জল কোথেকে এলো? নিশ্চয়ই দমকলের। কথাটা ভাবতেই ও একটু স্বস্তি পেলো। ঠিক তখনই জলের পাত্রে অপরিচিত একটা মুখ দেখে ও চমকে উঠলো। আশ্চর্য, এটা ওরই মুখ! খানিকক্ষণ মুখটা ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। তারপর ঝোলা থেকে একটুকরো সাবান বার করে মুখ হাত পা পরিষ্কার করে ধুলো। হাতের ক্ষত দিয়ে নতুন করে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে খোলা হাওয়ায় ও রক্ত শুকিয়ে নিলো। পোশাকের ধুলো ময়লা যতটা সম্ভব রুমাল দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করলো।

হঠাৎ গ্রেবারের ভীষণ খিদে পেলো। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। যেন সারা রাত ধরে ও চেঁচিয়েছে। টিনের পাত্র থেকে কালো কফি, ঝোলা থেকে রুটি বার করে ও চিবতে শুরু করলো। বেড়ালটা চোখ মিটমিট করে তাকালো। 'ম্যাও!' গ্রেবার একটুকরো রুটি ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো। রুটিটা ছোঁ-মেরে নিয়ে বেড়ালটা আবার তার আগের জায়গায় ফিরে গেলো। গ্রেবার ওর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। ছাই ছাই রঙের মসৃণ লোম, পায়ের থাবাগুলো সাদা। ভগ্নস্তূপের চারদিকে ছড়ানো ভাঙা কাচের টুকরোগুলো সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। গ্রেবার তার ঝোলাটা কাঁধে ফেলে রাস্তায় নেমে এলো।

বারবার থমকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও দেখলো। শহরের জীর্ণ মলিনতা এখন আরও বেশি করে ওর চোখে পড়ছে। দাঁতহীন মাড়ির মতো সর্বাঙ্গে গভীর ক্ষত। কাথেরীনেনকির্খের প্রাচীন গির্জার সবুজ চূড়াটা উধাও হয়ে গেছে। হাকেনষ্ট্রাসের দু-একটা বাড়ি ছাড়া, শহরটাকে আদিমকালের বিশাল কোন দৈত্য যেন দুপায়ে দলে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। ওর স্বপ্নে দেখা শহরের সঙ্গে এখন এর আর কোন মিল নেই। এ যেন রাশিয়ারই কোন বিধ্বস্ত নগরী।

পিয়ানোওয়ালা বাড়ির সামনে এসে এয়ার রেড ওয়ার্ডেনকে দেখে গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। সদর দরজা খোলা না থাকলে বোঝাই যাবে না, ওটার কোন ক্ষতি হয়েছে। মনে হবে যেন সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ—

ওয়ার্ডেনের কর্কশ কণ্ঠস্বরে গ্রেবারের চমক ভাঙলো। 'বলি, এখানে দাঁড়িয়ে কি মতলব ভাঁজছো, হে? চুরিটুরি নয় তো? জানো, এটা নিষিদ্ধ এলাকা?'

'জানি।' গ্রেবারের মনে পড়লো লোকটা পাগল। এবং এটা যে নিষিদ্ধ এলাকা নয়, তা ও জানে। তবু ওকে ঘাঁটালো না। বরং শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তাই তো তোমার কাছে এলাম। আমার বাবা-মার কোন খবর দিতে পারো? পল আর মারী গ্রেবার। এই পাশের বাড়িতে থাকতেন।'

ওয়ার্ডেন বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হাসলো। 'ওঃ, তুমিই সেই সীমান্তের বীর সৈনিক। তোমার কি ধারণা, তুমিই একমাত্র তোমার বাবা-মাকে হারিয়েছো? আর কেউ হারায়নি?' হঠাৎ ও রেগে উঠলো। 'কেন, তোমার চোখ নেই? দেখতে পাও না? এই তো সব দরজার কপাটে রয়েছে।'

'কই! কি রয়েছে?'

গ্রেবার ওকে প্রায় ঠেলেই দরজার কপাটদুটোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো। দেখলো অসংখ্য ছোট ছোট কাগজের টুকরো আঁটা। তাতে নানা ধরনের লেখা। হারানো মানুষের নাম আর ঠিকানা। পেনসিল, কাঠকয়লা কিংবা চক্‌খড়ি, যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই দিয়ে লিখেছে: 'হেনরিখ আর জর্জ, তোমরা হেরমান জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করো। ইরমা মারা গেছে। তোমাদের মা'···'যে পারো বার্নহিলডে শ্‌মিটের ঠিকানা দাও। ৪নং ট্যুরিং গেষ্ট্রাসে'···'অটো, আমরা এখন ইয়বুর্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছি।'··· 'মেরী, তুমি কোথায়?'···এই ধরনের আরও নানান আবেদন নিবেদন।

গ্রেবার ঘুরে দাঁড়াতেই ওয়ার্ডেন জিজ্ঞেস করলো, 'কি, পেলে কিছু?'

'না। ওঁরা তো আর জানেন না যে আমি আসছি।'

ওয়ার্ডেন চোখ ঘুরিয়ে ভ্রূ নাচিয়ে হিহি করে হাসলো। 'এখানে কেউ কারুর কথা জানে না···হিহি···কেউ না! আর যাদের কেউ চায় না, তারাই শুধু বেঁচে থাকে···হিহি, হিহি···তুমি আমি, আমরা সব্বাই শুধু খুঁজছি আর খুঁজছি।'

ঠিক এই মুহূর্তে গ্রেবার কিছু বলতে পারলো না। নিঃশব্দ যন্ত্রণায় বুকের অতল থেকে কেবল উঠে এলো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস।

'তুমি বরং তোমার নামটা এখানে কোথাও লিখে দাও। তারপর অপেক্ষা করো থাকো, দেখবে একদিন ঠিক উত্তর আসবে।'

গ্রেবার চমকে উঠলো। এমন সুসংলগ্ন কথার বাঁধুনি—ওকি পাগল, না দ্রষ্টা! ওয়ার্ডেনের মুখটা এখন থমথমে, বিষণ্ণ ম্লান—শুধু ওর দূরায়ত চোখের ভাষা গ্রেবারের কাছে মনে হলো দুর্বোধ্য।

এক টুকরো কাগজের জন্যে গ্রেবার চারদিকে তাকালো। ভাঙা ফ্রেমে হিটলারের একটা রঙিন ছবি ছাড়া ও আর কিছুই খুঁজে পেলো না। কিছু না ভেবে ছবিটা ছিঁড়ে ফেললো। পেছনের পিঠটা সাদা। পেনসিল বার করে ভাবলো কি লিখবে। শেষ পর্যন্ত ভেবে ভেবে লিখলো—

'পল ও মেরী গ্রেবারের খবর চাই। আমি এখানে ছুটিতে রয়েছি।

এর্নস্ট।'

'ছিঁড়ে ফেললে?'

'কি?'

'ফুরারের ছবিটা।'

'ওটা এমনিতেই ছেঁড়া ছিলো।'

গ্রেবার ভেবে পেলো না চিঠিটা কি দিয়ে আটকাবে। শেষ পর্যন্ত চারটে পিন দিয়ে আটকানো একটা চিঠি থেকে দুটো পিন খুলে নিলো। মনে হলো এটা অন্যায়। অনেকটা অন্যের কবর থেকে উষ্ণতা চুরি করে নেওয়ার মতন। তবু এছাড়া ওর অন্য কোন উপায় ছিলো না। পিনদুটো দিয়ে চিঠিটা ও দরজার গায়ে গেঁথে দিলো।

'বাঃ, চমৎকার', ওয়ার্ডেন মন্তব্য করলো। 'কারুর বিয়েতেও এমন সুন্দর হয় না!'

হঠাৎ কি মনে হওয়ায় গ্রেবার বাকি ছবির আরও খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিলো এবং দরজা থেকে পাওয়া লুসি পরিবারের ঠিকানাটা টুকে রাখলো। ওদের ও চেনে। ভাবলো এই ঠিকানায় চিঠি দিয়ে বাবা-মার খবর জানতে চাইবে। তারপরেই কি ভেবে ছেঁড়া ছবির বাকি অংশে একই সংবাদ লিখে গ্রেবার আবার আঠারো নম্বরে ফিরে এলো। দুটো পাথরের মাঝে চিরকুটটা এমনিভাবে রেখে দিলো যাতে সহজে চোখে পড়ে। দু-জায়গাতেই থাক, যদি কোন খবর আসে। ক্ষীণ একটা আশায় গ্রেবারের বুক অনেকটা হালকা হয়ে গেলো। ফেরার পথে রাস্তার ওপারে বড় বাদাম গাছটা ওর চোখে পড়লো। বসন্তে পল্লবিত স্বচ্ছল চিকন পাতাগুলো সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। আর তার শাখা প্রশাখায় এক ঝাঁক চড়ুই কিচিরমিচির করছে। হয়তো নীড় বেঁধেছে।

আঞ্চলিক অফিসে 'নিরুদ্দেশ'এর জন্যে আলাদা একটা বিভাগ খোলা হয়েছে। কাঁচা দেবদারু কাঠের তক্তা দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘেরা। ভেতরের

কাউণ্টারে একজন সশস্ত্র অফিসার এবং দুজন মহিলা কর্মচারী তখন রীতিমত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। চারদিকেই কাতারে কাতারে অজস্র মানুষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শুধু প্রতীক্ষা করছে।

'নাম?' ডানদিকের মহিলাটি জিজ্ঞেস করলো। বেশ ভালো দেখতে চওড়া মুখ, মাথায় লাল রেশমের ফিতে বাঁধা।

'গ্রেবার। পল গ্রেবার, মেরী গ্রেবার। কর-বিভাগের কেরানী। আঠারো নম্বর হাকেনষ্ট্রাসে।'

'জোরে বলুন।'

'গ্রেবার,' বাইরের গুনগুন শব্দে সত্যি তখন কান পাতা দায়। তাই গ্রেবার সামনে ঝুঁকে জোরে জোরে বললো, 'মেরী আর পল গ্রেবার। কর-বিভাগের কেরানী।'

অন্য মহিলাটি নামের তালিকা খুঁজলো। 'গ্রেবার, গ্রেবার···' নিচের দিকে এক জায়গায় এসে ওর আঙুল থেমে গেলো। 'গ্রেবার, হ্যাঁ···প্রথম নামটা কি যেন বললেন?'

'পল আর মেরী গ্রেবার।'

'কি?'

'পল আর মেরী গ্রেবার!' হঠাৎ গ্রেবার ক্ষেপে গেলো, ওর মনে হলো এ অসহ্য।

'না। এটা এর্নস্ট গ্রেবার।'

'এর্নস্ট গ্রেবার আমার নিজের নাম। এছাড়া অন্য কোন···'

'না, অন্য কোন গ্রেবারের নাম দেখছি না।' মহিলাটি চোখ তুলে তাকিয়ে হাসলো। 'আপনি ইচ্ছে করলে কয়েকদিন পরে এসে একবার খোঁজ নিতে পারেন। আমাদের সব খবর এখনও এসে পৌঁছয়নি। এর পরে কে আছেন?'

গ্রেবার নড়লো না। 'আমি আর কোথায় খোঁজ করতে পারি?'

'রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

গ্রেবারের মনে হলো ওর পেছন থেকে কে যেন কথা বলছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো জীর্ণ শীর্ণ কায়া। এক বৃদ্ধা, বকের মতো সরু সরু ঠ্যাং। গ্রেবার একপাশে সরে দাঁড়ালো।

কাউণ্টারের পাশে বিহ্বলের মতো ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেলো, যার মাথামুণ্ড ও কিছুই বুঝতে পারলো না। যেন এতক্ষণ যে ক্ষীণ আশাটুকুকে ও বুকের মধ্যে লালন করছিলো, এবার

মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। সশস্ত্র অফিসারটি ভেতর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। 'এই যে, হের গ্রেবার ? এই যে ···হ্যাঁ, আমি বলছি···আপনি কিন্তু মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার আত্মীয়দের নাম এখানে না থাকায় বরং আপনার খুশী হওয়াই উচিত।'

গ্রেবার যেন আকাশ থেকে পড়লো। 'কেন বলুন তো ?'

'এটা নিহত কিংবা মারাত্মক আহতদের নামের তালিকা। ওঁদের নাম যখন এখানে নেই, ধরে নিতে পারেন ওঁরা নিরুদ্দেশ।'

'নিরুদ্দেশ !'

'হ্যাঁ, নিরুদ্দেশ।'

'আচ্ছা, ওঁদের খবর কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন ?'

'দেখুন, নিরুদ্দেশ মানেই নিরুদ্দেশ।' অফিসারটি বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। 'ওঁদের যদি খুঁজেই পাওয়া যাবে, তাহলে আর নিরুদ্দেশ থাকবেন কেন ?'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না। অপলক চোখে শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। সমস্ত সকালটাই ওর কাছে অর্থহীন মনে হলো।

রেজিস্ট্রি অফিসটা টাউন হলের একেবারে শেষ প্রান্তে। তখনও পোড়া ইঁট কাঠ আর বারুদের গন্ধ নাকে আসছে। পুরো একঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর গ্রেবারের পালা এলো। কাউণ্টারে বিশ্রী ফ্যাকাশে দেখতে এক-জন ভদ্রমহিলা বসে। চোখে চশমা। যেমন বদখত চেহারা, তেমনি তিরিক্ষি মেজাজ। জিজ্ঞেস করবে কি, ওকে দেখেই গ্রেবারের মেজাজ খিঁচড়ে গেলো। অবশ্য তেমন করে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না। ভদ্রমহিলা নিজে থেকেই কলকল করে বকে চললেন, 'দেখুন, আগেভাগেই আপনাকে বলে রাখি, এখানে সুনিশ্চিত করে কিছু বলা বা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত খাতাপত্তর এখন এলোমেলো হয়ে রয়েছে। অর্ধেক ফাইল তো পুড়েই গেছে। যাও বা কিছু ছিলো, দমকল বাহিনীর ভূতগুলো তাকে জলে কাদায় মাড়িয়ে একেবারে একশা করে ছেড়েছে। বুঝতেই পারছেন, এ অবস্থায় কিছু বলা মানে···'

'ফাইলগুলো তো আগে থেকে কোথাও সরিয়ে রাখতে পারতেন ?' গ্রেবারের পেছন থেকে তাগড়াই দেখতে ভারিক্কি চেহারার একজন সৈনিক কথাটা বললো।

'সরিয়ে! ওমা, সরিয়ে রাখবো কোথায়?' ভদ্রমহিলা চোখ কপালে তুললেন। 'সারা শহরে সরিয়ে রাখার মতো কোথাও কি কোন জায়গা আছে? তাছাড়া সরিয়ে রাখার মালিক তো আর আমি নই। যান না, ওপর মহলে গিয়ে আমার নামে নালিশ করে আসুন।'

সৈনিকটি গ্রেবারের বগল ধরে টান দিলো। 'চলুন মশাই, চলুন। এখানে হাপিত্যেশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। দূর দূর, কতকগুলো গবেট এসে জুটেছে···কেউ কিস্সু জানে না···'

সৈনিকটি একরকম প্রায় টানতে টানতেই গ্রেবারকে বাইরে নিয়ে এলো। টাউন হলের সামনের দিকটা উড়ে গেছে। বাগানের অর্ধেকটা নেই বললেই চলে। বিসমার্কের প্রতিমূর্তির কেবল পাছুটো রয়েছে। মারীনকির্খের ভাঙা চুড়োর চারপাশে সাদা পায়রাগুলো ডানা ঝাপটিয়ে উড়ছে।

'আপনি কাকে খুঁজছেন?'

'আমার বাবা-মাকে।'

'আমি খুঁজছি মশাই আমার স্ত্রীকে। আগে কিছু জানাইনি। ভাবলুম ওকে একেবারে অবাক করে দেবো।'

'আমারও ওই একই ব্যাপার। আমিও চাইনি ওঁদের অহেতুক বিব্রত করতে। আগে দু-তিনবার ছুটি পেতে পেতেও পাইনি। এবারেরটা হঠাৎ করেই পেয়ে গেলাম। তখন আর চিঠি লেখারও সময় ছিলো না।'

'জগাখিচুড়ি আর কাকে বলে।'

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে মার্কেট স্কোয়ারে এসে পৌঁছলো। এখন এর নাম হিটলারপ্ল্যাটস্। তারও আগে ছিলো কাইজার উইলহেলম্প্লাটস্।

সৈনিকটি জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?'

'না। একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, শহরের বুক থেকে এতগুলো লোক কি করে উধাও হয়ে যেতে পারে।'

'আর বলবেন না, মশাই—ম্যাজিক, স্রেফ্ ম্যাজিক। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, গত পাঁচ দিন ধরে আমি আমার স্ত্রীকে সমানে খুঁজছি। দিন-রাত হন্যে হয়ে কেবল খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

'কিন্তু, কেমন করে তা সম্ভব? নিশ্চয়ই উনি···'

সৈনিক হাসলো। 'বেমালুম হাওয়া।'

'না, আমি তা বলছি না,' গ্রেবার ইতস্তত করলো। 'গ্রামগুলো এখনও নিরাপদ, হয়তো কাছাকাছি কোন গ্রামে···'

'গ্রাম তো আর এক-আধটা নয়। সব গ্রাম খুঁজতে গেলে আমার মাথার চুল পেকে যাবে। ততক্ষণে দেখবেন আপনার ছুটিও ফক্কা।'

কথাটা সত্যি, গ্রেবার ভাবলো। এভাবে খুঁজে কোন লাভ নেই, এখন ওর মনে হলো ওঁরা যেখানেই থাকুন না কেন, বেঁচে থাকলেই ও খুশী হবে।

'দেখুন, সময় যখন কম, এরকম এলোমেলোভাবে খুঁজে কোন লাভ নেই।' সৈনিকটিকে এখন অনেকটা সপ্রতিভ মনে হলো। 'এবং তাতে পাগল হতে আর বেশি সময় লাগবে না। যা করা উচিত ভেবেচিন্তে মাথা ঠাণ্ডা করে করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। তাই ভাবছি পরিচিত ছু-এক জনদের ঠিকানায় খোঁজখবর নেবো। ওঁরা সব একই জায়গায় পাশাপাশি থাকতেন।'

'মন্দ নয়। যদিও সবাই এখন বিচ্ছিন্ন এবং ভয়ে কেউ আর মুখ খুলতে চাইবে না, তবু অনেক ভালো।' সৈনিক থামলো। রাস্তায় বয়ে চলেছে নিঃশব্দ জনস্রোত। 'আচ্ছা, আমরা তো পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি? যেমন ধরুন—আমি যেখানে যেখানে যাবো আপনার বাবা-মার খোঁজখবর নেবো, আর আপনি যেখানে যাবেন আমার স্ত্রীর কথাও জিজ্ঞেস করবেন।'

'আমি রাজী।'

'বেশ। আমার নাম ব্যোটশার। আমার স্ত্রীর নাম আলমা, আলমা ব্যোটশার।'

গ্রেবার নামটা টুকে নিলো এবং অন্য একটা কাগজে বাবা-মার নাম ছুটো লিখে ব্যোটশারের হাতে দিলো। ব্যোটশার নামছুটো পড়ে দেখলো। তারপর কাগজটা সযত্নে পকেটে রেখে দিলো।

'এখন তো আমরা ছুজনে বন্ধু হয়ে গেলাম, কি বলেন?' ব্যোটশার গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'নিশ্চয়ই।'

'কোথায় খোঁজ করলে আপনাকে পাবো?'

'সেই তো ভাবছি। আগে কোথাও একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করতে হবে।'

'এতে আর এত ভাবাভাবির কি আছে? সোজা তাঁবুতে চলে যান। আমাদের মতো ছুটিতে আসা অভাগাদের জন্যে কয়েকটা অস্থায়ী সৈন্য-শিবির খোলা হয়েছে। প্রথমে কম্যাণ্ড্যাণ্টস্ অফিসে গিয়ে জানান। ওরা আপনাকে একটা অনুমতিপত্র দেবে। আপনি কি ওখানে গিয়েছিলেন নাকি?'

'না।'

'তাহলে আর দেরি করবেন না। চেষ্টা করবেন আটচল্লিশ নম্বর তাঁবুর অনুমতিপত্র পেতে। ওটা অসুস্থ সৈনিকদের জন্যে। খাওয়াদাওয়া খুব ভালো, ঝামেলাও কম। আমি এখন ওখানেই রয়েছি।'

ব্যোটশার পকেট থেকে সিগারেট বার করলো। গ্রেবারকে দিয়ে নিজেও একটা ধরিয়ে ফেললো। তারপর একমুখ গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লো, 'আজ ভেবেছি কয়েকটা হাসপাতালে খবর নেবো। ইচ্ছে করলে সন্ধ্যের পর আমরা দুজনে আবার কোথাও দেখা করতে পারি।'

'বেশ তো, কোথায় করবো বলুন?'

'সবচেয়ে ভালো এইখানে।'

'ঠিক আছে।'

'নটার সময়?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আগে এলে, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো। আপনি আগে এলে, আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

'ঠিক আছে।'

গার্টেনষ্ট্রাসের প্রথম দুটো বাড়ি ভেঙে গেছে। ও দুটোয় এখন আর কেউ বাস করে বলে মনে হলো না। তৃতীয় বাড়িটা প্রায় অক্ষত। শুধু ছাদটা যা জ্বলে গেছে। এ বাড়িতে ৎসীগলাররা বাস করতো। বাবার সঙ্গে একদিন এ পরিবারের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিলো।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গ্রেবার ঘন্টি বাজালো। ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুনে ও অবাক হয়ে গেলো। তাহলে কি ওরা এখনও এখানে আছে! অস্থির উদ্বিগ্ন মন নিয়ে ও অপেক্ষা করে রইলো। সামনের দেওয়াল থেকে মাঝে-মাঝে পলেস্তারা খসে গেছে। নিচের দিকের দেওয়ালে কোন বাচ্ছার আঁকা হিজিবিজি দুর্বোধ্য ছবি। একটু পরে শীর্ণকায়া এক বৃদ্ধা দরজার একটা কপাট অল্প একটু ফাঁক করলেন।

গ্রেবার ছোট্ট করে হাসলো। 'আপনি নিশ্চয়ই ফ্রাউ ৎসীগলার?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এর্নস্ট গ্রেবার।'

'এর্নস্ট গ্রেবার!'

'আপনি আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন না?'

'হুঁ, পারছি বৈকি।' বৃদ্ধা ইতস্তত করলেন। 'এসো, ভেতরে এসো।'

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে উনি একপাশে সরে দাঁড়ালেন। তারপরে সন্তর্পণে আবার দরজায় খিল দিয়ে দিলেন। ভেতর থেকে কে যেন ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলো 'কে?' ফ্রাউ ৎসীগলার চেঁচিয়ে বললেন, 'পল গ্রেবারের ছেলে, এর্নস্ট।' তারপর গলার স্বর নামিয়ে নিলেন। 'যাও বাবা, তুমি ভেতরে গিয়ে বসো।'

বসার ঘরটা বেশ বড়। নকশা-আঁকা ঝকঝকে মসৃণ মেঝে। জানলায় সুন্দর পর্দা টাঙানো। সোফার পাশে মনিপ্ল্যান্টের গাছ। হলদে ছিট দেওয়া বড় বড় পাতা। নিজের অজান্তে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। হের ৎসীগলার ভেতরে ঢুকলেন। সামনের চুলগুলো ধবধবে সাদা, ঠোঁটের কোলে চাপা একটুকরো হাসি। 'তোমাকে আবার দেখতে পাবো, আমরা আশাই করিনি, এর্নস্ট। তারপর, সোজা সীমান্ত থেকে আসছো তো?'

'হ্যাঁ। আমি বাবা-মার খোঁজ করতে এসেছি, হের ৎসীগলার। ওরা তো এখন···'

'একি! দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।' ফ্রাউ ৎসীগলার কখন প্রবেশ করেছেন গ্রেবার খেয়াল করেনি। 'কাঁধের ঝোলাটা নিচে নামিয়ে রাখো। আমি তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসছি।'

গ্রেবার ঝোলাটা নামিয়ে রাখলো। 'জামা প্যান্টের যা অবস্থা, এখানে বসতে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে।'

'ওর জন্যে কিছু ভেবো না। ওই সোফটায় ভালো ক'রে বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।' ফ্রাউ ৎসীগলার চলে গেলেন।

গ্রেবার হের ৎসীগলারের দিকে তাকালো। 'আপনি আমার বাবা-মার খবর কিছু জানেন? আমি ওঁদের কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। আঞ্চলিক অফিসে খোঁজ নিলাম, ওরাও কিছু বলতে পারলো না।'

'আমিও ঠিক জানি না, এর্নস্ট। ওদের সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা-সাক্ষেৎ হয়নি। শেষ দেখেছিলাম প্রায় মাস পাঁচ-ছয়েক আগে।'

'তখন ওঁরা কেমন ছিলেন?' গ্রেবার উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

'কেন? বেশ ভালোই তো।'

'চিঠিতে কিছু জানতে না পারলেও, রাশিয়ায় থাকার সময়ে শুনেছিলাম আমাদের শহরে বোমা ফেলা হয়েছে। কিন্তু ঠিক এমন অবস্থা হবে তখন কল্পনাও করতে পারিনি।'

ফ্রাউ ৎসীগলার কফি নিয়ে ফিরে এলেন। প্লেটে কয়েকখানা বিস্কুট। 'কথা পরে বলবে, বাবা। গরম থাকতে থাকতে কফিটা খেয়ে নাও।'

গ্রেবার কফির পেয়ালাটা তুলে নিলো।

ফ্রাউ ৎসীগলার হা হা করে উঠলেন, 'উঁহু, ওটি হবে না। আগে বিস্কুটকটা মুখে দাও।'

'আমি কিন্তু সকালে খেয়ে বেরিয়েছি।'

'ওসব আমি কিচ্ছু শুনছি না।' ফ্রাউ ৎসীগলার নাছোড়বান্দা।

গ্রেবারের কিন্তু সত্যিই তখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছিলো না। এমনকি কফির মিষ্টি উষ্ণতাটুকুও কেমন যেন বিস্বাদ মনে হচ্ছিলো। তবু কোনরকমে শেষ করে ও উঠে দাঁড়ালো। 'আচ্ছা, কোথায় গেলে ওঁদের খোঁজ পাওয়া যাবে বলতে পারেন ?'

হের ৎসীগলার এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিলেন, এবার গ্রেবারের কথায় ওঁর চমক ভাঙলো। 'না এর্নস্ট, সত্যিই আমরা কিছু জানি না। তুমি বিশ্বাস করো।'

'না না, অবিশ্বাস করবো কেন,' গ্রেবার তার ভারী ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিলো। 'বরং আপনাদেরই মিছিমিছি বিব্রত করলাম।'

'ও মাঃ, সে কি কথা !' ফ্রাউ ৎসীগেলার মিষ্টি করে হাসলেন। 'তুমি আমাদের ঘরের ছেলের মতন। কোথায় থাকছো এখন ?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি। দেখি, তাঁবুতে একবার চেষ্টা করে।'

'আমাদের এখানে বাড়তি ঘর থাকলে তোমাকে থাকতে বলতাম।'

'না না, ঠিক আছে। আজ তাহলে চলি।'

'এসো, বাবা।'

ফ্রাউ ৎসীগলার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে গ্রেবারের মনে হলো ওঁরা কিছু যেন গোপন করছেন। তখনই ওর ব্যোটশার কথাটা মনে পড়লো—জানলেও ভয়ে এখন কেউ মুখ খুলবে না। সত্যি, এই ভয়ের উৎস আজকে নয়, তেত্রিশ সাল থেকে তিল তিল করে জমা হয়েছে মানুষের মনে।

লুসিরা থাকেন হারমনি ক্লাবের বড় একটা হল ঘর নিয়ে। সারা ঘর বিছানা মাদুর কম্বলে একেবারে গুদোম। তক্তপোশের নিচে বড় বড় ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে লটকানো স্বস্তিকা-আঁকা কয়েকটা নিশান। চওড়া সোনালী ফ্রেমে

বাঁধানো ফুয়ারের বড় একটা তৈলচিত্র। কয়েকজন মহিলা আর ছোট বাচ্ছা কলকল করছে। সারা ঘর যেমন অগোছালো, তেমনি নোংরা।

ফ্রাউ লুসি বিছানায় বসে কি যেন বুনছিলেন। কদাকার দেখতে। থলথলে ঢ্যাপসা চেহারা। ঝাপসা চোখে উনি খানিকক্ষণ গ্রেবারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'মারা গেছেন এর্নস্ট।'

'কি বললেন?'

'মারা গেছেন।'

সৈনিকের পোশাক পরা ছোট একটা বাচ্ছা গ্রেবারের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। গ্রেবার ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। 'আপনি কি করে জানলেন?' হঠাৎ ওর মনে হলো গলাটা যেন ভেঙে গেছে। 'আপনি কি ওদের দেখেছেন?'

ফ্রাউ লুসি ঘাড় নাড়লেন, 'না।'

'তাহলে?'

'কিন্তু তুমি তো নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছ, চারদিকের কি অবস্থা।' নিথর পাথরের প্রতিমূর্তির মতো উনি সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর অপলক চোখের দৃষ্টি যেন হারিয়ে গেছে কোন গহন অতীতে। যেন উনি একা, সারাঘরে আর কেউ কোথাও নেই।

গ্রেবার ওঁর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো। 'ফ্রাউ লুসি, আপনি অনুগ্রহ করে একটু মনে করে দেখার চেষ্টা করুন। কোথায় কবে আপনি আমার বাবা-মাকে দেখেছেন? কি করে আপনি জানতে পারলেন ওরা মৃত?'

'লেনা মারা গেছে। আগাস্টও···' ঝাপসা চোখের পাতা দুটো ওঁর জলে ভিজে উঠলো। 'তুমি তো ওদের দুজনকেই চিনতে?'

মুখ স্পষ্ট মনে করতে না পারলেও, বাচ্ছা দুটোকে ওর আবছা আবছা মনে পড়লো। সব সময়ই লজেন্স চুষতো আর গাল বেয়ে নাল গড়াতো। 'ফ্রাউ লুসি, দোহাই আপনার, আপনি একটু মনে করার চেষ্টা করুন। আপনি কি ওঁদের দেখেছেন?'

উনি যেন শুনতেই পেলেন না। 'লেনাকেও আমি দেখিনি। ওরা আমাকে কাছে যেতে দেয়নি, এর্নস্ট।' হঠাৎ উনি হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'কেন, কেন ওরা এমন করলো, এর্নস্ট? তুমি তো সৈনিক, তুমি নিশ্চয়ই জানো।'

গ্রেবার আর সহ্য করতে পারলো না। কান্না ও একদম সহ্য করতে

পারে না। ওরও বুকের মধ্যে থেকে কি যেন একটা মুচড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে উঠে এলো। গ্রেবার অসহায়ের মতো চারদিকে তাকালো। হঠাৎ ওর চোখ পড়লো হের লুসির ওপর। বাইরে থেকে উনি ইশারায় গ্রেবারকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। গ্রেবার উঠে দরজার দিকে এগুলো। দেখলো সৈনিকের পোশাক পরা সেই বাচ্চাটা এখন অন্য দুটো বাচ্চার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। গ্রেবারের মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

ফ্রাউ লুসির চেয়ে হের লুসি বুড়িয়ে গেছেন অনেক বেশি। দড়ির মতন পাকানো চেহারা। মাথায় টাক পড়ে গেছে। গলার কণ্ঠাটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

হের লুসি গ্রেবারের কাঁধে হাত রাখলেন। 'তুমি কিছু মনে ক'রো না, এর্নস্ট। ছোট দুটো মারা যাবার পর থেকে ওর মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। ওর ধারণা সবাই···'

গ্রেবার চমকে উঠলো। 'তাহলে ওঁরা মরেন নি ?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না। গত ছমাসে চারদিকের অবস্থা যে দিনদিন কি ভীষণ অবনতির দিকে গেছে, সে তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। এখন আর কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। সবাই ভয়ে জুজু হয়ে রয়েছে। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, তোমার বাবা-মা এখন কোথাও নিরাপদেই আছেন।'

'এই ছ মাসের মধ্যে ওঁদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি ?'

'কেন হবে না ? এই তো বিমান আক্রমণের আগে, এখনও এক মাসও হয়নি, একবার পথে দেখা হয়েছিলো।'

গ্রেবারের ধমনীর রক্তস্রোত যেন চলকে উঠলো। 'ওঁরা তখন কেমন ছিলেন ?'

'তুমি কি শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছো, এর্নস্ট ?'

'হ্যাঁ।'

হের লুসি একটু থেমে উত্তর দিলেন, 'কেন, ভালোই তো দেখেছিলাম।'

গ্রেবার হঠাৎ লজ্জিত হলো। ওর মনে হলো এক মাস আগে কে কেমন ছিলো জিজ্ঞেস করাটা অর্থহীন। অন্তত এখন, বেঁচে থাকা বা না থাকার প্রশ্নটাই যখন সবচেয়ে জরুরী। ও ক্ষমা চাইলো, 'আমি দুঃখিত, হের লুসি। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।'

'খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া সারা পৃথিবী জুড়ে যখন দুঃখ ছেয়ে রয়েছে, তখন নতুন করে আর দুঃখিত হবার কিছু নেই।'

গ্রেবার বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রথমে হারমনি ক্লাবটাকে যতটা নিষ্প্রাণ মনে হয়েছিলো, এখন আর ততটা মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোথায় যেন জীবন এখনও বেঁচে আছে। রাস্তার মাঝখানে দুটো কুকুর খেলা করছে। মাথার ওপরের আকাশটা ঘন নীল। সূর্যস্নাত গাছের সবুজ পাতাগুলো এখন আরও স্বচ্ছল মনে হচ্ছে।

নয়

গ্রেবার যখন বাড়িটার সামনে এসে পৌঁছলো, সন্ধ্যে তখন উতরে গেছে। অন্ধকারে ও বাড়ির নম্বরটা খুঁজে পেলো না। খোলা দরজার ওপার থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাই ?'

'এটা কি বাইশ নম্বর মারীনষ্ট্রাসে ?'

'হ্যাঁ। কাকে চাই ?'

'স্বাস্থ্য দপ্তরের উপদেষ্টা হের ক্রুজেকে।'

'ক্রুজে ?' বিস্ময়ে লোকটার চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এলো। 'কী দরকার বলুন তো ?'

গ্রেবার ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। অন্ধকারে খুব ভালো দেখতে পেলো না। পায়ে বুট, এস এস উর্দি পরা। হাতে রাইফেল না থাকায় বুঝলো ব্লক ওয়ার্ডেন জাতীয় কিছু হবে। গ্রেবার বিরক্ত হলো। 'সেটা আমি ডাক্তার ক্রুজেকেই বুঝিয়ে বলবো।'

কথা না বাড়িয়ে গ্রেবার সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

নিজেকে এখন ওর ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। এ ক্লান্তি ওর চোখের পাতার চেয়ে গভীর কোন সত্তায়। সারাটা দিন ওর খুঁজতে খুঁজতেই কেটে গেলো। অথচ কিছুই জানতে পারলো না। সত্যি, স্রেফ ভেল্কি! দু-একজন প্রতিবেশীর সন্ধান যাওবা পাওয়া গেলো, তারা কেউ কিছুই বলতে পারলো না। কিংবা বললো না। গেস্টাপোর ভয়ে সবাই কাঁটা। আর যারা কিছু বললো, গুজব শোনা ছাড়া সত্যিকারের তারা কিছুই জানে না।

সিঁড়ি ভেঙে গ্রেবার তেতলায় উঠে এলো। সামনের ঢাকা বারান্দাটা অন্ধকার। ডাক্তার ক্রুজের মুখটা ও স্পষ্ট মনে করতে পারলো না। অথচ এঁর কাছে মামণি চিকিৎসার জন্যে বহুবার এসেছেন। হয়তো কয়েকদিন আগেও এসেছিলেন, এবং উনি ওঁর ঠিকানাটা জানেন।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

গ্রেবার উদগ্রীব হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। চিনতে পারলো না। 'ডাক্তার ক্রুজে আছেন?'

'ক্রুজে! আপনি ডাক্তার ক্রুজের সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'হ্যাঁ।'

মহিলাটি ভ্রূ কুঁচকে নিঃশব্দে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখলেন। এক চুলও নড়লেন না, বা একপাশে সরে ওকে ভেতরে আসতে বললেন না।

গ্রেবার অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'উনি কি আছেন?'

মহিলা কোন উত্তর দিলেন না। যেন নিচের সিঁড়ি থেকে কিছু শোনার চেষ্টা করছেন। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ওঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছেন?'

'না। একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে।'

'ব্যক্তিগত ব্যাপারে!'

'হ্যাঁ। আপনি কি ফ্রাউ ক্রুজে?'

'তিনি মারা গেছেন।'

গ্রেবার স্তব্ধ বিস্ময়ে ওঁর অভিব্যক্তিহীন কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সারাদিনে বাস্তব অভিজ্ঞতা ওর আজ কম হয়নি। নানা ধরনের সতর্কতা ঘৃণা প্রবঞ্চনা ও সবই দেখেছে। কিন্তু পাথরের মতো হিমেল নিষ্প্রাণ এই চোখের দৃষ্টি শুধু নতুনই নয়, ওর কাছে অসহ্য মনে হলো।

'দেখুন, এখানে কি হয়েছে আমি জানি না। জানতে চাইও না। আমি শুধু ডাক্তার ক্রুজের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'উনি এখানে থাকেন না।' হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো মহিলার কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু দরজার গায়ে যে ওঁর নাম লেখা রয়েছে?'

'ওটা অনেক আগেই তুলে ফেলা উচিত ছিলো।'

'কিন্তু এখনও তোলা হয়নি। ওঁর পরিবারের আর কেউ এখানে থাকেন?'

মহিলাটি উত্তর দিলেন না। গ্রেবারের সারা শরীর রাগে রিরি করে উঠলো। তরল অন্ধকারে বাঘের মতো জ্বলে উঠলো ওর চোখদুটো। হয়তো ঝাঁপিয়েও পড়তো, যদি না ঠিক সেই সময়ে ওর সামনে অন্য একটা দরজা খুলে যেতো, আর ভেতর থেকে আছড়ে-পড়া এক ঝলক আলোর ফ্রেমের মধ্যে ও দেখতে পেতো অনন্য একটি মুখ। 'আমাকে কি কেউ খুঁজছেন?'

কণ্ঠস্বরটা আশ্চর্য মিষ্টি।

'হ্যাঁ,' এবার মহিলাটিকে আর কিছু বলার সুযোগই দিলো না গ্রেবার। 'আমি ডাক্তার ক্রুজের আত্মীয় কিংবা পরিচিত কারুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'আমি এলিজাবেথ ক্রুজে।'

'বড় আলো নিভিয়ে ছোট আলোটা জ্বেলে দিও।' অপাঙ্গে দৃষ্টি হেনে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

গ্রেবার অপলক চোখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তরুণী এবার সামনে এগিয়ে এলো। যেন অজস্র আলোর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ও আলতো করে ভেসে এলো। উনিশ-কুড়ি বছরের তন্বী। ছিপছিপে, চমৎকার দেহের বাঁধুনি। টানা ভ্রূ, চঞ্চল চোখের মণিদুটো কুচকুচে কালো। গুচ্ছ গুচ্ছ ঢেউ খেলানো কালো চুলের বন্যা কাঁধের ঢল বেয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। তরুণী ওর মুখোমুখি দাঁড়াতেই গ্রেবার হালকা অথচ মিষ্টি একটা মেয়েলী প্রসাধনের গন্ধ পেলো। কিন্তু গন্ধটা ঠিক কিসের ও ধরতে পারলো না।

'বাবা এখন আর চিকিৎসা করেন না।'

'চিকিৎসার জন্যে আমি এখানে আসিনি।'

'তাহলে ?'

'এসেছি একটা খবর নিতে।'

তরুণীর চঞ্চল চোখের মণিদুটো আরও সতর্ক হয়ে উঠলো। চকিতে ও মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলো মহিলাটি তখনও ওখানে আছে কিনা। তারপর বাতাসের মতো ফিসফিস করে বললো, 'ভেতরে আসুন।'

গ্রেবার ওর পেছন পেছন আলোকিত ঘরটাতে প্রবেশ করলো।

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।' তরুণী ঘুরে দাঁড়ালো।

গ্রেবার দেখলো ওর চোখের মণিদুটো শুধু কালোই নয়, যেমন স্বচ্ছ তেমনি গভীর। যেন সত্তার গহন গভীরে আমূল বিঁধে যায়।

'আপনি তো এই হাইস্কুলে পড়তেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ। আমার নাম এর্নস্ট গ্রেবার।'

তরুণী ঠোঁট টিপে হাসলো। 'জানি।'

শুধু অবাকই নয়, গ্রেবার বিস্মিত হলো। বাদামের মতো বড় বড় দুটো চোখ, ঢল বেয়ে নামা কালো চুলের বন্যা···কোথায় যেন···হঠাৎ ও চিনতে পারলো। 'এলিজাবেথ, তুমি! প্রথমে, প্রথমে আমি তোমাকে চিনতেই পারিনি। সেই কবে সাত-আট বছর আগে দেখা। তুমি কিন্তু এখন অনেক বড় হয়ে গ্যাছো!'

'স্বাভাবিক।'

'অনেক বদলেও গ্যাছো।'

এলিজাবেথ চিবুকে টোল ফেলে হাসলো। 'তুমিও।'

গ্রেবার কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ঘরের ভেতরে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। 'দেখে মনে হচ্ছে সেনানায়কের মতো রাজকীয় সম্মানে…'

'রাজকীয় সম্মানে!' এলিজাবেথ ক্রুদ্ধ বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলো। করুণ হয়ে উঠলো ওর চোখের ভাষা। 'বরং বলতে পারো ঘৃণ্য বন্দীর মতো আমাকে এখানে পাহারা দেওয়া হচ্ছে।'

গ্রেবার চমকে উঠলো। 'কেন? তোমার বাবা…'

'এক মিনিট।'

কথায় মাঝেই বাধা দিয়ে এলিজাবেথ দ্রুত পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর 'এগিয়ে চলেছে সৈনিক বীর' গানের রেকর্ডটা আস্তে আস্তে চালিয়ে দিলো।

'হ্যাঁ, এবার বলো।'

'এটা আবার কি?' গ্রেবার মনে মনে ভাবলো এ শহরের সব্বাই পাগল হয়ে গেছে নাকি! 'শিগ্‌গির বন্ধ করে দাও। আমরা অনেক এগিয়েছি, আর না এগুলেও চলবে। তার বদলে বরং বলো, কেন তুমি বন্দী?'

'যে মহিলাটিকে তুমি তখন দেখলে, ও গুপ্তচর। দরজার ওপার থেকে আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনছিলো। তাই রেকর্ডটা চালিয়ে দিলুম।' এলিজাবেথ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'হ্যাঁ, বাবামণির সম্পর্কে তুমি কি যেন বলছিলে?'

'আমি ওঁকে…'

'তার আগে বলো, ওঁর সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো?'

'আমি? কিচ্ছু না।'

'সেকি!'

'কেন? ওঁর কিছু হয়েছে নাকি?'

'তুমি কিছু শোনোনি?'

'না তো! আমি শুধু ওঁর কাছে এসেছিলাম আমার মার ঠিকানা জানতে।'

'শুধু এই?'

'ব্যাস্।'

এলিজাবেথের মুখ কালো হয়ে গেলো। গ্রেবার কিছু বুঝতে পারলো না। 'তুমি বিশ্বাস করো।'

'না, সেজন্যে নয়…' এলিজাবেথ, নখ খুঁটতে খুঁটতে ম্লান স্বরে বললো, 'আমি ভেবেছিলুম তুমি হয়তো ওঁর কোন খবর নিয়ে এসেছো।'

'কেন, কি হয়েছে ওঁর ?'

'উনি এখন বন্দীশিবিরে।'

'বন্দীশিবিরে !'

'হ্যাঁ। মাসখানেক আগে সরকারের নীতি-বিরোধিতার অপরাধে ওঁকে অভিযুক্ত করা হয়। তাই তুমি যখন খবরের কথা বললে, আমি ভাবলুম তুমি বোধহয় ওঁর সম্পর্কে কিছু জানো।'

'কিন্তু আমি তো…'

'জানি, এর্নস্ট। পাছে কোন গোপন সংবাদ হয়, তাই আগে থেকে তোমাকে আমি সাবধান করতে চেয়েছিলাম।'

সাবধান ! গ্রেবারের গলার ভেতরটা আবার শুকিয়ে উঠলো। সারাদিনে এই শব্দটা কত অজস্রবার যে শুনলাম ! এগিয়ে চলেছে সৈনিক বীরের চড়া সুর এখন অসহ্য মনে হলো। 'এবার ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া যায় না ?'

'হ্যাঁ, যায়। আমার মনে হয় তোমার এখন চলে যাওয়াই ভালো, এর্নস্ট।'

'কেন ? আমি কি গুপ্তচর নাকি ?' গ্রেবার হঠাৎ রেগে উঠলো। ইচ্ছে হলো সবকিছু দুহাতে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

'তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না, এর্নস্ট।' এলিজাবেথ ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে গিয়ে গ্রামোফোনটা বন্ধ করে দিলো। আর ঠিক তখুনি শোনা গেলো বিমান আক্রমণের কর্কশ সংকেত-ধ্বনি।

এলিজাবেথ ফিসফিস করে বললো, 'সাইরেন !'

কে যেন বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিলো, 'আলোটা নিভিয়ে দাও।'

গ্রেবার বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে একটানে দরজাটা খুলে ফেললো। 'কেন, কি হয়েছে কি ?'

মহিলাটি তখন টানা বারান্দার অন্যপ্রান্তে চলে গেছেন। দূর থেকে কি যেন বললেন, গ্রেবার ঠিক বুঝতে পারলো না। এলিজাবেথ ওকে ভেতরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিলো।'

'আচ্ছা শয়তান তো !' গ্রেবার উত্তেজিত স্বরে এলিজাবেথকে জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা এখানে এসে জুটলো কি করে ?'

'সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। আমার ওপর নজর রাখার জন্যে ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে।'

দূর থেকে অস্পষ্ট গোলমাল, চেঁচামেচির শব্দ ভেসে এলো। এলিজাবেথ তাড়াতাড়ি একটা বর্ষাতি গায়ে গলিয়ে নিলো। 'চলো, শেল্টারে যাই।'

'এখনও অনেক সময় আছে। তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও না কেন ? তোমার কাছে এ তো এখন নরক হয়ে রয়েছে।'

'হয়তো তাই। তবু চলে যাই না, তার একমাত্র কারণ যেহেতু আমি পালাতে চাই না।' এলিজাবেথ আলোটা নিভিয়ে দিলো। তারপর অন্ধকারে হাতাড়ে হাতড়ে এসে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনের উচ্চকিত আর্তনাদে সারা ঘর ভরে গেলো। জানলার ফ্রেম আর তালিমারা কাচের শার্সির পটভূমিতে এলিজাবেথ গাঢ় ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর পায়ে পায়ে ফিরে এলো। 'এখন আর কোথাও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, বুঝলে ?'

গ্রেবার দেখলো অন্ধকারেও এলিজাবেথের চোখদুটো চিকচিক করছে। হঠাৎ একটা অনুভূতি একটা ক্রোধ একটা বিদ্রোহ যেন ওর বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে—বিদ্রোহ ওর নিজের বিরুদ্ধে, ওই মুখ আর আয়ত দুটি চোখের বিরুদ্ধে, বুক-কাঁপানো সাইরেনের অন্তিম আর্ত-নাদের বিরুদ্ধে, জানলার বাইরে থেকে উঠে আসা ভয়ার্ত চিৎকারের বিরুদ্ধে।

'না,' গ্রেবার চাপা গর্জন করে উঠলো, 'বুঝলাম না। এভাবে এখানে থাকলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। তোমার নিশ্চয়ই অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।'

এলিজাবেথ অবাক চোখে তাকালো। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'দোহাই তোমার, চুপ করো। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলিজাবেথ একটানে দরজাটা খুলে ফেললো। গ্রেবার ছুটে এসে ওর পথ আটকে দাঁড়ালো। এলিজাবেথ এক ঝটকায় ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। ওর গায়ে এত জোর থাকতে পারে গ্রেবার কল্পনাও করতে পারেনি। নিজেকে ও কোন রকমে সামলে নিলো। 'একটু দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

বাইরের হট্টগোল এখন তুমুল কলরোলের মতো মনে হলো। মনে হলো এই কলরোল যেন চারদিক থেকে এসে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে ধ্বনি

প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কেঁপে উঠছে কানের পর্দা, দেহের শিরা উপশিরা। ফেনিয়ে উঠছে রক্তস্রোত। মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে আসছে হিমেল প্রবাহ। আচ্ছন্ন করে ফেলছে সমস্ত চেতনা। বুঝি এর থেকে মুক্তি নেই, যেন এই আর্তনাদ আর কোনদিনও থামবে না।

কয়েকটি ছায়ামূর্তি ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো। সঙ্গে ঝোলানো ব্যাগ, কাগজের মোড়ক। দোতলায় আসতে হঠাৎ একটা টর্চের তীব্র আলো এসে পড়লো। এলিজাবেথের মুখে। ভারী গলায় কে একজন বললো, 'যাবে তো আমাদের সঙ্গে এসো।'

'না, থাক।'

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না।

গ্রেবার চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, 'চোরাকুঠরিটা কোথায়?'

'খুব কাছেই, কার্লস্প্লাটসে।'

রাস্তায় পা দিতেই দৃশ্যটা আরও করুণ হয়ে উঠলো। শিশু বৃদ্ধ নারী পুরুষ—চারদিকে সবাই ছুটছে। আবছা আঁধারে ওদের মনে হচ্ছে যেন সব তালপাতার সেপাই কিংবা ছায়ানট। এয়ার রেড ওয়ার্ডেন চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে। লাল রেশমী গাউন পরে এক রণরঙ্গিণী মহিলা দারুণ ছুটোছুটি করে ভিড় সামলাচ্ছে। একজন বৃদ্ধ পেছন ফিরে কথা বলতে গিয়ে ভিড়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়লো। সবাই কথা বলছে, অথচ কেউ কারুর কথা শুনতে পাচ্ছে না।

কার্লস্প্লাটসে এসে জনস্রোত থমকে গেলো। চোরাকুঠরির প্রবেশ পথের সামনে গিজগিজ করছে মানুষের কালো মাথা। ওয়ার্ডেন বেচারি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে—'উঁহু, এক এক করে, এক এক করে।'

এলিজাবেথ বললো, 'এসো, আমরা এদিকটায় একটু অপেক্ষা করি।'

দেখতে দেখতে কালো মাথাগুলো যেন এক এক করে কবরের অতল অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকালো, 'তোমার ভয় করছে না তো?'

এলিজাবেথ ম্লান হাসলো। 'করছে না আবার! ভয় আমার ওপরের চেয়ে নিচে বেশি।'

'আসুন, আসুন।' ওয়ার্ডেনের গলা এখন ভেঙে গেছে। 'সামনেই সিঁড়ি, সাবধানে দেখে নামবেন।'

কুঠরিটা একটু নিচু। কিন্তু যেমন বড় তেমনি মজবুত। গ্যালারির মতো থাক থাক আসন পাতা। মাঝখান দিয়ে যাওয়া আসার পথ। খুব কম পাওয়ারের কয়েকটা বাতি জ্বলছে। অনেকেই কম্বল মাদুর স্যুটকেস খাবার-দাবার প্রয়োজনীয় টুকিটাকি, এমনকি ভাঁজ-করা চেয়ারও সঙ্গে এনেছে। মাটির নিচে তখন রীতিমতো শুরু হয়ে গেছে জীবন-প্রবাহ। গ্রেবার চারদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। এই প্রথম অসামরিক মানুষ, নারী আর শিশুদের সঙ্গে ও চোরাকুঠরিতে আশ্রয় নিলো। জার্মানিতে শেল্টারে আশ্রয় নেওয়া তার জীবনে এই প্রথম।

হালকা সবুজ আলোয় মুখগুলো মনে হচ্ছে অন্যরকম, মৃত মানুষের মতো বিবর্ণ পাণ্ডুর। গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকালো। ওর মুখটাও সবুজ। দীঘল পল্লবের নিচে কালো ছায়া। চূর্ণ কুন্তল শনের মতো দীপ্তিহীন। সবাই বুঝি মৃত্যুলীন, গ্রেবার ভাবলো। নিঃসীম ভয়, ঘৃণা আর হতাশায় সবাই উৎকণ্ঠিত।

জীবন্ত শুধু শিশুদের চোখগুলো। কোলের মধ্যে থেকে বড় বড় অবাক চোখের মণিগুলো আলোয় ঝিকমিক করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে দেওয়াল থেকে দেওয়ালে। ওরা কিন্তু কাউকে দেখছে না—না গ্রেবার, না ওদের মাকেও। ওরা কেবলই কি যেন খুঁজছে, খুঁজছে আর খুঁজছে। হয়তো খুঁজছে তাকেই—যা দেখা যায় না, যা ওরা মনের মধ্যে কল্পনায় গড়ে নিয়েছে। হয়তো মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর একটা কিছু, যার সম্পর্কে ওদের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই, অথচ বিপদের একটা গন্ধ আহত পশুর মতো কেবলই তাড়া করে ফিরছে আর ওরা তাকে খুঁজছে। খুঁজছে আর খুঁজছে।

গ্রেবার দেখলো শুধু শিশু নয়, সবায়েরই সতর্ক চোখগুলো একই ভঙ্গিতে ঘুরছে। নিস্পন্দ নিথর সারা শরীর, উৎকর্ণ কেবল ওদের কানগুলো। যেন সুদূরের প্রতিটি শব্দ ওরা নিশ্বাসে নিশ্বাসে গ্রহণ করছে ওদের আপন সত্তায়।

এবার গ্রেবারও যেন বিপদের গন্ধ পেলো।

ভেতরের গুমোট বাতাস থেকে কি যেন একটা সরে গেলো। বাইরের গুঞ্জন আরও বাড়লো। কোথা থেকে হুট করে ঢুকে পড়লো একঝলক মিষ্টি বাতাস। সারিসারি আসনে এতক্ষণ যারা জুজু হয়ে বসেছিলো, এবার হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। বাচ্চারা যেন এতক্ষণ হাই তুলতেও ভুলে গিয়েছিলো, এবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা চোখ মিটমিট করে

হাসলো। অস্বস্তির কালো পর্দাটা কে যেন সরিয়ে দিয়েছে। এবার আর ভয়ের মুখোশ নয়, মুখগুলোই স্পষ্ট চোখে পড়লো।

এলিজাবেথের পাশের বৃদ্ধ বললেন, 'ওরা বোধ হয় চলে গেছে।'

'আবার আসতে পারে', কে একজন উত্তর দিলো। 'কখনও কখনও ওরা ইচ্ছে করেই পালাবার ভান করে। তারপর সবাই যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন আবার বোমা ফেলতে শুরু করে।'

কোথায় যেন একটা কচি বাচ্চা ককিয়ে উঠলো। কেউ কেউ কাগজে জড়ানো খাবারের মোড়ক খুললো। হঠাৎ একজন মহিলা চিলের মতো সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'আর্নল্ড রে, আমরা গ্যাসটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি··· তুই কেন আমাদের মনে করিয়ে দিস্‌নি?'

বৃদ্ধ হাসলেন। 'তোমার কোন ভয় নেই মা, বিমান আক্রমণের সংকেত শহরের সব গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছে।'

মাথা মোটা কে যেন বললো, 'আহা, সাইরেন কি গ্যাস বন্ধ করার জন্যে নাকি, সাইরেন তো শুধু আক্রমণের জন্যে?'

এলিজাবেথ তার ছোট হাতব্যাগ থেকে চিরুনি আর আয়না বার করে চুল আঁচড়ালো। 'আমার মনে হয় এবার যাওয়া যেতে পারে। উঃ, দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো, তারপর দরজা খুললো। চাঁদ উঠেছে। দরজা দিয়ে একফালি চৌকো জ্যোৎস্না তেরচাভাবে এসে পড়েছে সিঁড়িতে। সিঁড়ির প্রতিটা ধাপে ধাপে এলিজাবেথ এখন বদলে যাচ্ছে, যেন বিহ্বল স্বপ্নের গভীর থেকে ও উঠে আসছে। চোখের নিচের কালো ছায়াদুটো উধাও। ফিরে আসছে চুলের উজ্জ্বল দীপ্তি, শরীরের উষ্ণ লাবণ্য। জীবনের স্পন্দন এখন আগের চেয়েও নিটোল, আরও পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে। যেন জীবনের রঙীন দুর্লভ এই মুহূর্তটার জন্যেই ও অপেক্ষা করে ছিলো।

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো। এলিজাবেথ বাতাসে গভীর শ্বাস নিলো। খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা পাখির মতন মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ও চারিদিক তাকালো। 'মাটির নিচের এই গণকবরটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। গা ঘিনঘিন করে দম বন্ধ হয়ে আসে।' কাঁধের ওপর থেকে চুল-গুলো ও ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিলো। 'ঢোকবার সময় একবারও মনে হয় না মাথার ওপরে অবার কোনদিন আকাশ দেখতে পাবো।'

গ্রেবার ডাইনে বাঁয়ে তাকালো। দীর্ঘশ্বাসের মতো গভীর ওর অনুভূতি-

টাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলো। তারপর নিঃশব্দে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চললো।

'তুমি এখন বাড়ি ফিরবে তো?'

'নিশ্চয়ই,' এলিজাবেথ অবাক হয়ে গেলো। 'নইলে আর কোথায় যাবো? তাছাড়া অন্ধকার রাস্তায় আমার ছুটোছুটি করে বেড়াতে একটুও ভালো লাগে না।'

কার্লসপ্লাটস্ ছাড়িয়ে আসতে না আসতে ঝড় উঠলো। ওরা দ্রুত পা চালালো।

'হ্যাঁ, তখন যে কথাটা বলছিলাম,' হঠাৎ কথাটা গ্রেবারের মনে পড়লো। 'তুমি ওখান থেকে চলে যাও না কেন?'

এলিজাবেথ দুষ্টুমি করে হাসলো। 'কেন, তোমার জানাশোনা কোন ঘর আছে নাকি?'

'না।'

'আমারও নেই। হাজার হাজার লোক এখন গৃহহীন, কোথায় মাথা গুঁজবো বলো?'

'তা অবশ্য ঠিক। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'তাছাড়া ঘর পেলেও অন্য কোথাও যেতে পারি না। তাতে আমার বাবার বিপদের ঝুঁকি বাড়বে বই কমবে না।' এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর এখন মনে হলো ওর নয়, যেন অন্য কারুর। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'সে তুমি ঠিক বুঝবে না!'

গ্রেবার মনে মনে হাসলো। ভাবলো আজকের দিনে আমরা কাউকে বুঝি না, বুঝতে চাইও না। তাছাড়া আমারই বা এত মাথাব্যথা কিসের! ওর যা ইচ্ছে করুক। সারা দিনের অজস্র ক্লান্তি, ব্যর্থ অবসাদ যেন এবার ওর হাঁটু ভেঙে নিচে নেমে এলো। আর ঠিক তখনই ওর মনে হলো এই মুহূর্তে ওরা দুজনে যখন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে, ওর বাবা মা হয়তো তখন ওকে হাকেনষ্ট্রাসে খুঁজছেন। তিক্ত বিতৃষ্ণায় গলার ভেতরটা ওর শুকিয়ে এলো।

'আমাকে এবার যেতে হবে, জরুরী একটা কাজ আছে। আমি চলি, এলিজাবেথ। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, এর্নস্ট।'

ওর গমনপথের দিকে গ্রেবার অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু আধো জ্যোৎস্না আধো আঁধারে ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেলো। আমার উচিত ছিলো ওকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। ভারি বয়ে গেছে আমার!

মনে পড়লো ছোটবেলায় ওকে ওর একটুও ভালো লাগতো না। গ্রেবার দ্রুতপায়ে হাকেনষ্ট্রাসে ফিরে এলো। কাউকে দেখতে পেলো না। কিচ্ছু না। মাথার ওপরে কেবল বোবা চাঁদ আর মুঠো মুঠো অবাক নিস্তব্ধতা।

ব্যোটশার আগে থেকেই টাউন হলের সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। মাথার ওপরে ম্যাড়মেড়ে জ্যোৎস্নায় সিংহের মূর্তিটাকে মনে হচ্ছিলো ভূতুড়ে ছায়ার মতন। গ্রেবারকে দেখেই দূর থেকে ও জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কোন খবর আছে নাকি?'

'না। তোমার?'

'আমারও না। প্রায় সবকটা হাসপাতালেই ঘুরলুম, কোথাও পেলুম না। ওই যে সকালে বললুম না—স্রেফ্ ম্যাজিক, এও ঠিক তাই। কেউ কিংসু বলতে পারলো না। চলো, এবার কোথাও গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক!'

'চলো।'

দুজনে হিটলার প্লাটসের দিকে হেঁটে চললো। রাত্রির নিঝুম নির্জনতায় প্রতিধ্বনিত হলো ওদের ভারী বুটের শব্দ। ব্যোটশার ম্লান স্বরে বললো, 'ছুটির আর একটা দিন আমার মাটি হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে একদিন সব ছুটিই ফুরিয়ে যাবে।'

ছোট্ট এই রেঁস্তোরাটা ব্যোটশারের পরিচিত। দুজনে দরজা ঠেলে প্রবেশ করলো। ভেতরে আর কেউ নেই। জানলার ধারের একটা টেবিল ওরা বেছে নিলো। শার্সির ওপরে কালো পর্দা টাঙানো। খুব কম পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। দোকানি-মহিলা কিছু জিজ্ঞেস না করেই দু গ্লাস বিয়ার নিয়ে এলো। গ্রেবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো কুমড়ো-পটাশের মতো ওর বিশাল শরীর। ভেতরে অন্তর্বাসের কোন বালাই নেই। ভারী পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে ও চলে গেলো।

'এই আমি এখানে বসে রয়েছি, আর আমার বউ রয়েছে এখন অন্য কোথায়। হয়তো একা একা···' ব্যোটশার এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে ফেললো। 'সত্যি, ভাবতেও খারাপ লাগে।'

'আমি যদি শুধু জানতে পারতাম আমার বাবা-মা এখন সুস্থ শরীরে কোথাও বেঁচে আছেন, তাহলেই আমি খুশি। এর চেয়ে বেশি কিছু আর চাই না।'

'বাবা-মার কথা আলাদা। সত্যি বলতে কি ওঁদেরকে এখন আর কোন প্রয়োজনই নেই। ওঁরা যদি সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকেন, নিঃসন্দেহে সুখের কথা। কিন্তু স্ত্রী···উঃ ভাবা যায় না!'

ওরা আর দু গ্লাস বিয়ার চাইলো এবং ঝোলা খুলে রাত্রির জন্যে কিছু খাবার টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলো। বিয়ার দিতে এসে শুয়োরের চর্বি আর সসেজ দেখে দোকানওয়ালীর চোখ কপালে উঠলো। 'ওরে বাব্বাঃ, এ যে রাজকীয় খানা দেখছি!'

'শুধু কি রাজকীয়, সম্রাটীয়ও বলতে পারেন। মৃত্যুর মুখে লাথি মেরে সোজা সীমান্ত থেকে ফিরে এসেছি। চাড্ডিখানেক কথা নয়, বুঝলেন? প্যাকেটে এখন মাংস আর চিনি গজগজ করছে। বুঝতে পারছি না এগুলো নিয়ে কি করবো!' ব্যোটশার গোগ্রাসে খানিকটা খাবার গলাধঃকরণ করে বিয়ারে গলাটা পরিষ্কার করে নিলো। তারপর গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করে হাসলো। 'তোমার আর কি, খাওয়া দাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে একটা মেয়েমানুষ জুটিয়ে নিলেই হলো। ব্যাস, রাত্তিরটার মতো নিশ্চিন্ত।'

দোকানি ব্যোটশার কথা বলার ধরন দেখে কেটে পড়লো।

'তুমিও ইচ্ছে করলে তা করতে পারো।'

ব্যোটশার ঘাড় নাড়লো। গ্রেবার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো। ঝানু কোন সৈনিকের কাছ থেকে ও এতটা আশা করেনি। 'ওগুলো শুঁটকি মাছের মতো যেমন হাড় জিরজিরে, তেমনি গায়ের গন্ধ। আমার আবার ভালো স্বাস্থ্য না হলে পোষায় না। এমনকি ও ব্যাপারে কোন উৎসাহই কাজ করে না। তুমি যাই বলো ভায়া, গায়ে মাংস না থাকলে কোন মেয়েকে নিয়ে শুয়ে কোন লাভ নেই।'

গ্রেবার কাউন্টারের দিকে নির্দেশ করে মুচকি মুচকি হাসলো। 'তাহলে তো তোমার হাতের কাছেই রয়েছে।'

'তুমি কিন্তু একটা জিনিস ভুল করছো,' ব্যোটশার চটে উঠলো। 'ভালো স্বাস্থ্য মানে ময়দার বস্তা নয়, যার মধ্যে তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। ভালো স্বাস্থ্য হলো পালকের বিছানা। ওপরটা নরম, কিন্তু ভেতরটা লোহার মতন শক্ত। সে আমার বউকে দেখলে বুঝতে পারতে। যতক্ষণ কাছে থাকবে, বুকটা হাপরের মতো উঠবে নামবে। আর চলে গেলেই দেখবে দেওয়াল থেকে ছবিগুলো খসে খসে পড়ছে। না বন্ধু, না। রাস্তায় যদি খুঁজতেই হয় তো এই রকম কোন মেয়েকে খুঁজো।'

গ্রেবার ম্লান ঠোঁটে হাসলো। কোন উত্তর দিলো না।

ব্যোটশার উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। নিটোল একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে গ্রেবার হঠাৎ মিষ্টি একটা গন্ধ পেলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখলো পেছনের টেবিলে ফুলদানীতে রাখা একগুচ্ছ ভাওলেট। গন্ধটা আশ্চর্য মিষ্টি। গভীর একটা নিশ্বাসে ওর মনে পড়ে গেলো সব স্মৃতি : শৈশব, কৈশোর, খাঁচায় ছোট্ট ক্যানারি আর ওর যৌবনে হারানো স্বপ্ন—এত স্পষ্ট, যেন অবাক বিস্ময়ে এইমাত্র ও ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। অথচ পর মুহূর্তে ও আবার সেই আগেরই মতো নিঃস্ব রিক্ত, যেন কত দীর্ঘ পথ তুষারের মধ্যে দিয়ে ক্লান্ত হেঁটে চলেছে একা।

গ্রেবার উঠে দাঁড়ালো।

'একি! কোথায় চললে?' ব্যোটশার অবাক হয়ে গেলো।

'জানি না, দেখি কোথায় যাওয়া যায়।'

'কম্যাণ্ড্যাণ্ট অফিসে গেছলে নাকি?'

'হ্যাঁ। ওরা আমাকে তাঁবুতে থাকার একটা অনুমতিপত্র দিয়েছে।'

'চমৎকার! সোজা আটচল্লিশ নম্বরে চলে যাও।'

'তুমি যাবে না?'

ব্যোটশার একমিনিট চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো। তারপর ধীরে ধীরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'নাঃ, তুমি যাও। আমি আর খানিকক্ষণ এখানে বসি।'

গ্রেবার মন্থর পায়ে হেঁটে চললো। জ্যোৎস্না-প্লাবিত সারা পথ কবরের মতো নিস্পন্দ নিথর। নিজের পায়ের শব্দও কানে বেঁধে, এমন নিস্তব্ধ নিঝুম।

ছুটিতে-আসা-সৈন্যদের জন্যে অস্থায়ী তাঁবুগুলো শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে। সামনে কুচকাওয়াজের বিশাল মাঠটা জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে যেন তুষার ছাওয়া। ফটকের মুখে দুজন সশস্ত্র প্রহরী। মাঠ পেরিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করার আগে গ্রেবারের মনে হলো, ওর ছুটি যেন ফুরিয়ে গেছে। হাকেনষ্ট্রাসের বাড়িটার মতো ওর পূর্বের জীবনও ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর ও আবার ফিরে এসেছে তার যুদ্ধ-সীমান্তে। এবার অন্য আর এক যুদ্ধ-সীমান্তে, যেখানে গোলাগুলি রাইফেল কামান নেই, অথচ সমান বিপজ্জনক।

দশ

তিনদিন কেটে গেছে। আটচল্লিশ নম্বর তাঁবুর একটা টেবিল ঘিরে চারজন তাস খেলছে। তুদিন ধরে ওরা সমানে তাস খেলছে। শুধু খাওয়া আর ঘুমনোর সময়টুকুর জন্যে মাঝে মাঝে তিনজন জায়গা বদল করছে, চতুর্থজন কিন্তু ঠায় তাস মুখে নিয়ে পড়ে রয়েছে। ওর নাম রুমেল। তিনদিন আগে এখানে ও ছুটিতে এসে পৌঁছয় এবং ঠিক ওর স্ত্রী আর মেয়ের কবর দেবার সময়। জঙ্ঘায় একটা বিশেষ জন্মচিহ্ন দেখে ও তার স্ত্রীকে চিনতে পারে। কেননা মুখ দেখে তখন আর তাকে চেনার কোন উপায় ছিলো না। কবর দেবার কাজ চুকে যাবার পর ও সোজা এই তাঁবুতে চলে আসে। তারপর থেকেই স্কাট খেলতে শুরু করে। কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। গুম হয়ে বসে শুধু তাস খেলে যাচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত ও-ই জিতছে।

গ্রেবার জানলার ধারে বসে চিঠি লিখছে। ওর পাশে লান্স করপোরাল রয়টার চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছেন। বেশ বয়েস হয়েছে। হাতে বিয়ারের বোতল। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ডান পাটা জানলার ওপর রাখা রয়েছে। আটচল্লিশ নম্বর তাঁবু শুধু অসুস্থদের কাছেই নয়, হতভাগ্য সৈন্যদের কাছেও এ এক ধরনের স্বর্গ। ওদের পেছনে ইঞ্জিনীয়ার ফেল্ডমান, খাবার সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণই বিছানায় শুয়ে থাকে। ওর ধারণা তিন বছর যুদ্ধে যত শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এই তিন সপ্তার ছুটিতে ও ঘুমিয়ে তা পুষিয়ে নেবে।

গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, ব্যোটশার খবর কি? ওকে তো দেখছি না?'

'তুপুরে ইবুর্গে গেছে। সেখান থেকে আবার হাস্টে যাবে।' রয়টার হাই তুললেন। 'কার কাছ থেকে একটা সাইকেল ধার করেছে, প্রতিদিন তুটো করে গ্রাম ঘুরছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এভাবে ও কত ঘুরবে? গ্রাম ছাড়া এখনও অনেক উদ্বাস্তুশিবির রয়েছে।'

গ্রেবার বললো, 'আমিও চারটে শিবিরে চিঠি লিখেছি। আমাদের তুজনের জন্যেই লিখেছি।'

'তুমি কি ভাবছো উত্তর আসবে?'

'হয়তো না। তবু এ এক ধরনের সান্ত্বনা।'

'কোন লাভ নেই, ভায়া।' রয়টার সোজা হয়ে বসলেন। 'পা যখন রয়েছে, যাও, খোলা হাওয়ায় গিয়ে একটু বেড়িয়ে এসো।'

'সুস্থ মানুষ ছুটিতে এসে কেউ তাঁবুতে কাটায় না।' খেলুড়েদের মধ্যে একজন তরুণ গ্রেবারের দিকে তাকালো। 'পরিষ্কার জামা কাপড় পরে অন্তত কয়েকদিনের জন্যে একটু ভদ্র হয়ে নাও। চাই কি দু সপ্তার জন্যে আমি একটা ঘরও ভাড়া দিতে পারি।'

রয়টার হাসলেন। 'নাগরিকের মতো পরিষ্কার জামা কাপড় পরলেই কি ভদ্র হওয়া যায়?'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া আর কি?'

'কিন্তু এত দিনের যান্ত্রিক-জীবন, তার স্বভাব যাবে কোথায়? জীবন অত সহজ নয় ভায়া, বুঝলে?' রয়টার গ্রেবারের দিকে চোখ ফেরালেন। 'তুমি কি বলো?'

গ্রেবার জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলো। নবাগত রঙরুটরা সমরশিক্ষা নিচ্ছে। ছুটে যাওয়া, পেছিয়ে আসা, বোমা ছোঁড়ার তালিম দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে হাস্যকর মনে হলো।

'আমি?' গ্রেবার আনমনে উত্তর দিলো, 'কি জানি। আসার সময় অবশ্য ভেবেছিলাম স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরবো। এখন আর ও কথা মনেই পড়ে না।'

'তোমাদের মতো সৈনিকদের ছুটিতে আসাই বৃথা।' তরুণ তাস থেকে চোখ না তুলেই কথাটা বললো। সকাল থেকে রুমেলের কাছে ও-ই হেরেছে সবচেয়ে বেশি।

গ্রেবার উঠে পড়লো।

রয়টার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় চললে?'

'শহরে দিকে। প্রথমে একবার ডাকঘরে যাবো, তারপর সেখান থেকে রেজিস্ট্রি অফিসটাও একবার ঘুরে আসবো।

বিয়ারের খালি বোতলটা রয়টার চেয়ারের নিচে রেখে দিলেন। 'কিন্তু ভুলে যেও না গ্রেবার, তুমি এখন ছুটিতে এবং শিগ্‌গিরি তা শেষ হয়ে যাবে।'

'এ এমন একটা জিনিস যা কখনো ভোলা যায় না।' তিক্ততায় ম্লান হয়ে উঠলো গ্রেবারের কণ্ঠস্বর।

রয়টার ধীরে ধীরে ভাঙা পাটাকে জানলা থেকে সরাবার চেষ্টা করলেন। 'অবশ্য তার মানে এই নয় যে তুমি তোমার বাবা-মাকে খুঁজবে না। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, ছুটি একবার শেষ হলে জীবনে আবার কবে ছুটি পাবে কেউ বলতে পারে না।'

'আমি জানি। এবং এও জানি, এর মধ্যে অনেক কিছু আমূল পালটে যেতে পারে।'

'বাঃ, তুমি যদি সত্যি এটা উপলব্ধি করে থাকো, তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।'

গ্রেবার জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে নিলো। আসার সময় হঠাৎ ওর চোখ পড়ে রুমেলের তাসের ওপর। চারটে গোলাম পেয়েছে, উপরন্তু পরপর চিড়ের সিরিজ। এক হাতেই রুমেল বিরুদ্ধপক্ষকে কুপোকাত করে দিলো। সবাই তাস ফেলে দিলো। 'নাঃ, এরকম তাস পেলে খেলার কোন মানেই হয় না!'

'এর্নস্ট!'

গ্রেবার চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো। খুব লম্বা নয়, অথচ ছিপছিপে, চমৎকার দেখতে একজন এস এ কম্যাণ্ডার ওর সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। গ্রেবার ভ্রূ কুঁচকে ভাবলো। তারপর ওর হালকা বাদামী রঙের স্বচ্ছ চোখ-দুটো দেখে চিনতে পারলো। 'আরে, বিনডিং না!'

'হ্যাঁ বন্ধু, আমিই সেই মহামান্য আলফনস্ বিনডিং।' বিনডিং প্রাণ খুলে হাঃ হাঃ করে হাসলো।

'প্রথমে আমি তোমাকে চিনতেই পারিনি।'

বিনডিং ওর হাতটা জড়িয়ে ধরলো। 'আর আমিও ভাবতে পারিনি এর্নস্ট, তুমি এখনও বেঁচে আছো। এক হাজার বছর পরে আবার আমাদের দেখা হলো। এতদিন কোথায় ছিলে?'

'রাশিয়ায়।'

'নিশ্চয়ই এখন ছুটিতে? তাহলে তো আমার উচিত তোমাকে একদিন খাইয়ে দেওয়া। চলো আমার বাড়ি, খুব কাছেই। তোমাকে সবচেয়ে ভালো কোনিয়াক খাওয়াবো। সত্যি, আজকের দিনে কোন সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়া এক দুর্লভ ভাগ্যের কথা! তাও আবার সগু সীমান্ত-প্রত্যাগত···' বিনডিং আবার প্রাণ খুলে হাসলো।

গ্রেবার ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। উঁচু ক্লাসে দু বছর ওরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিলো। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা, গ্রেবার ওকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। মাঝে মধ্যে সাধু ভাষার ব্যবহার এবং প্রাণখোলা উদাত্ত হাসিতে এবার গ্রেবারের স্পষ্ট মনে পড়লো। সৈন্য-বাহিনীতে থাকার সময়েই ও অবশ্য শুনেছিলো আলফনস্ এস এ'তে যোগ দিয়েছে। আর এখন ও নিঁখুত দামী পোশাকে, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল বাদামী চোখ আর প্রগলভ ভঙ্গিতে গ্রেবারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিনডিং ওকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলো। 'চলো এর্নস্ট, চলো। বহুদিন পরে দুজনে আজ একসঙ্গে মনের সুখে একটু পান করা যাবে।'

'কিন্তু আমার যে সময় নেই, আলফনস্।'

'ওসব কোন কথা আমি শুনতে চাই না। পুরনো দিনের বন্ধুদের মধ্যে গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে সময়ের অভাব কোনদিনই হয় না।'

পুরনো দিনের বন্ধু! গ্রেবার মনে মনে হাসলো। মোম পালিশ করা চকচকে বুট, কম্যাণ্ডারের তকমা-আঁটা ঝকঝকে উর্দি। তলে তলে তুমি অনেক দূর এগিয়েছো চাঁদ। তবু গ্রেবারের হঠাৎ করেই মনে হলো বাবা-মাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে ও হয়তো অনেক সাহায্য করতে পারে। ওপর মহলে যথেষ্ট হাত থাকা কিংবা কোন না কোন পথ বাতলে দেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

'শুধু এক পেয়ালা, এর্নস্ট।'

'বেশ, চলো।'

বিনডিং যতটা কাছে বলেছিলো আসলে তত কাছে নয়। বাড়িটা শহরতলীর একেবারে নির্জন প্রান্তে। সাদা রঙ করা ছোট্ট একতলা বাড়ি। গোধূলির রাঙা আলোয় চোখ-জুড়ানো স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ। বাগানে বড় বড় কয়েকটা বার্চ পপলার, ঝিরঝিরে হাওয়ায় পাতাগুলো মৃদু কাঁপছে। নিকুঞ্জে পাখির বাসা। ফোয়ারায় জলের শব্দ উঠছে।

বিনডিং গ্রেবারকে বাইরের বসার ঘরে নিয়ে এলো। ঘরটা যেমন বড়, তেমনি সুন্দর করে সাজানো। দেওয়ালে টাঙানো ঘাই-হরিণের সশাখ শৃঙ্গ, বুনো বরাহ আর অতিকায় ভল্লুকের মাথা। গ্রেবার স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। 'এসব তুমি আবার কবে শিকার করলে, আলফনস্?'

বিনডিং হাসলো। 'শিকার তো দূরের কথা, জীবনে আমি কখনও বন্দুকই ছুঁইনি। এমনি কিনেছি। কেন, খারাপ সাজানো হয়েছে?'

'চমৎকার!'

গ্রেবারকে ও গালিচা পাতা অন্য একটা ঘরে নিয়ে এলো। জানলায় রঙিন পর্দা টাঙানো। দেওয়ালে আশ্চর্য সুন্দর কয়েকটা হাতে আঁকা ছবি। চামড়ায় ঢাকা বড় বড় সোফাসেটি। 'কি, আমার আস্তানাটা খারাপ?'

গ্রেবার ঘাড় নাড়লো। খারাপ তো নয়ই, বরং ওর স্বপ্নে দেখা ঘরের

সঙ্গে এর একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে। হয়তো অতিরেক, তবু এমনই নির্জন স্বপ্নিল একটা পরিবেশ ও লালন করে এসেছে তার মনের কোণে। অথচ আজ ভাবতেও অবাক লাগে, ছেলেবেলায় বিনডিং-এর টিফিনের পয়সা জুটতো না।

'একি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এর্নস্ট? ব'সো। আমার উর্বশীকে দেখেছো?'

'উর্বশী!'

'ওই তো, পিয়ানোটার ওপর।'

ঝরনার জলে দাঁড়িয়ে অসামান্যা রূপসী এক নারীর ছবি। সম্পূর্ণ নগ্না। সূর্যস্নাত একরাশ সোনালী চুল। ছবিটা এমন আশ্চর্য জীবন্ত, যেন চোখ ফেরানো যায় না। গ্রেবারের হঠাৎ ব্যোটশারের কথা মনে পড়লো। ছবিটা দেখলে ও নিশ্চয়ই খুশি হতো।

'কি, কিছু বলছো না যে?'

গ্রেবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'অনন্যা! সত্যি, এ শিল্পের কোন তুলনাই হয় না।'

'বলছো?' বিনডিং উজ্জ্বল চোখে তাকালো। 'অনেক হাত ঘুরে আমার কাছে এসেছে। বলতে গেলের একরকম জলের দামেই কিনেছি।যদিও আমি শিল্পের কিংসু বুঝি না, তবে একটু জানি—যে-কেউ এটাকে দেখলে পাগল হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়ই। অন্তত রুবেনের ছবি হিসেবে তো বটেই!'

'তাহলে আমার সংগ্রহের তারিফ করছো?'

'অবশ্যই।'

'এবার তোমার খবর বলো, এর্নস্ট। এবং আমি তোমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারি কি না?'

বিনডিং-এর এক ধরনের আন্তরিকতা গ্রেবারকে স্পর্শ করে গেলো। জীবনে এই প্রথম কেউ নিজে থেকে ওকে সাহায্য করতে চাইলো। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও বললো, 'আমার বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছি না, আলফনস্। অনেক চেষ্টা করেছি। ওঁদের হয়তো এখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বিনডিং চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে বসলো। 'শহরে না থাকলে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর, এর্নস্ট। দু-একদিন সময় দিলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। চারদিকে এখন যা বিশৃঙ্খল অবস্থা...'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'এসো, তার আগে একটু পান করা যাক।' বিনডিং উঠে দেরাজ থেকে দুটো গ্লাস আর একটা বোতল নিয়ে এলো। 'একেবারে আসল আরমায়নাক। কোনিয়াকের চেয়ে আমার বেশি ভালো লাগে। প্রস্ত!'

'প্রস্ত্, আলফনস্।'

'এখন তুমি কোথায় থাকছো, কোন আত্মীয়ের কাছে?'

'শহরে আত্মীয় বলতে আমার কেউ নেই। আপাতত ওই তাঁবুতেই কাটাচ্ছি।'

'কিন্তু, এর্নস্ট···' বিনডিং খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো। 'ছুটিতে এসে সৈন্যশিবিরে বাস করার কোন মানেই হয় না। যাদের কোন উপায় নেই, তাদের কথা অবশ্য আলাদা। তুমি স্বচ্ছন্দে আমার এখানে থাকতে পারো। সব ঘরই খালি পড়ে রয়েছে। থাকা খাওয়া স্নানের কোন অসুবিধে হবে না। চাই কি ইচ্ছে করলে মেয়েদেরও এখানে নিয়ে আসতে পারো।'

'তুমি এখানে একাই থাকো?'

'নিশ্চয়ই! তুমি কি ভেবেছো আমি বিয়ে করেছি? আর যাই ভাবো ভাই, আমি অত কাঁচা ছেলে নই। মেয়েরা এখন আমার পায়ের নিচে লুটোপুটি খায়।'

'তাই নাকি?'

'তবে আর বলছি কি,' বিনডিং ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসলো। 'এই তো গতকাল সন্ধ্যেবেলায় সবে বোতল নিয়ে মৌজে বসেছি। দেখলাম একটা মেয়ে, এই বছর কুড়ি বাইশ বয়েস, চমৎকার দেখতে, সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার কোলে। কি ব্যাপার কিচ্ছু বলবে না। আমার আবার অতশত ঢঙ ভালো লাগে না। সোজা বিছানায় নিয়ে এলাম। ওড়নাটা ওখানেই পড়ে রইলো, জামা কাপড় মেঝেয় লুটচ্ছে। যেমন নিটোল স্বাস্থ্য, তেমনি বুক। ঘণ্টাখানেক বিছানায় ছিলো। টাকা দিতে গেলাম, নেবে না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। আমাকে বললো ওর স্বামীকে বন্দীশিবির থেকে বাইরে বার করে এনে দিতে হবে।'

গ্রেবার মুহূর্তের জন্যে গুম হয়ে রইলো। তারপর চোখের পাতা টেনে তুললো। 'তুমি তা পারো নাকি?'

বিনডিং হাসলো। 'কাউকে বন্দীশিবিরে আমি খুব সহজেই ঢোকাতে পারি, কিন্তু বার করে আনা অত সহজ নয়, এর্নস্ট। আমি অবশ্য ওকে কোন কথা দিইনি। সে যাকগে, তুমি কি ঠিক করলে বলো?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি, আলফনস্। সবাইকে সংবাদ দেবার জন্যে আমি আটচল্লিশ নম্বর তাঁবুর ঠিকনাই দিয়েছি। কয়েকদিন আরো অপেক্ষা করে দেখি।'

'ঠিক হ্যায়। কিন্তু মনে রেখো এর্নস্ট, তোমার লাগি হেথা অনুক্ষণ অবারিত দ্বার।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, আলফনস্।'

'বাঁদর কোথাকার! এতে ধন্যবাদের কি আছে? ছেলেবেলায় স্কুলে কতদিন তোমার মায়ের হাতে তৈরি খাবার ভাগ করে খেয়েছি, আর আজ এই সামান্য উপকারটুকু করতে পারবো না?

'আজ তাহলে চলি, আলফনস্।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'আবার তো আসবো। দেখো, হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই।'

'না না, কাল। কাল সন্ধ্যের সময় আমি থাকবো।'

'তোমার কি মনে হয়, এর মধ্যে কোন খবর পাবে?'

'পাওয়াও যেতে পারে। আমি কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি, এর্নস্ট, কাল অনেকক্ষণ থাকতে হবে। দুজনে খুব গল্প করবো আর মদ খাবো।'

'বেশ।'

'আচ্ছা, তুমি হাসপাতালগুলোয় খোঁজ নিয়েছিলে নাকি?'

'নিয়েছি।'

'কবরখানায়?'

'না।'

'একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। যদিও আমি সে-ধরনের কিছু আশা করছি না, তবু···'

'কাল সকালেই যাবো।'

'বিকেলে তাহলে নিশ্চয়ই আসছো?'

'হ্যাঁ।'

বিনডিং গ্রেবারের হাতদুটো জড়িয়ে ধরলো। 'তুমি জানো না এর্নস্ট, মাঝে মাঝে আমার কি ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে। অথচ সবাই আমার কাছ থেকে কেবল সাহায্যই চায়।'

'আমিও তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি, আলফনস্।' গ্রেবার ম্লান ঠোঁটে হাসলো।

'তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তোমার কথা সম্পূর্ণ আলাদা।' বিনডিং

দ্রুত পায়ে উঠে দেরাজ থেকে আরমায়নাকের নতুন একটা বোতল বার করে আনলো। 'এটা তুমি রেখে দাও, এর্নস্ট। দাঁড়াও, এক মিনিট··· ফ্রাউ ক্লাইনার্ট! একটু কাগজ দিন তো।'

গ্রেবার ইতস্তত করলো। 'কোন দরকার ছিলো না, আলফনস্।'

'আমার ভাঁড়ার ভর্তি রয়েছে।' পরিচারিকার দেওয়া কাগজে বিনডিং বোতলটা জড়িয়ে গ্রেবারে হাতে দিলো। 'নাও। আর কাল আসার কথা কিন্তু একদম ভুলবে না।'

গ্রেবার হাকেনষ্ট্রাসে ফিরে এলো। সারা পথ স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বারবার ঘুরেফিরে ওর কেবল আলফনসের কথাই মনে পড়েছে—জীবনে প্রথম যে ওকে সাহায্য করতে চাইলো, নিঃসংকোচে যে নিজের বাড়িতে থাকার কথা বললো, সে একজন এস এ কম্যাণ্ডার! জীবনে যে কখনও বন্দুক ছোঁয়নি, অজস্র নিরাপরাধ মানুষকে সে নির্দ্বিধায় ঠেলে দিয়েছে বন্দীশিবিরের নগ্ন অন্ধকারে। গ্রেবার পকেটে অনুভব করলো আরমায়নাকের ভারি বোতলটা!

গোধূলির রাঙা আলো মিলিয়ে গিয়ে পায়ে পায়ে তখন সন্ধ্যে এগিয়ে আসছে। আকাশের রঙ এখন টলটলে কাঁচা সোনার মতন। গাছের পাতা-গুলো আশ্চর্য স্নিগ্ধ আর কোমল। ভগ্নস্তূপের আনাচে-কানাচে অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। চিরকুট-আঁটা দরজার সামনে গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। একটু ভালো করে লক্ষ্য করতেই বুকের ভেতরটা ওর ছ্যাৎ করে উঠলো। ওর চিঠিটা! প্রথমে ভাবলো বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু না, তাহলে পিনগুলো অন্তত থাকতো। নিশ্চয়ই কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে।

একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই গ্রেবারের বুকের রক্ত চলকে উঠলো। ব্যাকুল আগ্রহে ও সারা দরজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। না, কোন চিঠি নেই। এক ছুটে ও আঠারো নম্বরে এসে পৌঁছলো। দ্বিতীয় চিঠিটা তখনও রয়েছে। কাগজটা উলটেপালটে দেখলো। না, এতেও কোন খবর নেই।

বিহ্বল চোখে ও চারদিকে তাকালো। দেখলো সিঁড়ির ওপর সেই চেয়ারটা নেই। হয়তো কেউ নিয়ে গেছে। তার জায়গায় সাদা মতন কি যেন হাওয়ায় নড়ছে। গ্রেবার দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে এলো। দেখলো পুরনো নোংরা ছেঁড়া একটা খাতা। খাতাটা ও টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সামনেই দুটো ইঁটের খাঁজে একটা চটি বই। বইটা এমনভাবে রয়েছে যেন এইমাত্র পড়তে পড়তে কেউ উঠে গেছে। গ্রেবার বইটা তুলে

নিলো। সামনের মলাটটা নেই। প্রথম পাতায় অস্পষ্ট কালিতে তার নাম লেখা। বারো-তেরো বছর বয়েসের স্কুলপাঠ্যের ইতিহাস। ভেতরেও জায়গায় জায়গায় তার নিজের হাতে লেখা মন্তব্য। বিস্মৃত অতীতের নানান পাগলামি। গ্রেবার বইটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো। সেই মুহূর্তে ওর মনে হলো সবকিছু যেন কাঁপছে, অথচ স্পষ্ট করে বুঝতে পারলো না কাঁপছে কোনটে—ধ্বংসলীন সারাটা শহর, না মাথার ওপরের টলটলে কাঁচা-সোনার রঙের আকাশ, না হাতে ধরা দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্দারের বিশাল সাম্রাজ্য ?

বইটা একপাশে রেখে গ্রেবার চারদিকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজলো। কিন্তু আর কিছু পেলো না। সিঁড়ির একটা ধাপে ও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। হঠাৎ মনে পড়লো বিনডিং-এর দেওয়া বোতলটার কথা। ঢকঢক করে খানিকটা আরমায়নাক গলায় ঢেলে দিলো। তারপর আবার রাস্তায় নেমে এলো।

কার্লসপ্লাটসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। পার্কের কাছাকাছি আসতে, উল্টো দিক থেকে হনহনিয়ে আসা কার সঙ্গে যেন গ্রেবারের ধাক্কা লাগলো। দোষ গ্রেবারেরই। লোকটা তেড়ে উঠলো, 'কানা নাকি, দেখে পথ চলতে পারো না ?'

গ্রেবার ওর দিকে তাকালো। 'ভুল হয়ে গেছে, লুডভিগ। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম।'

তরুণ লেফটেনান্ট একেবারে থ হয়ে গেলো। তারপর বাঘের মতো ওর কাঁধে থাবা বসালো, 'আরে এর্নস্ট, তুমি !'

'চিনতে পেরেছো তাহলে ?'

'আলবত ! এখানে কোত্থেকে ? ছুটিতে এসেছো বুঝি ?'

'হ্যাঁ। তুমি ?'

'আমার শেষ হয়ে গেলো। তাড়া দেখে বুঝতে পারছো না, এই তো ফিরে যাচ্ছি।'

'তারপর কেমন কাটলো ?'

'আর ব'লো না ভাই। পরের বারে যেখানেই হোক, অন্তত বাড়িতে আর আসছি না।'

'সেকি ?'

'বাড়ির জন্যে আমার ছুটিটাই মাঠে মারা গেলো, এর্নস্ট।' ভিলমান সিগারেট বার করলো। 'তুমি কত দিন এসেছো?'

'চারদিন।'

'আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো, নিজেই বুঝতে পারবে।'

ভিলমান সিগারেটটা ধরাবার চেষ্টা করলো। বাতাসের জন্যে পারলো না। গ্রেবার লাইটার জ্বেলে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো। মুহূর্তের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো লুডভিগ ভিলমানের বুদ্ধিদীপ্ত মুখটা। 'ধন্যবাদ, এর্নস্ট। ওঁদের ধারণা আমি এখনও সেই ছোট্টটিই আছি।' ভিলমান কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ছুঁড়ে দিলো। 'সারাক্ষণ ওঁদের সঙ্গে কাটাতে হবে, একমুহূর্ত চোখের আড়াল হলে চলবে না। মা তো কেঁদে কেঁদেই বুক ভাসিয়ে দিলেন—প্রথম দিকে, আমি বাড়ি এসেছি বলে আর শেষের দিকে আমাকে চলে যেতে হবে বলে। বোঝো ঠেলা!'

'তোমার বাবা তো প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সৈনিক ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর তাঁর ছেলেও সৈনিক বলে তিনি গর্ব অনুভব করেন। যেখানে যাবেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, যাকে পাবেন তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন। উঃ, প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ করে ছেড়েছেন।' ভিলম্যান ছোট্ট করে হাসলো। 'তাই বলছিলাম, এখনও সময় আছে, চেষ্টা করবে যতটা কম ওঁদের ধারেকাছে ঘেঁষা যায়।'

গ্রেবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, আমায় ওসবের কোন বালাই নেই, লুডভিগ।'

'সত্যই তুমি ভাগ্যবান।' ভিলমান গ্রেবারের হাতটা জড়িয়ে ধরলো। 'বড্ড দেরি হয়ে গেলো, আমি চলি, এর্নস্ট।'

'সাবধানে যেও। দেখো, আবার অন্য কারুর সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগিও না।'

দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ভিলমানের দেহরেখা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

গ্রেবার ঠিক বুঝতে পরেলো না এবার ও কী করবে। কোথাও কোন আলো নেই। সারা শহর কবরের মতো নিতল অন্ধকারে মোড়া। কোথায় খুঁজবে ও। এখানের এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যেগুলো গ্রেবারকে মাঝেমাঝে পাগল করে তোলে। এখনই তাঁবুতে ফিরতে বা স্বল্প পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা করতে ওর ইচ্ছে করলো না। ওদের লোকদেখানো সহানুভূতি ওর কাছে অসহ্য মনে হয়। অন্ধকারে জমাট ভগ্নস্তূপগুলোর দিকে গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো। ঠিক যেন অন্তহীন সমুদ্রে ছোট ছোট দ্বীপের মতন। এরই কোনটায় ও কি মাথা গুঁজতে চেয়েছিলো? এরই জন্যে ও কি বিক্ষুব্ধ সীমান্ত

থেকে ছুটে এসেছে একমুঠো শান্তি আর সান্ত্বনার ললিত আশায় ? আশ্চর্য ! কিন্তু ওর আশার সে-দ্বীপ কখন নিঃশব্দে তলিয়ে গেছে মৃত্যুর অতল সমুদ্রে, আর যুদ্ধ-সীমান্তে এখন ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। এমনকি বুকের গহনে, স্নায়ুতন্ত্রীর প্রতিটি শিরা-উপশিরায়।

সিনেমার টিকিট কেটে গ্রেবার ভিতরে প্রবেশ করলো। ভেতরটা রাস্তার চেয়ে কম অন্ধকার। মৃত নগরীর চারপাশে প্রেতের মতো লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর চাইতে এখানে চুপচাপ বসে থাকা অনেক ভালো।

এগারো

কবরখানার মৃত মানুষেরাও বোমার হাত থেকে রেহাই পায়নি। সামনের দিকের কয়েকটা ক্রুশ উড়ে গেছে, বড় বড় পাথরগুলো ছিটকে এসে পড়েছে পথের ওপর। উইলো-বীথির কয়েকটা প্রাচীন গাছ এমনভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে, ওদের পল্লবিত শাখাগুলো মনে হচ্ছে যেন সবুজ শেকড়। বিধ্বস্ত কবরের হাড়গুলো ডাঁই হয়ে জমে উঠেছে একজাগায়। কফিনের ভাঙা টুকরোগুলো ছড়িয়েছিটিয়ে পড়েছে দূরে দূরে।

গির্জার পাশে অস্থায়ী একটা ছাউনি। একজন ওভারসিয়ার এবং দুজন জোয়ান সেখানে কাজ করছে। সবাই ঘামে নেয়ে উঠেছে। গ্রেবারকে কিছু জিজ্ঞেস করতে দেখে ওভারসিয়ার তেড়ে এলো। 'আমাদের অতশত সময় নেই মশাই, যান যান, এখান থেকে। দুপুরের আগেই আমাদের কম-সে-কম বারোটা কবর দিতে হবে। আরে বাবা, আপনার বাপ-মা এখানে আছে কিনা তা আমরা কি করে জানবো ? আমরা তো আর গনৎকার নই যে হাত গুনে বলে দেবো।'

'আপনাদের নামের কোন তালিকা নেই ?'

'তালিকা ?' ওভারসিয়ার পাগলের মতো হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। তালিকাটা হবে কোত্থেকে ? বাইরে এখন কত মড়া পড়ে আছে জানেন ? তিনশো ! শেষ বিমান আক্রমণের পর কত মড়া এসেছে জানেন ? সাতশো ! তার আগে এসেছে পাঁচশো। তাহলে বুঝতেই পারছেন, চারদিনে তালিকার বহর ? আজ রাতে না কাল সকালে, এর পরের আবার বিমান আক্রমণ কখন হবে কেউ বলতে পারে না।'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না। নিঃশব্দে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে তিনটে সিগারেট রাখলো টেবিলের ওপর। জোয়ান দুজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করলো। 'নিন, খুব ভালো রাশিয়ান সিগারেট। বাবার জন্যে দু প্যাকেট এনেছিলাম।'

গ্রেবার নিজেও একটা ধরিয়ে প্যাকেটটা পকেটে চালান করে দিলো।

'আপনি একটু দাঁড়ান, দেখি কি করতে পারি।' ওভারসিয়ারের মুখের চেহারাই এখন পালেট গেলো। 'বাঃ, চমৎকার সিগারেট! আপনি এই কাগজে নাম ঠিকানাটা লিখে দিন। এদের একজন অফিসে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসছে। ততক্ষণে আপনি বরং গির্জার ভেতরে গিয়ে মৃতদেহগুলো একবার দেখে আসুন। ওদের নামের তালিকা এখনও তৈরি হয়নি।'

'ধন্যবাদ।'

ভেতরে এসে গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। জীবনে অজস্র মৃতদেহ দেখেছে, কিন্তু ঠিক এমনি দেখবে ও কল্পনাও করতে পারেনি। প্রাচীরের একদিকে সার সার করে রাখা রয়েছে অজস্র মৃতদেহ। কেউ কফিনে, কেউ স্ট্রেচারে, কেউ কম্বল কিংবা সাদা চাদরে ঢাকা। বাকি সবাই উন্মুক্ত। কারুর মাথার সামনে একচিতে কাগজে নাম লেখা, কারুর বুকের ওপর শুভ্র ফুলের গুচ্ছ। গ্রেবার ঝুঁকে নামগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে গেলো, নাম-না-লেখা শবাচ্ছাদনগুলো তুলে তুলে দেখলো। খুব অল্প কয়েকজনেরই চোখের পাতা বন্ধ আর হাতগুলো বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা। বাকি সবাই ঠিক যেমন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো, তেমনি ভাবে রাখা রয়েছে। শুধু গ্রেবারই নয়, নিঃশব্দ একটা মৌন মিছিল ভুর ভুর করে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে গেলো। দু-একজন যারা আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখের মণি থেকে নিজেদের আত্মীয়তার চিহ্ন খুঁজে পেলো, সেখানেই বসে পড়ে তারা বুক-ফাটা কান্নায় হাহাকার করে উঠলো।

গ্রেবার ফিরে এলো।

ওভারসিয়ার জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কিছু পেলেন ?'

'না।'

'আপনি সৈনিক বলেই পারলেন, অনেকে আবার এসব সহ্য করতে পারে না।'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না।

'এখানের অবস্থা তবু তো ভালো। যতটা সম্ভব একটা একটা করে কবর

দেবার চেষ্টা করেছি। অন্য অনেক জায়গায় শয়ে শয়ে মৃতদেহ একসঙ্গে কবর দেওয়া হচ্ছে। কাজ করার মতো এত লোক কোথায় ?'

গ্রেবারের লেখা স্লিপ হাতে একজন লোক ফিরে এলো। 'না, এখানে এনামে কেউ নেই।'

গ্রেবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

উইলোর নিচু ডালে কয়েকটা শালিক গলা ফুলিয়ে ঝগড়া করছে। গা গুলিয়ে উঠলো।

সন্ধ্যের অনেক আগেই গ্রেবার বিনডিং-এর বাড়িতে এসে পৌঁছলো। খাঁচায় কি যেন একটা পাখি মিষ্টি শিস দিচ্ছে। লাইলাক ঝোপের এপাশে জংকুইল আর টিউলিপ ফুটেছে। বার্চ-বীথির মাঝখানে মর্মর পাথরের একটা নগ্ন নারীমূর্তি।

পরিচারিকা দরজা খুলে দিলো। সাদা সজ্জাবরণী পরা দীর্ঘাঙ্গী মহিলা, সামনের চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। 'আপনিই তো হের গ্রেবার, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'কম্যাণ্ডার বাড়ি নেই। জরুরী একটা পার্টি মিটিংয়ে বেরিয়ে গেছেন। আপনার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছেন।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই পরিচারিকা ফিরে এলো। একহাতে চিঠি, অন্য হাতে কাগজে মোড়া একটা বোতল। গ্রেবার চিঠিটা পড়ে দেখলো। আলফনস্ লিখেছে ও যেন বাবা-মাকে খোঁজার জন্যে বেশি সময় ব্যয় না করে, কেননা শহরে ওরা মৃত বা আহত হননি। সম্ভবত ওঁদের অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাশিয়া প্রত্যাগত বন্ধুর নৈশ্য-উৎসবের জন্যে ভদকার এই বোতলটা ও রেখে গেছে।

গ্রেবার ভদকার বোতলটা পকেটে চালান করে দিলো। ফ্রাউ ক্লাইনার্ট তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলো। 'কম্যাণ্ডার আপনাকে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ। ওকেও আমার প্রীতি জানাবেন। বলবেন আমি আবার কাল আসবো।'

'উনি খুব খুশি হবেন।'

গ্রেবার ফিরে চললো। মনে মনে ভাবলো কি অদ্ভুত মানুষের চরিত্র। আলফনসের মতো এস এ কম্যাণ্ডারও কারুর প্রতি আন্তরিক, অথচ জীবনে

শান্তিপ্রিয় কত অজস্র নিরীহ মানুষকে ঠেলে দিয়েছে বন্দীশিবিরের নির্মম গহ্বরে। চিঠির অন্য একটা শব্দ মনে পড়তেই ওর হাসি পেলো। নৈশ-উৎসব! কোথায়, কিসের উৎসব? আটচল্লিশ নম্বরের অসুস্থ সৈনিকদের সঙ্গে? নাকি অন্য কোন ইঙ্গিত রয়েছে? যদি তাই হয়···হঠাৎ ওর মনে পড়লো এলিজাবেথ ক্রুজের কথা। হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে খানিকটা সময় ওখানে গিয়ে ও কাটিয়ে আসতে পারে।

এলিজাবেথ নিজেই দরজা খুলে দিলো। গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। 'তোমাকে এখন বাড়িতে পাবো ভাবতেই পারিনি। ভেবেছিলাম দরজা খুলে তোমার সেই ড্রাগনটাই বুঝি পথ আটকে দাঁড়াবে।'

'উনি এখন এখানে নেই। জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল নারীবাহিনীর সম্মেলনে গেছেন।'

গ্রেবার হেসে ফেললো। 'হ্যাঁ, নারীবাহিনীর যোগ্য সদস্যা বটে! ও এখানে না থাকলে ঘরের চেহারাটাই অন্য রকম মনে হয়।'

'ভেতরে এসো।' এলিজাবেথ সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলো।

গ্রেবার পকেট থেকে বোতলটা টেনে বার করলো। 'তোমার জন্যে কিছু ভদকা এনেছি। আমার এস এ কম্যাণ্ডার বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার।'

'ওরে বাব্বাঃ, তোমার আবার ওই রকম কোন বন্ধু আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠিক যেমন তোমার ড্রাগনমুখো ফ্রাউ লিসার রয়েছে।'

এলিজাবেথ ঠোঁট টিপে হাসলো। 'দেখি, ছিপি খোলার কোন স্ক্রু পাই কি না।' বোতলটা হাত থেকে নিয়ে ও রান্নাঘরে চলে গেলো।

গ্রেবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, কালো সোয়েটার আর আঁট-সাঁট খাটো ঘাগরায় ওকে চমৎকার মানিয়েছে। চুলগুলো ঘাড়ের কাছে লাল ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। চওড়া ঋজু কাঁধ, সরু কোমর।

এলিজাবেথ ফিরে এলো। 'নাঃ, কোথাও পেলাম না।'

'দরকার নেই, আমাকে দাও।'

গ্রেবার বোতলটা হাতে নিয়ে মুখের কাছের রাংতাটা নখ দিলে তুলে ফেললো। তারপর হাত দিয়ে ঘসে ঘসে জায়গাটা গরম করে উরুর উপর দুবার জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিলো। ছিপিটা ছিটকে বেরিয়ে গেলো। 'যুদ্ধ-শিবিরে আমরা এইভাবে বোতল খুলতাম। তোমার গ্লাস আছে? না হলে অবশ্য বোতল থেকেও খাওয়া যায়।'

'না না, গ্লাস আছে—দিচ্ছি।'

বুকসেল্‌ফের নিচের দেরাজ থেকে এলিজাবেথ দুটো পাতলা কাচের গ্লাস বার করে আনলো। 'দাঁড়াও, একটু ধুয়ে আনি।'

গ্রেবার ঘরের চারদিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। ঘরটা আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। বিছানা, সবুজ গদি আঁটা দুটো চেয়ার, বই রাখার আলমারি, পুরনো আমালের ড্রেসিং টেবিল। কাচটা এখনও ঝকঝক করছে। সবকিছুই ছিমছাম নিপুণ হাতে সাজানো। শুধু ঘর নয়, এলিজাবেথকেও আজ অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে সেদিনের চাইতে অনেক বেশি রূপসী আর চঞ্চল।

এলিজাবেথ ফিরে এলো। গ্লাসদুটো রাখলো ড্রেসিং টেবিলের ওপর। 'সত্যি বলো তো, কতদিন পরে আবার আমাদের দুজনে দেখা হলো?'

'ঠিক একশো বছর পরে। আমরা তখন শিশু ছিলাম আর পৃথিবীতে যুদ্ধ বলে কিছু ছিলো না।'

'আর এখন?'

'এখন আমরা একশো বছরের প্রবৃদ্ধ, প্রাচীন। প্রত্যয়হীন অভিজ্ঞতার ভারে জর্জর, কখনও কখনও ক্লান্ত বিষণ্ন ম্লান।'

এলিজাবেথ অবাক হয়ে গ্রেবারের মুখের দিকে তাকালো। ও ভাবতেও পারেনি ওর বুকের মধ্যে এত গ্লানি জমে থাকতে পারে। এলিজাবেথ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'সত্যি ভাবা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে আর কিছুদিন চললে হয়তো পাগল হয়ে যাবো।'

'নিশ্চয়ই, প্রত্যেকেরই একটা সহ্যের সীমা থাকে।' গ্রেবার গ্লাস দুটো ভর্তি করে একটা এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে দিলো। 'নাও, এস এ কম্যাণ্ডারের দেওয়া উপহারের সদ্ব্যবহার করো।'

গ্রেবার প্রায় একচুমুকেই সবটা সাবাড় করে দিলো। ভদকাটা সত্যিই চমৎকার। যেমন কড়া তেমনি টাটকা। 'আর এক গ্লাস নেবে নাকি?'

এলিজাবেথ প্রথমে ঘাড় নাড়লো। তারপর বললো, 'দাও।'

গ্রেবার দুটো গ্লাসই আবার ভর্তি করে দিলো।

এলিজাবেথ দ্বিতীয়বারের পানীয় ধীরে ধীরে শেষ করার পর খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'এসো তোমাকে কয়েকটা সহ্যের নমুনা দেখাই।'

টানা বারান্দা পেরিয়ে এলিজাবেথ অন্য একটা ঘরের দরজা ঠেললো। 'তাড়াতাড়িতে চাবি দিতে ভুলে গেছেন। ভেতরটা একবার তাকিয়ে দেখো।'

'কিন্তু···'

'এতে কোন কিন্তু নেই। আমি না থাকলে উনিও আমার সারা ঘর তন্নতন্ন করে খোঁজেন।'

গ্রেবার ভেতরে প্রবেশ করলো। সামনের দিকটা খুব সাধারণ। রাস্তার দিকে জানলা। জানলার উল্টো দিকের দেওয়ালে টাঙানো হিটলারের বিরাট একটা রঙিন প্রতিকৃতি, মালা আর ওকের পাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। টেবিলে রূপোর পাত দিয়ে মোড়া চামড়ায় বাঁধানো হিটলারের আত্মজীবনী 'আমার সংগ্রাম'এর রাজ-সংস্করণ। মলাটে সোনার জলে স্বস্তিকা আঁকা। বইটার দুধারে দুটো রূপোর বাতিদান। তাতে আবার ফুয়ারের ছোট্ট দুটো ছবি বাঁধানো—একটা বার্চবনে শিকারী কুকুর নিয়ে ঘুরছেন, অন্যটা ধবধবে সাদা পোশাক পরা একটা বাচ্ছা মেয়ে ওঁকে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছে।

গ্রেবার এতে বিস্মিত হতে পারলো না। স্বেচ্ছাচারীর প্রতি ভালবাসা গভীর ধর্মান্ধতায় পরিণত হবার নিদর্শন এর আগে বহুবার ও দেখেছে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতেই গ্রেবার চমকে উঠলো। দেখলো কি এক নিঃশব্দ যন্ত্রণায় এলিজাবেথের দুচোখের পাতা দুটো জলে ভিজে উঠেছে।

'তুমি বলো, এত ধ্বংস, এত মৃত্যুর পরেও কি এসব সহ্য করা যায়?'

সেই মুহূর্তে গ্রেবার কোন উত্তর দিতে পারলো না। একটু বিরতির পর জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় ফ্রাউ লিজারই তোমার বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছে?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে তার আগে থেকেই উনি এখানে বাস করছিলেন। তখন উনি ওঁর বাচ্ছাটাকে নিয়ে একটা ঘরে থাকতেন। বাবাকে নিয়ে যাবার পর উনি বাবার খালি ঘরটাও দখল করেন। ওঁর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।' এলিজাবেথ বাইরে এসে দরজাটা টেনে দিলো। 'তুমি তো জানো—বাবামণি একদিকে যেমন ভালো মানুষ, অন্যদিকে তেমনি ভীষণ একরোখা। অন্যায় একটুও সহ্য করতে পারেন না। সন্দেহের তালিকায় ওঁর নাম অনেক আগে থেকেই ছিলো।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ। পার্টি বক্তৃতা শুনে মাঝে মাঝে উনি খেপে উঠতেন। উনি বিশ্বাস করতেন এ যুদ্ধে জার্মানি কোনদিন জিততে পারবে না।'

'আজকের দিনে একথা অনেকেই বিশ্বাস করে।'

এলিজাবেথ থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো। গ্রেবার আলতো করে ওর কাঁধে হাত রাখলো। 'চলো, আর একটু পান করা যাক।'

দুজনে আবার শোবার ঘরে ফিরে এলো।

এলিজাবেথ ম্লান স্বরে বললো, 'শুধু বাবামণি ছাড়া, তোমার মতো এমন স্পষ্ট করে একথা আর কাউকে বলতে শুনিনি, এর্নস্ট।'

'যেহেতু অনেকেই এখন স্পষ্ট করে বলতে ভয় পায়. এলিজাবেথ।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।' এলিজাবেথ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর স্বগত স্বরে বললো, 'বাবামণি কিন্তু ভয় পাননি।'

গ্রেবার কিছু বললো না। নিঃশব্দে গ্লাসদুটো ভর্তি করলো। কিছুক্ষণ এলিজাবেথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'উঃ, চারদিকের ক্লেদাক্ত কদর্যতা দেখতে দেখতে বুড়িয়ে গেলাম!'

এলিজাবেথ ম্লান হেসে গ্লাসটা তুলে নিলো। 'আমার কিন্তু তার চেয়েও খারাপ লাগে। নিজেকে কেবলই দিনরাত রক্তাক্ত পাখা ঝাপটে-মরা বন্দী পাখির মতো মনে হয়।'

গ্রেবার চমকে ওর মুখের দিকে তাকালো। আর তখনই ওর নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হলো। চেয়ারে বসে মাথাটা ও পেছন দিকে হেলিয়ে দিলো। 'আমি বুঝি, এলিজাবেথ। কিন্তু ডাইনী লিজার যে তোমাকেও অভিযুক্ত করবে না, একথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। হয়তো তখন তোমাদের সারা ফ্ল্যাটটাতেই ও জুড়ে বসবে।'

'অসম্ভব নয়।'

'তোমার কিন্তু সেই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকার কোন যুক্তি নেই।'

'আমি জানি, এর্নস্ট। এ আমার অন্ধ বিশ্বাস, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না···' এলিজাবেথের গলার স্বর এখন করুণ আর্তনাদের মতো মনে হলো। 'আমি বিশ্বাস করি, এখানে থাকলে একদিন না একদিন বাবামণি ঠিক ফিরে আসবেন। কিন্তু আমি চলে গেলে ওকে আর কোনদিনও খুঁজে পাবো না, চিরজন্মের মতো হারাবো।'

গ্রেবার সোজা হয়ে বসলো। নিচের রাস্তা থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে অনেকগুলো পায়ের শব্দ আর কাটা কাটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

এলিজাবেথ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'চলো, ফ্রাউ লিসার এসে পড়ার আগেই কেটে পড়ি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবে?'

'জানি না। চলো যেখানে হোক।'

'কাছেপিঠে কোথাও রেস্তোরাঁ নেই?'

'ভিড় আমার ভাল্লো লাগবে না, এর্নস্ট। চলো, এমনি একটু হাঁটি।'

'চলো।'

সারা শহর অন্ধকারে মোড়া। পথগুলো নির্জন। কার্লসপ্লাটস্ পেরিয়ে ওরা মারীয়েনষ্ট্রাসের পথ ধরলো। তারপর পুরনো শহরের মধ্যে দিয়ে নদীর দিকে এগুলো। একটু পরেই সবকিছু মনে হলো অবাস্তব। কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই, একমাত্র ওরাই যেন এ পৃথিবীর শেষ মানব মানবী। জানলাগুলো কাগজ কিংবা কালো পর্দায় ঢাকা। কফিনের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সারা শহর যেন বিলাপ করছে। সান্ত্বনা কেবল মাথার ওপরে একফালি চাঁদ আর শার্সির গায়ে প্রতিবিম্বিত জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি।

গ্রেবার সিগারেট ধরালো। 'কি ব্যাপার, আজ যেন আরও নিঝুম বলে মনে হচ্ছে?'

'গত দুদিন যে বিমান আক্রমণ হয়নি, তাই সবাই ঘরের ভেতরে দরজা জানলা এঁটে বসে আছে। যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ ঘটতে পারে, এই ভয়ে কেউ বাইরে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না। বরং বিমান আক্রমণের পরেই রাস্তায় বেশি লোক দেখা যায়।'

'ওরে বাব্বাঃ, এরও আবার নিয়মকানুন আছে দেখছি!'

'নিশ্চয়ই। অবশ্য তোমাদের যুদ্ধ-সীমান্ত নিশ্চয়ই এ নিয়মের আওতায় পড়ে না, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

ওরা হেঁটে চললো। মাঝে মাঝে ছেঁড়া মেঘে চাঁদ ঢেকে যাচ্ছে, আর তখনই ভগ্নস্তূপগুলো অন্ধকারে সমুদ্র-দৈত্যের মতো বিশাল হয়ে উঠছে। মেঘ সরে গেলে আবছা জ্যোৎস্নায় শহরটা মনে হচ্ছে যেন রূপকথার সেই নিঝুম পুরী। হঠাৎ খুব কাছেই কোথাও পেয়ালা পিরিচের ঠুংঠাং শব্দ শোনা গেলো।

গ্রেবার ঠাট্টা করলো, 'যাক, এ পৃথিবীতে আরও একজন অন্তত বেঁচে আছে।'

'হ্যাঁ, ওরা কফি খাচ্ছে। আজই রেশনে দেওয়া হয়েছে। বোম-কফি।'

'বোম-কফি! সেটা আবার কি?'

'ওমা, তুমি জানো না বুঝি?' এলিজাবেথ খিলখিল করে হেসে উঠলো।

'খুব বেশি বোমা পড়ার পরে রেশনে কিছু বাড়তি কফি দেওয়া হয়। কখনও কখনও তার সঙ্গে চিনি।'

গ্রেবার হাসলো। 'ওঃ তাই বলো! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাদেরও ওখানে তাই দেওয়া হয়। সত্যি, ভাবতেও হাসি পায়—এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা মৃত্যুভয়ে কাঁটা হয়ে থাকার পরে এক প্যাকেট সিগারেট, খানিকটা কড়া মদ আর দুশো গ্রাম করে কফি।'

'দু-শো গ্রাম কফি!'

'কেন, অসুবিধেটা কোথায়? বরাদ্দের পরিমাণকে মৃত্যুর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে, পরিমাণটা তাই-ই দাঁড়ায়।'

এলিজাবেথ আর কিছু বললো না। হয়তো মনে মনে ও লজ্জা পেয়েছিলো। দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চললো। এক সময়ে গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। 'আজকের রাতটা ভারি চমৎকার। চলো এলিজাবেথ, কোথাও গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই। ভদকার বোতলটা সঙ্গে আনলেই ভালো করতাম। একটু পানীয়ের লোভে গলাটা টাক্‌টাক্ করছে।'

'না, এর্নস্ট! আমাকে কোন রেস্তোরাঁ কিংবা পানশালায় যেতে ব'লো না, দোহাই তোমার। চারদিকে এখন নিষ্প্রদীপ, দরজাজানলা-আঁটা ঘরের মধ্যে দম আমার বন্ধ হয়ে আসে।'

'তাহলে চলো, হাঁটতে হাঁটতে আমার তাঁবুতে যাই। সেখান থেকে একটা বোতল নিয়ে এসে ফাঁকা কোথাও একটু বসা যাবে।'

'তাই চলো।'

'তুমি এখানে একটু দাঁড়াও এলিজাবেথ, আমি একখুনি আসছি।'

কুচকাওয়াজের বড় মাঠটা গ্রেবার দ্রুত পায়ে পেরিয়ে এলো। তাঁবুর ভেতরে টেবিলের ওপর ঢাকনা দেওয়া একটা বাতি জ্বলছে। খেলুড়েরা তখনও তাস পিটছে। রয়টার আলোর নিচে বই পড়ছেন।

গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যোটশার কোথায়?'

রয়টার বই থেকে মুখ তুললেন, 'অভাগাদের কপাল চিরদিনই পোড়া··· সকালে দেওয়ালে ধাক্কা লাগিয়ে সাইকেলটা ভেঙেছে। এখন পায়ে হেঁটে হেঁটেই কোন চুলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। ও তোমাকে জানাতে বলেছে নতুন কোন খবর নেই।'

গ্রেবার বিছানার তলা থেকে ওর ঝোলাটা টেনে বার করলো। জেনেভা

আর কনিয়াকের বোতলদুটো পেলো। বিনডিংয়ের দেওয়া আরমায়নাকের অর্ধেকটা তখনও রয়েছে।

রয়টার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে?'

'না ব্যস্ত নয়। এমনি একটু বেরুবো। কিন্তু ভদকার বোতলটা পাচ্ছি না তো?'

'এরকম চাঁদনি রাতে কনিয়াক কিংবা আরমায়নাকই জমবে সবচেয়ে ভালো।'

'তা নয় বুঝলাম। কিন্তু ভদকার...'

'ওটা আর নেই।'

'মানে?'

'মানে সাবাড় করে দিয়েছি। অনেক আগেই তোমার উচিত ছিলো ওটা আমাদের ভাগ করে দেওয়া। রাশিয়া থেকে ফিরে কেউ পুঁজিবাদীর মতো ব্যবহার করবে, এ তো আর সহ্য করা যায় না। তবে যাই বলো ভায়া, ওখানকার ভদকার স্বাদই আলাদা।'

'বহুত আচ্ছা!' আরমায়নাকের বোতল আর কাগজের গ্লাস দুটো পকেটে পুরে, জেনেভার বোতলটা ও রয়টারের দিকে এগিয়ে দিলো। 'নির্ন, খাঁটি হল্যাণ্ডের। দেখবেন, এবার যেন নিজেই পুঁজিবাদীর মতন ব্যবহার করবেন না, অন্যদেরও একটু করে দেবেন।'

কে যেন বললো, 'এদিকে একটু ছাড়ো মাইরি!'

'দেবো দেবো।' রয়টার চট করে বালিসের তলা হাতড়ে একটা ছিপি খোলার স্ক্রু বার করে গ্রেবারের হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর মিটমিট করে হাসলেন। 'নাঃ, তুমি যখন ঠিকই করেছো আজ রাতে কোন মেয়ের সতীত্বহানি না করে ছাড়বে না, তখন এটা কাছে রেখে দেওয়াই ভালো। অনেকে উত্তেজনার মুহূর্তে বোতলের মুখ ভাঙতে গিয়ে কেটেকুটে একশা করে বসে।'

গ্রেবার হাসলো। 'লাগবে না, বোতলটা খোলাই আছে।'

ফেল্ডমান এবার বিছানায় সোজা হয়ে বসলো। 'তোমার যদি টাকা পয়সা কিছু লাগে তো নিতে পারো। চব্বিশ ঘণ্টা শুয়েবসেই কাটাই, আমার এসব কোন কাজেই লাগবে না।'

'ধন্যবাদ। আপাতত কিছু লাগবে না।' ঢকঢক করে খানিকটা আরমায়নাক গলায় ঢেলে দিয়ে গ্রেবার আবার বোতলটা পকেটে চালান করে দিলো। ফেল্ডমান এই ফাঁকে এক প্যাকেট সিগারেট ওর পকেটে গুঁজে

দেয়। গ্রেবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো। রয়টার হাত নেড়ে ইশারা করলেন, 'এমন চাঁদনি রাতটা মাটি কোরো না, গ্রেবার। জেনো, যুদ্ধের চেয়ে তোমার ছুটির দিন অল্প। যাও···আর মনে রেখো, তোমাদের মতো বীর সৈনিকের পক্ষে বাঁচার চেয়ে মরা অনেক সহজ। তাই দুর্লভ যৌবনের একটি কণাও কেউ কোথাও হারাক, এ আমি চাই না!'

গ্রেবার স্তব্ধ বিস্ময়ে রয়টারের মুখের দিকে তাকালো। রয়টার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। 'যাও যাও, আর দেরি ক'রো না।'

যাওয়ার সময় গ্রেবার তাসের টেবিলে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো রুমেল তখনও জিতছে। কোলের কাছে এক কাঁড়ি টাকা, অথচ ওর সারা মুখে অভিব্যক্তির কোন চিহ্ন নেই। কপালের ভাঁজে শুধু জমে উঠেছে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম।

ওরা দুজনে উঁচু পাহাড়ী টিলায় বাদাম গাছে ঘেরা একটা বেঞ্চিতে এসে বসলো। এখান থেকে পুরনো শহরটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। কোথাও কোন আলো নেই। নিচে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে নদীর জল।

গ্রেবার আরমায়নাকের বোতল খুলে গ্লাসদুটো ভর্তি করলো। চাঁদের আলোয় টলটল করে উঠলো তরল অম্বর।

'নাও।'

এলিজাবেথ ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিলো! 'রাতটা ভারি সুন্দর, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর রিক্ত জীবনে শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা, আমরা এখনও বেঁচে আছি।' গ্রেবার নিজের গ্লাসটা তুলে নিলো। 'তাই যতটা প্রাণ চায় পান করো, এলিজাবেথ···অন্তত নিজেদের দুঃখ যতটুকু ভোলা যায়।'

এক চুমুকে সবটা শেষ করে গ্রেবার আবার ভর্তি করলো, গ্লাসটা রাখলো দুজনের মাঝখানে। বেঞ্চিতে পা গুটিয়ে এলিজাবেথ মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়েছে। ওর মসৃণ সারা মুখে জ্যোৎস্না যেন পিছলে যাচ্ছে। মাথার ওপরে গুচ্ছ গুচ্ছ বাদামের ফুল মনে হচ্ছে যেন ডানামেলা এক ঝাঁক সাদা প্রজাপতি। গ্রেবার গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো। সেই মুহূর্তে অনুভব করলো একটা উষ্ণতা আর তখনই ওর মনে হলো বুকের ভেতরটা কি আশ্চর্য ফাঁকা। ও ঠিক জানতো না ভাষাহীন এই নিঃশব্দ যন্ত্রণা। এই বিরাট শূন্যতা এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলো। এলিজাবেথ দীর্ঘশ্বাস

ফেললো। 'জীবনে এ দুঃখ কোনদিন ভোলবার নয়, এর্নস্ট। নদীর ওপারে তাকিয়ে গ্যাখো কি ভীষণ অন্ধকার!'

'ওদিকে তাকিও না, এলিজাবেথ। কোনদিকেই তাকিও না।'

ছোট্ট পাহাড়ী টিলার ওপর থেকে নদীর ওপারটাও স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রমশ ঢালু হতে হতে মাঠের গায়ে মিশে গেছে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সরু সরু মেঠো পথ, পপলার ঘেরা পুরনো গ্রাম আর গির্জা। তার ওপারে দিগন্তের গায়ে কালো কালো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে অরণ্য আর সারি সারি পর্বতমালা। জ্যোৎস্নার বৃত্তের বাইরে অন্ধকার। চারদিকেই গাঢ় অন্ধকার।

গ্রেবার এলিজাবেথের গ্লাসটা ভর্তি করে দিলো। তারপর ম্লান স্বরে বললো, 'এখানটা শান্ত সমাহিত, এর চাইতে বেশি কিছু আর চাই না।'

'যদি কোন কিছু না ভাবা যায় তবেই সেটা সম্ভব, এর্নস্ট। আর আগে নয়।'

'হ্যাঁ, মুস্কিলটা তো এখানেই। আমরা সব কিছু ভাবতে চাই, জানতে চাই, বুঝতে চাই, ডালিমের দানার মতন ফাটিয়ে ফাটিয়ে দেখতে চাই। জীবনের ধর্মই তাই, উৎস থেকে সে সঞ্চয় করতে চায় তার অভিজ্ঞতা। তাই বিপদে সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনকে সে টেনে তুলতে চায়।'

এলিজাবেথ ম্লান হাসলো। 'অথচ আমাদের হাত-পা বাঁধা, আমরা কিছুই করতে পারি না।'

'না, ঠিক তা নয়।' গ্রেবার কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'অন্তত এই মুহূর্তে আমরা চুপ করে থাকতে পারি। চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করতে পারি রাত্রির এই উতল নির্জনতা।'

'বেশ, আমরা আর কোন কথা বলবো না।' এলিজাবেথ বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

দুজনে অনেক অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। রাত্রির নৈঃশব্দ্য গাঢ় থেকে আরও গাঢ়তর হয়ে উঠলো। অরণ্যের ওপার থেকে ভেসে এলো ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস, পেঁচার ডাক আর পাতার মর্মর। মেঘছেঁড়া আকাশে সমানে চললো আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা। নৈঃশব্দ্য এমনই গাঢ়তর হয়ে উঠলো, যেন প্রতিধ্বনিত হলো ওদের স্পন্দন, তারপর সে স্পন্দনও বাতাসে হারিয়ে গেলো আর ওরা দুজন যেন নিঃশব্দে পাড়ি দিয়ে চললো শত্রু-সীমান্ত থেকে সুদূর কোন ঘুমের দেশে।

'এই, কি ভাবছো?'

'উঁ! কই, কিছু না তো!' এলিজাবেথ চোখ নামালো। জ্যোৎস্নায় ঝিক-মিক করে উঠলো ওর স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বহুদিন এমন শান্তিতে আর ঘুমোইনি।' এলিজাবেথ হাই তুললো। 'অন্ধকারের ভয়ে সারারাত আলো জ্বেলে ঘুমিয়েছি, ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চিৎকার করে জেগে উঠেছি।'

গ্রেবার নির্নিমেষ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলো। ঘুম তো দূরের কথা, মুহূর্তের জন্যে দুচোখের পাতা এক করতেও পারেনি। বরং সারাক্ষণ আকাশপাতাল কেবল ভেবেই গেছে। তবু ওর মনে হলো জীবনে এই প্রথম যেন নিটোল একটা প্রশান্তি উপভোগ করলো। অথচ কেন, তা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারলো না।

'অনেক রাত হয়ে গ্যাছে। চলো এবার ওঠা যাক।'

শহরের মধ্যে দিয়ে ওরা এগিয়ে চললো। আবার যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো আদিম অন্ধকার, আর নেভানো চিতার মতো হিমেল বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো ওদের হাড়। ওদের সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো সারি সারি বন্ধ দরজা জানলার শোক-মিছিল। এলিজাবেথ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'অথচ একদিন এই শহরের প্রতিটা ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট ছিলো আলোর মালায় সাজানো, আর আজ দেখলে মনে হয় যেন জীবনে সব খুইয়ে বসে আছে!'

গ্রেবার মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলো। নির্মল স্বচ্ছ আকাশ। বোমারু বিমানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত রাত। 'ইউরোপের সব জায়গায় এই একই অবস্থা। ব্যতিক্রম শুধু সুইজারল্যাণ্ড। ওখানে এখনও রাত্রে আলো জ্বলে, যাতে বিমান থেকে বুঝতে পারা যায় ওটা নিরপেক্ষ দেশ। রাত্রে বিমান থেকে দেখলে সুইজারল্যাণ্ডকে মনে হবে ঠিক যেন আলোর ছোট্ট একটা দ্বীপ, আর তার চারদিকে জার্মানি ফ্রান্স ইতালি স্পেন বলকান আফ্রিকা জুড়ে অন্ধকার মৃত্যুর অথৈ সমুদ্র।'

'আলো সৃষ্টি করেছি আমরা, অথচ সেই আমরাই এখন ফিরে যাচ্ছি আদিম গুহা-মানবের যুগে।'

'হ্যাঁ, আজ আমরা অন্ধ পশু ছাড়া আর কিছুই নই!' গ্রেবার অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। দেখলো এলিজাবেথ কাঁদছে।

'না না, অমন করে আমার দিকে তাকিও না।'

'কেঁদো না এলিজাবেথ, লক্ষ্মীটি শোন···ছাখো, আমার দিকে তাকিয়ে ছাখো,' গ্রেবার দুহাতের স্তব্ধ করপুটে ওর মুখটা তুলে ধরলো নিজের মুখের কাছে। 'তোমার মতো আমারও তো কষ্ট হচ্ছে, তবু আমি কি কাঁদছি, বলো?'

এলিজাবেথ চোখ মুছলো। 'আমার আরও একটু বেশি পান করা উচিত ছিলো।'

'কাল এরকম আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো না। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমরা অন্য কোথাও যাবো, যেখানে অনেক আলো ঝলমল করবে আর আমরা দুজন একসঙ্গে বসে পান করবো। সেসব খোঁজার দায়িত্ব আমার, তুমি কিছু ভেবো না।'

'তোমার কোন উচ্ছল সঙ্গিনী পাওয়া উচিত ছিলো, এর্নস্ট।'

'উচ্ছল কেন, কোন সঙ্গিনীরই আমার আর দরকার নেই এলিজাবেথ।' গ্রেবার ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'আমি যেন আজকাল আর কাউকে ঠিক সহ্য করতে পারছি না, তুমি বিশ্বাস করো।'

'এমন কি আমাকেও না ?'

'না, তোমার কথা আলাদা। আমাদের দুজনের মধ্যে ছলনা করার মতো এখন আর কিছুই গোপন নেই।'

'সত্যি কি তাই ?'

'সত্যিই তাই, এলিজাবেথ।' গ্রেবার আলতো করে স্পর্শ করলো ওর ঠোঁট দুটো নিজের ঠোঁটে, রুক্ষ চিবুকে। আঙুলে অনুভব করলো ওর হালকা চুলের কোমল স্নিগ্ধতা। 'কাল আমরা যাবো সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোকিত কোন রেস্তোরাঁয়। দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করবো আর মদ খাবো। সন্ধ্যেটুকুর জন্যে ভুলে যাবো আমাদের রিক্ত অস্তিত্ব। তুমি যাবে তো ?'

'যাবো, এর্নস্ট। তুমি ঠিক আটটায় এসো।'

স্পষ্ট কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলিজাবেথ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো।

গ্রেবার অল্পক্ষণ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ফিরে চললো। পকেট থেকে বার করলো আরমায়নাকের বোতলটা। জ্যোৎস্নায় মেলে ধরলো। ছিটেফোঁটাও আর তলানিতে পড়ে নেই। টান মেরে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো পাশের ভগ্নস্তূপে। মনে মনে ভাবলো, ছুটির আর একটা দিন আমার শেষ হলো।

বারো

…'আরে বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো নিজে মুখেই স্বীকার করছি' ব্যোটশার চটে উঠলো। 'সেদিন রাত্তিরে দোকানওয়ালীকে নিয়েই শুয়েছিলাম। কি করবো বলো, ওছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না। কাউকে না কাউকে তো চাই। তা না হলে ছুটিতে আসার কোন অর্থই হয় না। তোমরা যাই বলো, ধর্মের ষাঁড় হয়ে আমি সীমান্তে ফিরে যেতে রাজি নই।'

'তাবলে জলহস্তিনীর মতো একটা আধবুড়ী—ও তো তোমাকে ইচ্ছে করলে গিলে ফেলতে পারতো।'

'না, পারতো না।' ব্যোটশার চিৎকার করে উঠলো। ও বসে ছিলো ফেল্ডমানের বিছানায়। হাতে এক মগ কফি। একটা পায়ের পাতা ঠাণ্ডা জলে ডোবানো। সাইকেল দুর্ঘটার পরে ওর ডান পায়ের পাতাটা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিলো। গ্রেবারকে ও জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার খবর কী? আজ সকালে কোথাও বেরিয়েছিলে নাকি?'

'না।'

'না মানে?'

'না মানে, না।' ওর হয়ে ফেল্ডমানই উত্তর দিলো। 'যাবে কি করে? সারা রাত জেগে এই দুপুর পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোলো। টেনে তোলাই দায়। তুমি তো আর জানো না, কাল প্রথম ও সাচ্চা মরদের পরিচয় দিয়েছে।'

'ওসব বাজে কথা ছাড়ো।' ব্যোটশার জল থেকে পাটা ওপরে তুললো, তারপর আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখলো। 'এই ভাঙা পা নিয়েই আমি সারা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছি। একখুনি আবার বেরিয়ে পড়বো…'

'ও তো আর তোমার মতন অমন পাগল নয়। তাছাড়া…' ফেল্ডমান মুচকি মুচকি হাসলো। 'দোকানওয়ালীকে যখন পেয়েই গ্যাছো, তখন আর নতুন করে খোঁজার দরকার কি?'

'ওঃ, আবার দোকানওয়ালী! ওকে আমি খুঁজতে চাইনি, বরং বলতে পারো ও আমাকে হতাশই করেছে।'

'সীমান্ত থেকে ফিরে আসার পর প্রথম প্রথম সবাই ওরকম হতাশ হয়, তারপর সব ঠিক হয়ে যায়।'

'তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না। একটা বিচ্ছিরি ভুল বোঝাবুঝির জন্যে ওখানে আমার আর যেতেই ইচ্ছে করছে না। এমনিতে ও খুব ভালো। কিন্তু···ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। দুজনে তখন বিছানায় শুয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর কোথায় আছি, কি বৃত্তান্ত, শালার সব ভুলে গেছি। কোন জ্ঞান নেই। হঠাৎ ওকে আলমা বলে ডেকে ফেললুম। অথচ আলমা ওর নাম নয়, ওর নাম লুইজ। আলমা আমার বউয়ের নাম···'

'তারপর ?'

'সে এক বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার !'

'ঠিক হয়েছে, যেমন কুটকুটুনি', খেলুড়েদের টেবিল থেকে কে যেন ব্যঙ্গ করলো। 'তোমার মতো ব্যভিচারীর উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। ধরে নিচ্ছি ও তোমাকে নিশ্চয়ই খাট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো ?'

'ব্যভিচারী !' ডিমের মতো লম্বা-মাথা খেলুড়ের দিকে ব্যোটশার চোখ কটমট করে তাকালো। 'ব্যভিচারের প্রশ্ন এখানে আসছে কি করে ?'

'তোমার ব্যবহারে।'

'মুখ্যু, এটাকে ব্যভিচার বলে না। আমার বউ যদি এখানে থাকতো আর আমি যদি অন্য কাউকে নিয়ে শুতাম, তাহলে না হয় তুমি তাকে ব্যভিচার বলতে পারতে। কিন্তু ও এখানে নেই। ও এখানে থাকলে দোকানওয়ালীকে নিয়ে শোয়ার কোন প্রশ্নই আসতো না।'

'আরে, ধ্যাৎ। ছাড়ো, ওই বিটলে বামনটার কথা।' ফেল্ডমান জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তো ওকে লুইজ বলে ডাকলে, তারপর কি হলো ?'

'লুইজ ? না না, লুইজ তো ওই দোকানওয়ালীরই নাম। আমি ওকে আলমা বলে ডাকলুম।

'হ্যাঁ, আলমা বলে ডাকলে। তারপর ?'

ব্যোটশার চোখ মিটমিট করে হাসলো। 'সে তুমি ভাবতেই পারবে না। অন্য কেউ হলে হাসতো কিংবা রেগে লাল হয়ে উঠতো। ও কিন্তু সেসব কিছু করলো না, হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো। ভাবো একবার, ওরকম জয়ঢাকের মতন চেহারা, তার ওপর যদি···'

ডিমের মতো লম্বা-মাথা আবার দুম করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আলমা হলে হাসতো, যদি ওকে লুইজ বলে ডাকতে ?'

'আমার আলমা হলে—' ব্যোটশারের কণ্ঠস্বর এখন মনে হলো দূর থেকে আসা স্বপ্নাচ্ছন্ন কোন মানুষের মতো। 'প্রথমেই হাতের কাছে যে বিয়ারের বোতলটোতল পেতো, তাই নিয়ে ছুটে আসতো। তারপর জানলা-

সব বন্ধ করে দিতো। আর আমার তখন মনে হতো সমস্ত ঘর যেন দুলছে।'

লম্বা-মাথা মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'ওই রকম একজন মহিলাকে তুমি ঠকাচ্ছো ?'

হঠাৎ ব্যোটশার জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'না, ঠকাচ্ছি না। আর ঠকাতে চাই না বলেই এই ভাঙা পা নিয়ে ওকে এখন খুঁজতে বেরুচ্ছি।'

ফেল্ডমান এবার গ্রেবারকে নিয়ে পড়লো। 'আর তুমি ? কাল সারা রাত আরমায়নাকের বোতলটা নিয়ে কি করলে, শুনি ?'

'কিছু না।'

'ত্যাখো, পিয়াজি মারার চেষ্টা ক'রো না।' ফেল্ডমান আবার তার বিছানায় ব্যোটশারের জায়গাটা দখল করে বসলো। 'কিছু করলে না বলেই বুঝি সারা দুপুর মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমোলে ?'

'বিশ্বাস করো, আজ আমার কেন যে এত ক্লান্ত লাগছে আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। খালি ঘুম পাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কতকাল ঘুমোইনি।'

'তবে আর কি, আর খানিকটা ঘুমিয়ে নাও।'

'সবাই তো আর তোমার মতন নয়,' লম্বা-মাথা ফোড়ন কাটলো। 'তুমি তো সারা ছুটিটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে। তারপর যখন সীমান্তে ফিরে যাবে, তখন আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ছুটির স্বপ্ন দেখবে।'

'তোমার মোটা বুদ্ধি তাই বলছে বুঝি ? আমার ধারণা কিন্তু ঠিক তার উল্টো। আমি যখন এখানে ঘুমোই, আমি তখন সীমান্তে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখি।'

'আসলে তুমি এখন কোথায় ?' রয়টার জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন ? এখানে।'

'তাই কি ?'

'কেন ?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'আসল কথা কি জানেন,' ফেল্ডমান আবার টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। 'পাছে আমার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল খুঁজে না পাই, তাই জাগতে আমার ভয় করে।'

রয়টার এবার গ্রেবারের দিকে ফিরলেন। 'আজ রাতে এই অবিস্মরণীয় আত্মাটাকে নিয়ে কি করবে, কিছু ঠিক করেছো?'

'বেশ ভালো খাবার পাওয়া যাবে এমন কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?'

'একা?'

'না।'

'তাহলে জার্মানিয়াতে যাও। একমাত্র জায়গা। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে, সৈনিকের এই পোশাকে ওরা তোমাকে ঢুকতে দেবে না। রেস্তোরাঁটা শুধু অফিসারদের জন্যে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো, পরিচারককে যদি হাত করা যায়।'

গ্রেবার নিজের দিকে তাকালো। ওর পোশাকটা সত্যিই ভীষণ নোংরা হয়ে গেছে। 'আপনার গলাবন্ধ কোটটা আমাকে দু-এক দিনের জন্যে ধার দিতে পারেন না?'

'স্বচ্ছন্দে। শুধু কোট কেন, কোট প্যান্ট দুটোই তুমি নিয়ে যাও। তোমার যা স্বাস্থ্য, কারুর বাবার ক্ষমতা নেই ধরে। এই রকম স্বাস্থ্য আর যোগ্যতায় তুমি অনেক আগেই লেফটেনান্ট হতে পারতে।'

'অনেকদিন আগে আমি একবার করপোরাল হয়েছিলাম। এক ব্যাটা বদমাস্ লেফটেনান্টকে ধরে প্যাঁদাবার পর ওই সম্মানটা আমার খোয়া যায়। বরাত জোরে শাস্তি-শিবিরে যেতে হয়নি, কিন্তু তারপর থেকে আমার আর পদোন্নতিও হয়নি।'

'সাব্বাশ, মেরা শেরকা বাচ্ছা।' রয়টার জোরসে এক থাবা বসালেন গ্রেবারের কাঁধে। 'কিচ্ছু ঘাবড়িও না ভায়া, করপোরালের পোশাক পরার নৈতিক অধিকার তোমার আছে। যদি কোন মহিলাকে নিয়ে জার্মানিয়াতে যাও, তাহলে প্রধান পরিচারককে বলবে জি. এইচ ফন মুমের ভাঁড়ার থেকে ইয়োহানিস্‌বের্গের ককস্‌বের্গ উনিশশো সাঁইত্রিশ দিতে। এ মদ খেলে মরা মানুষও বেঁচে ওঠে।'

গ্রেবার উঠে দাঁড়ালো। 'বাঃ, ঠিক এই জিনিসটাই আমি খুঁজছিলাম!'

গ্রেবার অনেকক্ষণ কাঠের সেতুটার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। নদীর জল এখন এসে ঠেকেছে তলানিতে। পাথরে ধাক্কা খেয়ে সামান্য কুলকুল শব্দ হচ্ছে। দূরে অরণ্য রেখার প্রান্ত ঘিরে এবার অল্প অল্প কুয়াশা জমেছে। বেলাশেষের সূর্য আগেই ডুবে গেছে ওদের স্কুল বাড়ির পেছনে। দোতলার

সারি সারি দরজা জানলাগুলো সব বন্ধ। লোহার বড় ছুটো ফটকের একটা একপাশে হেলে পড়েছে। গ্রেবার পায়ে পায়ে ফটক পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। লোনা-ধরা প্রাচীরের গা থেকে মাঝে মাঝে পলাস্তারা খসে গেছে। ফুটবল খেলার মাঠটা নির্জন। বাঁদিকে বড় বড় কয়েকটা বাদাম গাছ। তার নিচে বেঞ্চি পাতা। গ্রেবারের মনে পড়লো এখানে বসে বসে একদিন ও কত স্বপ্ন দেখেছে, যার একটিও আজ পর্যন্ত সত্যি হলো না। এখান থেকেই তাকে চলে যেতে হয়েছিলো যুদ্ধে।

গ্রেবার দেখলো সামনের বড় দরজাটা সামান্য একটু খোলা। প্রথমে ও ইতস্তত করলো, তারপর কপাট ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো। ভেতরটা খাঁখাঁ করছে। হল ঘরে এসে ও থমকে দাঁড়ালো। আধো-অন্ধকারে নাকে এলো পরিচিত একটা ভ্যাপসা গন্ধ। আর ঠিক তখনই ওর মনে পড়লো, পোলমানের কথা। উনি বলতেন, 'যা সত্যি তাকে জানতে হবে, যা কঠিন তাকে গ্রহণ করতে হবে।' হ্যাঁ, এই বাস্তব অভিজ্ঞতাটুকু ও আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলো। কিন্তু সে সময়ে আর কি কি যেন লিখেছিলো, এখন আর কিছু মনে করতে পারলো না।

ফিরে আসার সময় ফটকের কাছে বুড়ো দরোয়ানের সঙ্গে দেখা হলো। গ্রেবার ওকে চিনতে পারলো। এখন যেন আরও বুড়িয়ে গেছে। মাথার চুল সব ধবধবে সাদা।

বুড়ো জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি কিছু খুঁজছেন?'

'না।'

গ্রেবার এগিয়ে যাচ্ছিলো। কি ভেবে আবার ফিরে এলো, 'তুমি জানো, পোলমান কোথায় থাকেন? হের পোলমান, এই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।'

'উনি এখন আর এখানে শিক্ষকতা করেন না।'

'তা জানি। কিন্তু কোথায় থাকেন বলতে পারো?'

দরোয়ান সতর্ক দৃষ্টিতে ইতিউতি তাকালো। গ্রেবার হেসে ফেললো। 'ভয় নেই, কেউ তোমার কথা শুনতে পাবে না। বলো।'

'আগে তো থাকতেন ছ নম্বর ইয়ানপ্লাটসে। এখনও আছেন কি না ঠিক বলতে পারবো না। আপনি কি এই স্কুলের ছাত্র নাকি?'

'হ্যাঁ, অন্তত এক সময়ে ছিলাম।'

মিনিট পনরো আনমনে হাঁটবার পরে গ্রেবার হঠাৎ আবিষ্কার করলো

ও পথ হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক এখন, এই মুহূর্তে ও কোথায় কিছু বুঝতে পারলো না। কুয়াশা এখন গাঢ় হয়ে উঠছে আর পথটা এসে মিশেছে একটা ভগ্নস্তূপে। চারদিকের দৃশ্য একই রকম এবং পথগুলো আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি! যেন ও পথ হারিয়ে ফেলেছে নিজেরই মনের গহন গভীরে।

হাকেনষ্ট্রাসে খুঁজে পেতে ওকে রীতিমত কসরত করতে হলো। দেখতে দেখতে কুয়াশা এখন বিশ্রীরকম চারদিক ছেয়ে ফেললো, যেন উত্তাল হয়ে উঠছে নিঃশব্দ উর্মিমালা। তার সঙ্গে বইছে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া।

আঠারো নম্বরে এসে ও নতুন কোন সংবাদ পেলো না। ফিরে যাবার সময় হঠাৎ অদ্ভুত একটা শব্দ শুনলো। শব্দ নয়, সুর। অনেকটা রবাব কিংবা বীণার ঝঙ্কারের মতো মিষ্টি একটা সুর—থেমে থেমে, এলোমেলো অথচ স্পষ্ট একটা সুরের অনুরণন অদৃশ্য বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রেবার কান পেতে শুনলো। কিন্তু অনুমান করতে পারলো না কোন দিক থেকে আসছে। ভাবলো এ নিশ্চয় সেই এয়ার রেড় ওয়ার্ডেনের কাজ, হয়তো পাগলের পাগলামি! পাশের বাড়িতে ছুটে এসে গ্রেবার এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেললো। চেয়ার থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠলো একটা ছায়ামূর্তি। গ্রেবার দেখলো এটা সেই হারানো সবুজ চেয়ারটা।

গুরুগম্ভীর স্বরে ওয়ার্ডেন জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাই?'

গ্রেবার দেখলো ওর হাতে কিছু নেই। অথচ বীণাঝঙ্কার এখন আরও স্পষ্ট অনুরণিত হচ্ছে। 'কি ব্যাপার, এটা কোত্থেকে আসছে?'

তার ঠেলে বেরিয়ে আসা জ্বলজ্বলে চোখদুটো ওয়ার্ডেন গ্রেবারের মুখের সামনে নিয়ে এলো। 'অঃ, আমাদের সী-মা-স্ত সৈনিক! পবিত্র পিতৃভূমির অতন্দ্র প্রহরী! কেন, তুমি কিছু বুঝতে পারছো না?'

'না!'

'মৃত আত্মার জন্যে সান্ত্বনা-সংগীত। সাহায্যের জন্যে ওরা যে দুহাত বাড়িয়ে কাঁদছে, বলছে—থামাও, থামাও এই হত্যালীলা! আমাদের খুঁড়ে বার করো···আমাদের বাঁচতে দাও!'

'থামো!'

গ্রেবার মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলো কুয়াশার মধ্যে দড়ির মতন কি যেন একটা দুলছে আর প্রতিবারে ফিরে আসার সময় রহস্যময় শব্দটা ধ্বনিত হচ্ছে। গ্রেবার এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, ঢাকনাবিহীন পিয়ানোর রিডে ইলেকট্রিকের ছেঁড়া তার লেগে এই শব্দ হচ্ছে।

'এটা তো পিয়ানো!'

ওয়ার্ডেন ফিসফিস করে বললো, 'উঁহু, শোকগাথা! শুনতে পাচ্ছো না, বাতাস বাজাচ্ছে।' একটু থেমে ও বাতাসে কান পাতলো। তারপর যেন বাস্তবে ফিরে এলো। 'তোমরা অসভ্য, বর্বর। কেবল রাইফেলই ছুড়তে জানো, মৃত্যুর কিছু বোঝো? কেউ কিচ্ছু বোঝে না। থ্যাঁতলানো পাখির মতো মৃত্যু এখন চারদিকে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। একদিন ও ঠিক জেগে উঠবে, তখন তোমাদের টুঁটি টিপে···হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···'

গ্রেবার ভয়ে দু পা পিছিয়ে এলো, তারপর একছুটে রাস্তায়। এখন ও আর ওয়ার্ডেনকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সমস্ত নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে ওর শিরা-উপশিরায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওর অট্টহাস্য, যেন গ্রেবারের পেছন পেছন ধাওয়া করে আসছে। গ্রেবার দু কান চেপে ছুটলো। থ্যাঁতলানো পাখির মতো মৃত্যু জীবনে ও অনেক দেখেছে। কিন্তু এমন তিক্ত অনুভূতি ও আর কোনদিন উপলব্ধি করেনি। সত্যি, জীবন কি অসহ্য আদিম!

কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেলো। যেন আগে থেকে কেউ ওপারে অপেক্ষা করেছিলো। 'ও, আপনি···'

ফ্রাউ লিজার একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁ।' মুহূর্তের জন্যে গ্রেবার যেন নিভে গেলো। ও আশা করেছিলো এলিজাবেথই দরজা খুলে দেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলো ভেতরের দরজা খুলে এলিজাবেথ বেরিয়ে আসছে। ফ্রাউ লিজার কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

এলিজাবেথ বললো, 'আমার একখুনি হয়ে যাবে এর্নস্ট, তুমি ভেতরে এসো, একটু ব'সো।'

এলিজাবেথ দরজা বন্ধ করে দিলো।

'এই তোমার সবচেয়ে ভালো পোশাক?' গতকালের সেই গলাবন্ধ কালো সোয়েটার আর আঁটসাঁট কালো ঘাগরা দেখে গ্রেবারের মন খারাপ হয়ে গেলো। 'আজ রাত্তিরের কথা তুমি একদম ভুলে গেলে?'

'তুমি সত্যি সত্যি বলেছিলে বুঝি?'

'তা নয় তো কি? আমার দিকে তাকিয়ে ছাখো। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে এই করপোরালের পোশাকটা ধার করে এনেছি। অবশ্য লেফটেনান্টের চেয়ে নিম্নপদস্থ কাউকে হোটেল জার্মানিয়ায় ঢুকতে দেবে

কিনা জানি না। সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। তোমার এর চেয়ে আর কোন ভালো পোশাক নেই ?'

'আছে। কিন্তু···'

গ্রেবার দেখলো বিনডিং-এর দেওয়া ভদকার বোতলটা ঠিক তেমনি ভাবে রয়েছে ড্রেসিং টেবিলের ওপর। 'আমি জানি তুমি কি ভাবছো।' গ্রেবার ভদকার বোতলটা তুলে নিলো। 'ভুলে যাও ওসব কথা। তুমি তো আর কারুর কোন ক্ষতি করছো না। তোমাকে কোথাও যেতে হবে এইটেই বড় কথা, নইলে এখানে পাগল হয়ে যাবে। নাও, তার আগে এটার সদ্ব্যবহার করো।' ভর্তি গ্লাসটা ও এলিজাবেথের সামনে তুলে ধরলো।

'ধন্যবাদ, এর্নস্ট। আমি একখুনি পোশাকটা পালটে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি কোথায় বসবে বলো তো ? কিছু মনে ক'রো না, এর্নস্ট···আমি চাই না ডাইনীটা জানুক আমি তোমার সামনে পোশাক পালটেছি।'

গ্রেবার ম্লান হাসলো। 'ও এখন বাইরে বেরুবে না। তাছাড়া আমাদের মতো সৈনিকদের ও একটু দেশপ্রেমের চোখেই ভাখে। তবু আমি সামনের রাস্তায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

বোতলটা নামিয়ে রেখে গ্রেবার নিচে নেমে এলো। কুয়াশা এখন অনেক পাতলা হয়ে গেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো হালকা হাওয়ায় ভাসছে। হঠাৎ ওর মাথার ওপরের জানলাটা খুলে গেলো আর আলোকিত জানলার কাঠামোয় এলিজাবেথের খালি কাঁধছটোকে সামনে ঝুঁকে আসতে দেখলো। ওর ছু হাতে ছটো বহির্বাস। একটা সুন্দর রেশমি সুতোয় কাজ করা গোলাপী রঙের, অন্যটার রঙ এত দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না। পোশাক ছটো বাতাসে নিশানের মতো পতপত করে উড়ছে। এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করলো, 'কোনটে ?'

গ্রেবার ইশারায় গোলাপী রঙের পোশাকটা দেখিয়ে দিলো। বুঝতে পেরে এলিজাবেথ জানলা বন্ধ করে দিলো। গ্রেবার চকিতে চারদিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। না, জানলার আলো কেউ দেখতে পায়নি। গ্রেবার ধীরে ধীরে রাস্তায় পায়চারি করলো। সারা দিনের ক্লান্তি, সন্ধ্যার তিক্ত অনুভূতি এখন যেন অদ্ভুত একটা কিছু পাবার নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে।

মনে মনে গ্রেবার যতটা আশা করেছিলো, এলিজাবেথ তার চেয়ে তাড়াতাড়িই নিচে নেমে এলো। গ্রেবার যেন প্রথমে ওকে চিনতেই পারলো না। সদর দরজার নিচে স্বল্প আলোয় ঝলমল করে উঠলো ওর ফুরফুরে

হালকা-গোলাপী রঙের ফ্রক। ওকে এখন আগের চেয়ে অনেক লম্বা, তন্বী আর অসামান্যা রূপসী দেখাচ্ছে। গ্রেবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলো—লম্বা আর নিচু-গলা পোশাকের জন্যেই ওকে এমন লাগছে। মুখটাও অন্য রকম মনে হচ্ছে। চুলগুলো টেনে বেঁধেছে পেছনের দিকে। চঞ্চল দুচোখে উপছে পড়ছে চাপা হাসি।

গ্রেবার এগিয়ে এলো, 'কি ব্যাপার, হাসছো যে?'

'ডাইনীটা এমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে দেখলো, হাসবো না?'

দুপাশের ভগ্নস্তূপের মাঝে গর্বিত রানীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে হোটেল জার্মানিয়া। দুপাশের চুন-বালি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়েছে, যাতে কেউ না ভাবতে পারে এর কাছাকাছি একদিন মৃত্যু হানা দিয়েছিলো।

দারোয়ান তীক্ষ্ণ চোখে গ্রেবারের পোশাক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। ওর মুখ খোলার আগেই গ্রেবার চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'বারটা কোন

'হলঘরের একেবারে শেষে ডানদিকে, স্যর। কোন অসুবিধে হলে হেড ওয়েটার ফ্রিটস্‌কে জিজ্ঞেস করবেন।'

লম্বা টানা হলঘরের একপাশ দিয়ে ওরা এগিয়ে চললো। একজন মেজর এবং দুজন ক্যাপ্টেনকে উলটো দিক থেকে আসতে দেখে গ্রেবার সৈনিকী কায়দায় অভিবাদন করলো। তারপর এলিজাবেথের দিকে ফিরে নিচু গলায় বললো, 'এটা আমাদের সামরিক নিয়ম।'

এলিজাবেথ ছোট্ট করে হাসলো। 'জানি। কিন্তু এখানে তো তোমাদের আফিসারের ছড়াছড়ি দেখছি।'

'হ্যাঁ। শুনেছি দোতলায় সামরিক দপ্তরের কয়েকটা অফিসও আছে।'

'আচ্ছা, ওরা যদি তোমাকে চিনতে পারে?'

'কি চিনতে পারবে? ঠিক করপোরালের মতো ব্যবহার করতে পারছি কিনা? তুমি তো আর জানো না, একসময়ে আমি কিছুদিনের জন্যে করপোরাল ছিলাম।'

ইয়া লম্বা-চওড়া তাগড়াই একজন লেফটেনেন্ট শুঁটকো মতো দেখতে একটি মেয়ের কোমর জড়িয়ে চলে গেলেন। ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না। এলিজাবেথ বললো, 'ধরো, ওরা তোমাকে চিনতে পারলো, তাহলে কি হবে?'

'মারাত্মক কিছু হবে না।'

'ওরা তোমাকে গুলি করে মারবে?'

গ্রেবার হাসলো। 'আমার তা মনে হয় না। আমাদের মতো সৈনিকদের সীমান্তে এখন অনেক কদর।'

'আর কি হতে পারে?'

'কিচ্ছু না। খুব বেশি হলে দিন পনরোর কারাবাস। তার মানেই দিন পনরোর জন্যে বিশ্রাম। এও একরকমের ছুটি।'

প্রধান পরিচারক ফ্রিটস্‌কে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। ও সামনেই ছিলো। গ্রেবার ওর হাতে দুটো নোট গুঁজে দিলো। চওড়া থামের আড়ালে নির্জন একটা কোণে ফ্রিটস্‌ ওদের যত্ন করে এনে বসালো। 'আমার মনে হয় এখানে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না।'

ফ্রিটস্‌ চলে গেলো।

চারদিকে একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকালো। এলিজাবেথ বসেছে ঠিক ওর মুখোমুখো উলটো দিকের একটা চেয়ারে। এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে গ্রেবার দুষ্টুমি করে হাসলো। 'আমার আবার এরকম একটা পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে।'

'মোটেই না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন এখানে রোজ আসো!'

সারসের মতো সরু গলা একজন বুড়ো পরিচারক খাবারের তালিকা নিয়ে এলো। গ্রেবার চোখ বুলিয়ে তালিকাটা আবার বুড়োর হাতে ফিরিয়ে দিলো। 'ছাখো, এতে নেই এমন কিছু আমাদের চাই! আছে?'

বুড়ো ফ্যালফ্যাল করে তাকালো। 'না স্যর, এ ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই।'

'বেশ, তাহলে এবারের জন্যে জি. এইচ. ফন মুমের ভাঁড়ার থেকে আমাদের জন্যে এক বোতল ইয়োহানিস্‌বের্গের ককস্‌বের্গ উনিশশো সাঁইত্রিশ এনে দাও। দেখো, আবার যেন খুব ঠাণ্ডা না হয়।'

বুড়ো পরিচারকের চোখদুটো উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে উঠলো। 'আচ্ছা, স্যর।' তারপর গ্রেবারের কানের কাছে একটু ঝুঁকে এলো। 'আমাদের হাতে এখনও কিছু বেলজিয়ান বাছুরের জিব আছে, একদম টাটকা। সুগন্ধি পুদিনার চাটনি আর স্যালাডের সঙ্গে···'

'চমৎকার! আর শোন, ককস্‌বের্গের জন্যে শুকনো ধরনের কিছু চাঁট আনবে।'

'সে আর বলতে হবে না, স্যর।' সম্ভ্রমে বুড়োর গলার স্বর প্রায় বুজে এলো। 'যদি বলেন তো ষ্ট্রাসবুর্গ বুনো হাঁসের দুটো রোস্ট···এ রান্নায় আমাদের যথেষ্ট সুনাম আছে···'

'আমি জানি। এর সঙ্গে একটু ডাচ্ পনির থাকলে দারুণ জমবে। বিশেষ করে ককস্‌বের্গের স্বাদই তখন মনে হবে আলাদা।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, স্যর।'

বুড়ো চলে গেলো। ওর ভাব দেখে মনে হলো—প্রথমে ও গ্রেবারকে ভেবেছিলো সাধারণ কোন সৈনিক, ভুল করে হোটেল জার্মানিয়ায় ঢুকে পড়েছে আর এখন ও ভাবলো উঁচু দরের কোন অফিসার, ভুল করে সাধারণ পোশাক পরে এসেছেন।

এলিজাবেথ এতক্ষণ চোখ বড় বড় করে সব শুনছিলো। ওর অবস্থা বুড়োর চেয়ে কম কাহিল নয়। 'এর্নস্ট, তুমি এতসব কি করে জানলে ?'

'আমার বন্ধু রয়টারের কাছ থেকে। আজ সকালেও আমি জানতাম না। উনি সব শিখিয়ে দিলেন। ভারি চমৎকার মানুষ, সে তুমি না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না।'

এলিজাবেথ খিলখিল করে হাসলো, মনে হলো একঝলক উষ্ণ বাতাস যেন ঢেউ খেলে গেলো সারা ঘরে, 'ওঃ, তাই বলো ! আমি তা প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আর তোমাকে অবাক করতে পেরে আমি খুশি হলাম।' গ্রেবার ওর দিকে তাকালো। আজ ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। যখন হাসছে, মনে হচ্ছে ঘরের বন্ধ দরজা-জানলাগুলো যেন সব একসঙ্গে খুলে যাচ্ছে। গ্রেবার মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'এই পোশাকে তোমাকে কিন্তু আজ ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে !'

'ফ্রকটা আসলে মার। কাল রাত্তিরে আমি কেটেকুটে ঠিক করেছি।'

গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো, 'তুমি আবার সেলাই করতে জানো নাকি ? কই, দেখে তো মনে হয় না !'

'আগে জানতাম না। এখন আমাকে দৈনিক আট ঘণ্টা করে সৈনিকের পোশাক তৈরি করতে হয়।'

'তাই নাকি ? তার মানে বাধ্য-শ্রম ?'

'হ্যাঁ। আর আমি নিজেও তা চেয়েছিলাম, যাতে বাবামণির কোন ক্ষতি না হয়।'

'তোমার নামের সঙ্গে কিন্তু একাজ মানায় না। ও, হ্যাঁ···ভালো কথা,

একটা কৌতূহল কয়েকদিন থেকেই আমার মনের মধ্যে ঘুরঘুর করছিলো, জিজ্ঞেস করার ঠিক সুযোগ পাইনি।' আসলে গ্রেবার ও-প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে আসতে চাইলো। 'তোমার এলিজাবেথ নামটা কি করে হলো বলো তো ?'

'আমার মা ছিলেন দক্ষিণ অস্ট্রিয়ার মেয়ে, দেখতে ঠিক ইতালিয়ানদের মতো। ওঁর ধারণা ছিলো আমার চুল কটা আর চোখছুটো নীল হবে। তাই রাগ করে আমাকে এলিজাবেথ বলে ডাকতেন।'

সারস-গলা বুড়ো ঢাকা দেওয়া ট্রেতে খাবার নিয়ে এলো। পাতলা ছুটো গ্লাস আর বোতলটা এমন সন্তর্পণে নামিয়ে রাখলো যেন মহামূল্য কোন রত্ন-বিশেষ। খাবারগুলো ও টেবিলে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে গেলো। সুগন্ধি মশলার খশবু বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো।

এলিজাবেথ ছু চোখ কপালে তুললো। 'ওরে বাব্বাঃ, এ যে একেবারে রাজকীয় ব্যাপার দেখছি!'

'নিশ্চয়ই। ছুবছর ভালো মদ ছুঁইনি, টিনের খাবার ছাড়া ভালো কোন রান্না চোখেও দেখিনি। তুমি জানো না, আমার কাছে এ শুধু রাজকীয়ই নয় এলিজাবেথ, আমার কাছে এ হারানো শান্তি ফিরে পাওয়ার মতোই ছুর্লভ।'

এলিজাবেথ ওর প্রতিটা শব্দ মনে মনে ওজন করে দেখলো, তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। গ্রেবার নিঃশব্দে গ্লাস ছুটো ভর্তি করলো। নিঃশব্দে ছুজনে পান করলো। গ্রেবার ঠিক বুঝতে পারলো না, অদ্ভুত-একটা-কিছু-পাওয়ার এটা কোন অংশ কিনা। তবে এটুকু বুঝলো দীর্ঘদিন মৃত্যুর এত কাছাকাছি থাকার পরে মদিরার এই পেয়ালা শুধু মদিরাই নয়—এ যেন দূর থেকে ভেসে আসা কোন সুরমূর্ছনা, যেন অন্য কোন জীবনের প্রতীক, যে জীবন মৃত্যুহীন, হারানো রূপকথার মতো, যে জীবন জীবনেরই জন্যে প্রদীপ্ত আবিল।

'আমি যে বেঁচে আছি, এ কথা আমার আজকাল খুব কমই মনে পড়ে, এলিজাবেথ।'

এলিজাবেথ ম্লান হাসলো। 'আমার কিন্তু সব সময় মনে পড়ে। অথচ কারুর কোন কাজেই লাগলো না!'

সারস-বুড়ো ফিরে এলো। 'মদটা কেমন বুঝছেন, স্যর ?'

'ভালো, খুব ভালো। আরে ভাই, ভালো যদি নাই হবে, এতদিন পর হঠাৎ এর কথা মনে পড়বে কেন ?'

'শরতের সূর্যরশ্মিতে পাকানো, স্যর। দেখছেন কেমন রোশনাই, যেন ঠিকরে পড়ছে। রাইনল্যাণ্ডে এই মদকে সবাই বলে মৃতসঞ্জীবনী।'

'মৃতসঞ্জীবনীই বটে!' গ্রেবার ঠোঁট চেপে হাসলো। মনে মনে ভাবলো, দেখতে সারসের মতো হলে কি হবে, তুমি ব্যাটা বাস্তুঘুঘু!

'একেবারে খাঁটি সূর্যরশ্মিতে যে ছাঁকা, সেটা প্রথম গ্লাসেই বোঝা যায়, ঠিক কি না বলুন?'

'প্রথম গ্লাস মানে? প্রথম চুমুকেই বোঝা যায়। এ তো আর পেটে যায় না, সোজা আসে চোখের মণিতে। তারপর পৃথিবীর রঙ যায় বদলে।'

বুড়ো আহ্লাদে গদগদ। 'ঠিক ধরেছেন, স্যর।' ও ফিরে যাচ্ছিলো, আবার কি ভেবে পায়ে পায়ে গ্রেবারের পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর চুপি চুপি বললো, 'আপনাদের ওপাশের টেবিলে দুজন ট্রুপ লিডারও এই একই মদ নিয়েছেন। কিন্তু ওঁরা জলের মতন ঢকঢক ঢালছেন আর খাচ্ছেন।'

'তাই নাকি?'

'ওঁরা এর মদের মর্মই বোঝেন না।' হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বুড়ো চলে গেলো।

গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলো। 'কি, তোমার মৃতসঞ্জীবনী কি বলছে?'

এলিজাবেথ চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে কাঁধদুটো টানটান করে মেলে দিলো। 'সত্যি বলবো? আমার মনে হচ্ছে ঠিক যেন গারদ থেকে পালানো কোন বন্দীর মতো, যাকে একটু পরেই আবার গারদের মধ্যে আটকে রাখা হবে।'

গ্রেবার কিছু বললো না, গুম হয়ে বসে রইলো। মনে মনে ভাবলো, এ তিক্ত অনুভূতি জীবনে কোনদিন ভোলবার নয়। সচেতনভাবে একবার যখন জেনেছি, তাকে মন থেকে মুছে ফেলা অত সহজ নয়।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর এলিজাবেথের হঠাৎ-কণ্ঠস্বরে গ্রেবার চমকে উঠলো।

'এর্নস্ট!'

'উঁ?'

'কি ভাবছো?'

'ভাবছি সারাটা জীবনের তুলনায় এই সাতটা দিন কি তুচ্ছ, অথচ কি আশ্চর্য বৈচিত্র্যময়!'

বাড়ির সদর দরজার সামনে ওরা দাঁড়িয়ে ছিলো। বাতাস পড়ে গিয়ে আবার কুয়াশা গাঢ় হচ্ছে। এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করলো, 'কবে তোমাকে ফিরে যেতে হবে, এর্নস্ট ?'

'দিন পনরো পরে।'

'তাহলে তো খুব শিগগিরি!'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে অবশ্য তাই। আজ সন্ধ্যেটা আমার ছুটির প্রকৃত প্রথম দিন। এর জন্যে ধন্যবাদ জানাই বুড়ো পরিচারক, রয়টার, তোমার গোলাপী পোশাক আর ইয়াহানিস্‌বুর্গের ককস্‌বের্গকে।'

এলিজাবেথ কোন কথা বললো না। শুধু সমুদ্র-ঝিনুকের মতো বড় বড় চোখের পাতাদুটো মেলে দিলো গ্রেবারের দিকে। কুয়াশা জড়াচ্ছে ওর চূর্ণ কুন্তলে, সিক্ত আপেলের মতো ভিজে উঠছে সারা মুখ। হঠাৎ গ্রেবারের মনে হলো—এই নির্জনতা, এই মুক্তি, অপ্রত্যাশিত চাপা উত্তেজনা আর ভালবাসার মতো এই কোমল স্নিগ্ধতা ছেড়ে সান্ত্বনাবিহীন অন্ধকার তাঁবুতে ফিরে যেতে ওর মন সরছে না, বুকের ভেতরে যন্ত্রণার মতো কেমন যেন একটা কষ্ট হচ্ছে।

'কাল আমরা কোথায় যাবো ?'

'জার্মানিয়ায়।'

'আবার ?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। আমি চাই সীমান্তে ফিরে যাবার পরেও এই দিন-গুলোর কথা তোমার মনের মধ্যে গাঁথা থাক। তাই আমরা আর অন্য কোথাও যাবো না। কাল আটটায় এসে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। তুমি যাবে তো ?'

'যাবো, এর্নস্ট।'

গ্রেবার ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো। এলিজাবেথ প্রতিবাদ করলো না। গ্রেবার ঠোঁট রাখলো ওর নরম চুলে, চিবুকে, দু চোখের পাতায়। আর তখনই মনে হলো সব কিছু যেন ওর দুবাহুর মধ্যে গলে গলে ঝরে পড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে—স্মৃতি সত্তা, ওর ভবিষ্যৎ। গ্রেবারের ইচ্ছে হলো চুমোয় চুমোয় ওকে পাগল করে দিতে।

ফেরার পথে কি ভেবে গ্রেবার আবার আঠারো নম্বরে একবার থমকে দাঁড়ালো। কুয়াশা জড়ানো চাঁদের আলোয় দেখলো পাথর দুটো একটু

সরানো। একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ওর ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ছোঁ মেরে কাগজটা ও তুলে নিলো। টর্চ জেলে দেখলো মোটা পেনসিলে লেখা রয়েছে—সদর ডাকঘরে পনরো নম্বর জানলায় খোঁজ করো।

রগের পাশদুটো তখন ওর গরম হয়ে উঠেছে, কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে। কাল সকাল আটটার আগে নতুন কিছু আর জানার সম্ভাবনা নেই। ডাকঘরে কাজে লাগতে পারে ভেবে চিঠিটা ও সাবধানে মুড়ে পকেটে রাখলো। তারপর কবরের নিতল নিস্তব্ধতা মাড়িয়ে তাঁবুতে ফিরে এলো। এখন ওর নিজেকে সোলার মতো হালকা আর পালকের মতো ভারশূন্য মনে হচ্ছে।

তেরো

ডাকঘরের কিছুটা তখনও টিকে রয়েছে। বাকিটা মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে। চারদিকে অসম্ভব ভিড়। গ্রেবারকেও বেশ কিছুক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করতে হলো, তারপর এসে পৌঁছলো পনরো নম্বর জানলায়। চিঠিটা ও খোপের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দিলো।

কেরানিবাবু চিঠিটা ফিরিয়ে দিলেন। 'আপনার পরিচয়পত্রটা দেখি।'

গ্রেবার তার সামরিক পরিচয়পত্র আর ছুটির কাগজটা এগিয়ে দিলো। কেরানিবাবু পড়ে দেখলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে পেছনের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন। সামনে পড়ে থাকা ওর কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে গ্রেবার অপেক্ষা করে রইলো। বুক তখন ওর ঢিপঢিপ করছে। কেরানিবাবু ছোট একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে ফিরে এলেন। ঠিকানাটা ছুটির কাগজের সঙ্গে ভালো করে মিলিয়ে দেখলেন। তারপর মোড়কটা খুপরির মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দিলেন। 'এখানে সই করুন।'

গ্রেবার দেখলো মোড়কের গায়ে মার হাতের লেখা। উনি সীমান্তে পাঠিয়েছিলেন, সেখান থেকে ওটা আবার ফেরত এসেছে। প্রেরকের ঠিকানা আঠারো নম্বর হাকেনষ্ট্রাসে। সই করে গ্রেবার স্লিপটা ফিরিয়ে দিলো। 'এর সঙ্গে আর কিছু নেই?'

'মানে ?' কেরানিবাবু বাঁকা-চোখে তাকালেন। 'আপনার কি ধারণা আমরা লুকিয়ে রেখেছি ?'

'না, তা বলছি না। আমি ভেবেছিলাম ওঁর বর্তমান ঠিকানাটা আপনারা হয়তো বলতে পারবেন।'

'এখান থেকে আমরা কিছুই বলতে পারি না। দোতলায় চিঠিবিলি বিভাগে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

গ্রেবার ওপরে উঠে এলো। এখানেও অর্ধেক ছাদ নেই। মাথার ওপরে উন্মুক্ত আকাশ। জিজ্ঞেস করায় মহিলা কর্মচারীটি জানালেন, 'না, আমাদের কাছে নতুন কোন ঠিকানা নেই। থাকলে হাকেনষ্ট্রাসের ঠিকানায় পাঠাতাম না। আপনি বরং ওই অঞ্চলের ডাক হরকার কাছে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'ওঁকে কোথায় পাবো ?'

ভদ্রমহিলা ঘড়ি দেখলেন। 'না, এখন ও চিঠি বিলি করতে বেরিয়ে পড়েছে। বিকেল চারটে নাগাদ এলে এখানেই ওর দেখা পাবেন।'

'আপনার কি মনে হয় ওঁর কাছে নতুন ঠিকানাটা পাওয়া সম্ভব ?'

'আদৌ না। ওদের ঠিকানা দিই আমরাই। তবু লোকে আমাদের চেয়ে ওদেরই বিশ্বাস করে বেশি। আমরা আর কি করতে পারি বলুন ?'

'সত্যিই তো, আপনারা আর কি করবেন !'

গ্রেবার নিচে নেমে এলো। মোড়কের গায়ে তারিখটা দেখলো প্রায় তিন সপ্তা আগের। সীমান্তে পৌঁছতে সময় লেগেছে অনেক দিন, অথচ ফিরে এসেছে খুব তাড়াতাড়ি। এককোণে দাঁড়িয়ে ও মোড়কটা খুললো। ভেতরে শুকনো একটা কেক, একজোড়া পশমের মোজা, এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা চিঠি। চিঠিতে নতুন কোন খবর নেই—না ঠিকানা, না বিমান আক্রমণের কোন উল্লেখ। চিঠিটা পকেটে রেখে ও রাস্তায় নেমে এলো। ওর মনে হলো শিগগিরি নতুন কোন খবর পাবে, নইলে সমস্ত ব্যাপারটাই আরও করুণ হয়ে উঠবে। গ্রেবার ঠিক করলো বিনডিং-এর সঙ্গে দেখা করবে, হয়তো ও কোন খবর দিতে পারে।

'এসো এর্নস্ট, এসো। সেই কখন থেকে আমরা একটা বোতল খালি করার চেষ্টা করছি। তুমিও হাত লাগাও ভাই।'

বিনডিং একা নয়, উর্বশীর নিচের বড় সোফায় আর একজন এস এস

ঘাড় গুঁজে পড়ে রয়েছে। যেন ওপর থেকে পড়ে আর উঠতে পারছে না। রোগা চেহারা, পাণ্ডুর মুখ। এমন আশ্চর্য কটা চুল, হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে—না আছে অক্ষিপক্ষ্ম, না ভ্রূ।

'আমার বন্ধু, হাইনি।' একটু যেন সম্ভ্রম রেখেই বিনডিং পরিচয় করিয়ে দিলো, 'মেয়েদের বশ করতে ওস্তাদ। আর এই আমার বন্ধু এর্নস্ট। রাশিয়া থেকে সত্ত ছুটি পেয়ে এসেছে।'

'রাশিয়া!' হাইনি তখন রীতিমত মাতাল। পিঙ্গল চোখদুটো ও কোন রকমে মেলার চেষ্টা করলো। 'আমিও ওখানে ছিলাম। ভালো জায়গা··· এখানের চেয়ে ভালো···'

গ্রেবার সপ্রশ্ন চোখে বিনডিং-এর দিকে তাকালো। বিনডিং মুচকি মুচকি হাসলো। 'এক বোতলে ও আমার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বেচারির মন খুব খারাপ। বোমায় ওদের বাড়িটা একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিশে গ্যাছে। অবশ্য পরিবারে কারুর কোন ক্ষতি হয়নি, কিন্তু বাড়িটা গ্যাছে। ওর সবচেয়ে মন খারাপ হয়েছে পিয়ানোটার জন্যে।'

'ভালো পিয়ানো। খুব ভালো···' জড়ান গলায় হাইনি বিড়বিড় করে কি বললো স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

'এসো, এর্নস্ট। আমরা এতক্ষণ কনিয়াকের সদ্ব্যবহার করছিলাম, তুমি কি খাবে বলো? ভদকা, ক্যুমেল, না অন্য কিছু?'

'কিছু চাই না, আলফনস্। আমি শুধু কোন খবর আছে কিনা জানতে এসেছিলাম।'

'এখনও কোন খবর পাই নি, এর্নস্ট। আমার মনে হয় কাউকে কিছু না জানিয়ে ওঁরা শহর ছেড়ে চলে গেছেন। পরিবহনের সামান্য উন্নতি না হলে খবর পাওয়া মুস্কিল। মিছিমিছি মন খারাপ ক'রো না। এক গ্লাস অন্তত পান করো।'

'দাও। শুধু এক গ্লাস ভদকা।'

'ভদকায় বানচোৎদের চুবিয়ে, আগুন ধরিয়ে দাও।' হাইনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, দেখবে কেমন দাউ দাউ করে জ্বলছে। চমৎকার আবিষ্কার···'

গ্রেবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'কি বলছে ও?'

'কি জানি। একদিন এস ডি'তে ছিলো, অনেক কিছুই ওর মাথায় বেশ সুন্দর খ্যালে।'

'রাশিয়াতে যখন ছিলো, তখনও কি ও এস ডি?'

'হ্যাঁ। কি ব্যাপার, এর্নস্ট? ঢালো।'

গ্রেবার বোতলটা হাতে তুলে নিলো। টলটল করে উঠলো ভেতরের তরল পানীয়। দেখলো একশো কুড়ি প্রুফ। রীতিমত কড়া। এবং এক বোতলের নেশায় কারুর পক্ষে প্রলাপ বকা বিচিত্র নয়। গ্রেবার আড় চোখে হাইনের দিকে তাকালো। সিকিউরিটি সার্ভিসের এস এস-দের সম্পর্কে যেসব কাহিনী ও শুনেছে, তা কিছুটা অতিরেক হলেও অতিরঞ্জিত নয়। হাইনির মতো শয়তান এস ডি-রাই 'লেবেনস্‌রাউম' (বাঁচার মতন জায়গা) -এর অজুহাতে নানাভাবে জার্মান জনগণকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। যা-কিছু ওদের স্বার্থের পরিপন্থী—ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে, নিষ্ঠুর বর্বরের মতো অসংখ্য মানুষকে গোপনে হত্যা করেছে, নয়তো ঠেলে দিয়েছে কারাগারের অতল অন্ধকারে। বন্দীশিবির, গ্যাসচেম্বারের আবিষ্কার এদেরই মতো উর্বর মস্তিষ্কের ফসল।

'কি হলো, এর্নস্ট! বোতলের দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন? গ্যেটের মতন বলবো নাকি—মদের পেয়ালা সুধায় ভরাও।'

গ্রেবার বোতলটা সরিয়ে রাখলো। ইচ্ছে হলো উঠে চলে যেতে। কিন্তু গেলো না। জোর করেই বসে রইলো। কোনদিন ও নিজে থেকে এসব জানতে চায়নি, আর পাঁচজনেরই মতো সযত্নে এড়িয়ে গেছে। এখন থেকে ও সচেতনভাবে সবকিছু জানবে, হ্যাঁ, আজ ও আর পালাবে না।

'নাঃ, এটা তোমার মনে ধরছে না, বুঝতে পেরেছি।' বিনডিং উঠে গিয়ে দেরাজ হাঁটকালো।

গ্রেবার পায়ে পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। ও কি এখনও এস ডি'তে রয়েছে?'

'না। বন্দীশিবিরে বদলি হয়ে এসেছে।'

'বন্দীশিবিরে!'

'হ্যাঁ, ও এখন বন্দীশিবিরের একজন কম্যাণ্ডার।' বিনডিং কয়েকটা বোতল বেছে টেবিলের ওপর রাখলো। 'ছাখো এর্নস্ট, আমরা এখন আর স্কুল-পালানো ছাত্র নই। সবসময় ওরকম পালাই পালাই ক'রো না তো, একটু স্থির হয়ে ব'সো।'

গ্রেবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'না, আলফনস্‌, তুমি দেখো, এখন থেকে আমি আর পালাবো না।'

'বাঃ, এই তো শান্ত সুবোধ বালক!' বিনডিং হাঃ হাঃ করে হাসলো। হাইনির ঘুম বুঝি চটে গেলো। 'কি নেবে বলো?'

'ভদকা ছাড়া অন্য কিছু, ক্যুমেল কিংবা কনিয়াক।'

'ভদকা একদম খাবে না, কেউ না···' হাইনি এবার উঠে বসলো। বন্ধ চোখের পাতায় ও তখন ও ঢুলছে।

হাইনি বাথরুমে বমি করছে। বিনডিং আর গ্রেবার দাঁড়িয়ে রয়েছে বাগানের দিকের বারান্দায়। আকাশে একরাশ পেঁজা তুলোর মতো ঢেউ-খেলানো মেঘ। বার্চের শাখায় একটা দোয়েল মিষ্টি শিস দিচ্ছে আর হলুদ ঠোঁট ছোট্ট একটা পাখি থেকে থেকে ওকে যেন ভেঙাচ্ছে।

বিনডিং গ্রেবারের সিগরেটটা ধরিয়ে দিলো। 'হাইনিটা একটা পাগল।' বিনডিং এমনভাবে কথাটা বললো যেন হাইনি এখনও দুধের শিশু।

গ্রেবার গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লো। 'হ্যাঁ, পাগল সেইসব মানুষের কাছে যারা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারে।'

'তুমি ওকে জানো না, এর্নস্ট। বত্রিশ সালে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে আসার পর থেকে ও একদম বেপরোয়া হয়ে গ্যাছে। ঠিক জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে আসা অন্য মানুষের মতো। এখন কমিউনিস্টরা ওকে যমের মতো ভয় করে।'

'অস্বাভাবিক নয়।'

'আর মেয়েরা···ওদের নিয়ে ও যে কি করে, সে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না।'

'তুমিও তখন ওখানে থাকো নাকি?'

'কোথায়? ফষ্টিনষ্টির সময়? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যাই বই কি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, বন্দীশিবিরের মধ্যে আমার ওসব ভালো লাগে না।'

'আর অনেককে এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে যখন মেসিনগান দিয়ে গুলি করে মারা হয়?'

বিনডিং চমকে গ্রেবারের মুখের দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'না, এর্নস্ট। একবার শুধু দেখতে গিয়েছিলাম। নইলে আমি ওদের মতো অত ভাববিলাসী নই।'

হাইনিকে এবার দরজায় দেখা গেলো। মুখ চোখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'জঘন্য! বড্ড দেরি হয়ে গেলো, আমি চলি আলফনস্। গুড বায়।'

বকের মতো সরু সরু ঠ্যাং ফেলে ও বাগানের ফটক পেরিয়ে গেলো। তারপর কোটটা কাঁধে ফেলে টুপি নেড়ে বিদায় জানালো।

'ওর হাতে ধরা পড়তে চাই না বলেই ওকে আমি খাতির করি, এর্নস্ট।'

এ সম্ভাবনার কথা যে একবারও গ্রেবারের মাথায় আসেনি তা নয়। তবু কৃত্রিম গাম্ভীর্য রেখে ও জিজ্ঞেস করলো, 'তাই কি ?'

'হ্যাঁ, এর্নস্ট। ওরা বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'কিন্তু হের বারমেস্টার আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই, উনি তো আর বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না ?

বিনডিং অবাক হয়ে গেলো, 'তুমি জানলে কেমন করে ?'

'আমি জানি আলফনস্, তুমিই তাঁকে বন্দীশিবিরে ঢুকিয়েছো।'

বিনডিং হাসলো। 'ওটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'দুর্ভাগ্য !'

'আজকের দিনে দুর্ভাগ্য অনেকেরই, এর্নস্ট। এই যে পাঁচ হাজার মানুষ সারা শহরে আজ গৃহহীন, দুর্ভাগ্য কি এদেরও নয় ? বরং যারা বন্দীশিবিরে আছে, এর চেয়ে অনেক ভালো। তাছাড়া এসবের জন্যে তুমি বা আমি একা দায়ী নই।'

দুটো চড়ুই ভীরু চোখে তাকাতে তাকাতে ফোয়ারার ধারে এসে টুক করে জলে মাথা ডুবিয়ে ডানা ঝাপটে স্নান সেরে নিলো। বিনডিং অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। হাইনির কথা ও যেন বেমালুম ভুলে গেছে। গ্রেবার ওর নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো, মানুষের জন্যে সহানুভূতির কোথাও কোন চিহ্ন নেই। আর ঠিক তখনই অনুভব করতে পারলো চারদিকে এই বিপুল ধ্বংসের স্মৃতি, বিচ্ছিন্নতা, ভয়, অহং অহামিকার জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী কি ও নিজেও নয়! কই, এর বিরুদ্ধে ও তো নিজে কোনদিন সংগ্রাম করেনি ? বিদ্রোহ, এমনকি প্রতিবাদেও ও কোনদিন তো মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। তাহলে বিনডিং-এর সঙ্গে ওর তফাতটা কোথায় ? গ্রেবার বুক খালি করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'এ দায়িত্বের বোঝা আমাদের জীবনে কম নয়, আলফনস্।'

'কিন্তু এর্নস্ট, দায়ী হতে পারো তখনই যখন তুমি নিজে কোন কিছু করছো। এবং কেবল তখনই, যখন তুমি সুশৃঙ্খলভাবে কোন দায়িত্ব পালন করছো না।'

'অথচ বন্দীদের গুলি করে মারার সময় আমরা তাদেরই দায়ী করি, সমস্ত দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই, তাদের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করি।'

'বন্দীদের কথা আলাদা, এর্নস্ট। বন্দীরা এর ব্যতিক্রম।'

'হ্যাঁ, আজকের দিনে সবকিছুই ব্যতিক্রম।' গ্রেবার সিগারেটটা ছুঁড়ে

ফেলে দিলো। 'আমরা যখন কোন শহরে বোমা ফেলি তখন সেটা হয় রণকৌশলের প্রয়োজন, আর অন্যেরা যখন আমাদের শহরে বোমা ফেলে তখন সেটা হয় মারাত্মক অপরাধ।'

বিনডিং গ্রেবারের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলো। 'এইটেই আধুনিক রাজনীতি, এবং জার্মান জনগণের স্বার্থেই আমরা তাকে গ্রহণ করেছি।' হঠাৎ ও বারান্দার রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়লো। 'এই এর্নস্ট, ছাখো ছাখো, চড়ুই ছুটো কিরকম অসভ্যতামী করছে!'

গ্রেবার দ্রুত পা চালালো। নির্জন প্রান্তরের মধ্যে নুড়ি আর বালি মেশানো বেশ খানিকটা পথ মাড়িয়ে তারপর শহরের রাস্তা। হলুদ ডানা-ওয়ালা বড় একটা প্রজাপতি পথের ঠিক মাঝখানে খুব নিচু দিয়ে উড়ছে। কিছুটা এগিয়ে দু-মুখো একটা পথের মোড়ে গ্রেবার হঠাৎ হাইনিকে দেখতে পেলো। তখনও প্রায় একশো গজ দূরে।

গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো কোথাও কেউ নেই। রোদ্দুরে চারদিক খাঁখাঁ করছে। হাইনির ওপর কেউ যদি প্রতিশোধ নিতে চায়, এই সুবর্ণ সুযোগ। বালির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গেলে ও টেরও পাবে না। গুলির শব্দে লোক জানাজানি হবার ভয় আছে। এদিক থেকে ছুরি বসিয়ে দেওয়া কিংবা গলা টিপে মারা সবচেয়ে সহজ। আর ওর যা চেহারা, একার পক্ষে মাঠের মধ্যে টেনে ফেলে দিয়ে আসাটা কিছুই কঠিন নয়।

গ্রেবারের মনে হলো ও যেন খুব দ্রুত হাঁটছে। আর যাই হোক, বিনডিং অন্তত ওকে সন্দেহ করবে না। হাইনির মতো মানুষের ওপর প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করার লোকের অভাব নেই। এক ঘণ্টায় যে অজস্র অসহায় মানুষকে নির্দ্বিধায় খুন করতে পারে, তার ওপর প্রতিশোধ নেবার এ এক আশ্চর্য সুযোগ।

গ্রেবারের মনে হলো ওর হাত ছুটো ঘামছে, কানের পাশ ছুটো গরম হয়ে উঠেছে। দেখলো ওদের দুজনের মাঝের দূরত্ব প্রায় তিরিশ গজ কমে গেছে। ইচ্ছে করলে ও এখন এক ছুটে পেছন থেকে হাইনের টুঁটিটা চেপে ধরতে পারে। কথাটা মনে হতেই ওর বুকে কে যেন হাতুড়ি পেটাতে শুরু করলো। দ্রুত বেড়ে গেলো স্পন্দন। কেন এমন হলো? আমি তো কাউকে খুন করতে চাইনি। তাহলে? এ কি মনের কোণে জমা অতীত গ্লানি, যা থেকে ও আজ মুক্তি পেতে চায়? মুক্তি, না প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা নেবার

মতো ও তো ওর কিছু করেনি, ও তো ওকে চেনেই না! তাহলে? কিন্তু হাইনি তো আজ বিশেষ একটা কোন সংখ্যা নয়, ওরা একটা গোষ্ঠী। যারা এলিজাবেথের বাবার মতো আগণন নিরাপরাধ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে বন্দীশিবিরের অন্ধকারে, বন্দীদের গুলি করে মারছে প্রকাশ্য দিবালোকে, জাতির নামে ইহুদিদের নির্মমভাবে হত্যা করছে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে—এ অপরাধের প্রতিশোধ কে নেবে?

হঠাৎ গ্রেবারের মনে হলো ও অসম্ভব দ্রুত হাঁটছে। গলার ভেতরটা ওর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নাঃ, আমার আর একটু বেশি পান করা উচিত ছিলো। গ্রেবার যেন ঘোরের মধ্যে থেকে নিজেকে টেনে তুললো। দেখলো রাস্তার ওপ্রান্ত থেকে একটি তরুণী এগিয়ে আসছে। কমলা রঙের ব্লাউজ পরা, হাতে একটা বেতের ঝুড়ি। গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। তারপর খুব আস্তে আস্তে হাঁটলো। ঝুড়ি দোলাতে দোলাতে তরুণী অনায়াস ভঙ্গিতে হাইনিকে পেরিয়ে গ্রেবারের দিকে এগিয়ে আসছে। গ্রেবার সোজা ওর চোখের দিকে তাকালো। বলিষ্ঠ কাঁধ, নিটোল বুক, মসৃণ বাদামী মুখ। মাথার মাঝখান থেকে সিঁথি কাটা কোঁকড়ানো কালো চুল। ওর চোখের দিকে তাকাতেই গ্রেবারের মনে হলো জীবন-প্রাচুর্য যেন উপছে পড়ছে আর কোথাও যদি কোন দুঃখ থেকে থাকে, তাকে ও নিঃশব্দে গোপন করে রেখেছে মিষ্টি হাসির আড়ালে।

অতিক্রম করে যাবার সময় তরুণী আন্তরিক স্বরে গ্রেবারকে অভিবাদন জানালো, 'সুপ্রভাত, হের।'

মাথা নুইয়ে গ্রেবার প্রত্যাভিবাদন জানালো। অথচ একটা কথাও বলতে পারলো না। তরুণীর পায়ের শব্দ পেছনে মিলিয়ে যেতেই গ্রেবার দেখলো হাইনির কালো ছায়াটা পথের বাঁকে হারিয়ে গেছে। সামনের পথটা এখন কেমন যেন ফাঁকা আর হালকা মনে হচ্ছে।

গ্রেবার ভাবলো এখনও সময় আছে, ছুটে গেলে ওকে ধরা এমন কঠিন কিছু নয়। কিন্তু তখনই বুঝতে পারলো, ও তা পারতো না। বুকের ভেতর থেকে কি যেন একটা নিঃশব্দে হারিয়ে গেছে, এখন আর সম্ভব নয়। এখন কেন, আগেও হয়তো পারতাম না। গ্রেবার ভাবলো, আমার ধারণা ছিলো আমি শান্ত স্থির। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমি বিভ্রান্ত। হঠকারীর মতো আমার একটা কিছু করে ফেলা উচিত নয়, এখন থেকে আমাকে আরও সতর্ক হতে হবে।

পত্রিকার স্টল দেখে গ্রেবার দাঁড়িয়ে পড়লো। সেদিনের খবরের কাগজ খানা কিনে ওখানে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ-সংবাদগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো। এখানে আসার পর কাগজের কথা ওর মনেই ছিলো না। বড়বড় শিরোনামা-গুলো আগে পড়লো। এখনও অব্যাহত গতিতে পিছু হটার পালা চলেছে। ছাপানো মানচিত্রে ওদের সৈন্যবাহিনীর সম্ভাব্য একটা অবস্থান খুঁজে বার করার চেষ্টা করলো। পারলো না। কেননা সমর-বিভাগ পরিবেশিত সংবাদে ওর আদৌ কোন আস্থা নেই। তবু অনুমান করে নিলো ওদের সৈন্যবাহিনী এখন আরও একশো কিলোমিটার পিছিয়ে এসেছে।

খানিকক্ষণ ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওখান থেকে চলে আসার পর বন্ধুদের কথা ওর একবারও মনে পড়েনি। ওদের স্মৃতি যেন ওর মন থেকে শুকনো পাতার মতো ঝরে গিয়েছিলো। এখন মনে পড়লো। আর ঠিক তখনই ধূসর একটা নির্জনতা যেন মাটি থেকে গুঁড়ি মেরে উঠে এলো বুকের কাছে। খবরে প্রকাশ ওদের সীমান্তে তুমুল লড়াই চলেছে। অথচ আশ্চর্য, কোথাও কোন শব্দ নেই, রঙ নেই, রক্ত নেই! নিরক্ত শকুনের বিশাল কালো কালো ছায়াগুলো কেবলই ডানা মেলে ঘুরছে, আর ঘুরছে। তারপর একটু একটু করে সূর্যকে ওরা ঢেকে ফেলেছে। অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে প্রতারিত প্রবঞ্চিত নির্যাতিত আমার অন্তরঙ্গ সাথীদের বাঁচা-মরা, তাদের সংগ্রাম, তাদের দুঃখ ঘৃণা ভয় এক হয়ে মিশে যাচ্ছে ঘাতকের রক্ত-কলঙ্কিত থাবায়!

অন্যমনস্ক গ্রেবার এক বৃদ্ধার ঘাড়ে প্রায় হুড়মুড় করে পড়তেই, বৃদ্ধা ওর বাপান্ত করে ছাড়লো। কোল থেকে কয়লার ভারি বস্তাটা নামিয়ে রেখে বৃদ্ধা কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালো। 'বলি হ্যাঁরা, গু-খেকোর ব্যাটা, এই সাত-সকালে বুঝি তোর চোখের মাথা খেয়েছিস্।'

'ভুল হয়ে গেছে বুড়ি মা।'

বৃদ্ধা গলার শির ফুলিয়ে এগিয়ে এলো, 'ঝাড়ু মারি তোর ভুলের মাথায়, ব্যাটা পাজি নচ্ছার!'

গ্রেবার বেগতিক দেখে সোজা পিট্টান দিলো!

ইয়ানপ্লাসট্সের একদিকটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অন্যদিকটা তখনও অক্ষত। ভাঙা জনলার শার্সি দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরে মেয়েরা ধোয়া-মোছা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত।

ছ নম্বর খুঁজে পেতে গ্রেবারের খুব একটা অসুবিধা হলো না। কিন্তু

যখন খুঁজে পেলো হতাশ হতেও আর কিছু বাকি রইলো না। বাড়ির ওপর তলাটা ভেঙে পড়েছে ঠিক প্রবেশ পথের মুখে। দেখলে মনেই হবে না কেউ এখানে বাস করে। ফিরে আসার সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলো সরু একটা পায়ে চলা পথ। পথটা ঘুরে বারান্দার সামনে একটা বন্ধ দরজার কাছে এসে শেষ হয়েছে। গ্রেবার কড়া নাড়লো। কোন সাড়া নেই। আবার কড়া নাড়লো। একটু অপেক্ষা করার পর ভেতরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলো এবং খুব সন্তর্পণে দরজার একটা কপাট একটু ফাঁক হলো।

'কাকে চাই?'

'হের পোলমান আছেন?'

এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। 'কি চাই?'

'আমি এর্নস্ট গ্রেবার, আপনার প্রাক্তন ছাত্র।'

'ও, আচ্ছা। তারপর, কি মনে করে?'

'আপনার কাছে এলাম!'

বৃদ্ধ বিব্রত হলেন। 'কিন্তু আমি তো শিক্ষকতা করা ছেড়ে দিয়েছি।'

'আমি জানি।'

'আচ্ছা। তাহলে তুমি এটাও নিশ্চয়ই শুনেছো, অনিয়মিততার অপরাধে আমাকে বিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এবং সত্যি বলতে কি এখন কোন ছাত্রকে পড়াবার অধিকারও আমার নেই।

'জানি।'

বৃদ্ধ অবাক হলেন। 'তাহলে?'

'এখন আমি ছাত্র নই এবং সেজন্যে আপনার কাছে আসিনি। আমি এখন সৈনিক, কয়েকদিন আগে ছুটি নিয়ে রাশিয়া থেকে ফিরেছি। ফ্রেজেনবুর্গ আপনাকে তার আন্তরিক প্রীতি জানাতে বলেছে। সেই জন্যেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

বৃদ্ধ করুণ চোখে গ্রেবারের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ফ্রেজেনবুর্গ! ও এখনও বেঁচে আছে?'

গ্রেবার ম্লান হাসলো। 'দশ দিন আগেও অন্তত বেঁচে ছিলো।'

বৃদ্ধ সন্তর্পণে এদিকওদিক তাকালেন। তারপর দ্রুত স্বরে বললেন, 'এসো, ভেতরে এসো।'

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে অন্য একটা ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে ওরা একটা ঘরের সামনে এসে পৌঁছলো।

পোলমান দরজা ঠেললেন, তারপর পেছন ফিরে বেশ জোরে জোরে বললেন, 'এসো এর্নস্ট, ভেতরে এসো। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম বোধহয় পুলিস।'

বিস্ময়ে গ্রেবারের ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠলো। পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওর হাসি পেলো। সম্ভবত জোরে কথা বলে উনি কাউকে আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু কাকে? পোলমানের তো কোন কালে কেউ ছিল না!

ওরা ভেতরে প্রবেশ করলো। টেবিলে সবুজ ঢাকনা দেওয়া একটা তেলের বাতি জ্বলছে। বাইরের স্তূপাকৃত ইটপাথরের জানলাগুলো প্রায় ঢেকে গেছে। পোলমান ঘরের মাঝামাঝি ওকে টেনে নিয়ে এলেন। 'হ্যাঁ, এবার তোমায় চিনতে পারছি। আজকাল আর বাইরে বেরুই না, তেমন দরকারও হয় না। চোখে সব ধাঁধা দেখি। ইলেকট্রিক সংযোগ নষ্ট হয়ে যাবার পর থেকে প্রায় অন্ধকার ঘরে বসে বসেই দিন কাটাচ্ছি।'

বাইরে থেকে আসার পর প্রথমে ঘরটা মনে হয়েছিলো ঠিক যেন একটা প্রজাপতির বাসা। এখন ভালো করে তাকিয়ে দেখলো—সারা দেওয়াল জুড়ে সাজানো সারি সারি বই, বড় একটা লেখার টেবিল, যার ওপর বাতিটা জ্বলছে। আর এর সবের মাঝে হাজার বছরের বন্দী পক্ককেশ বলিরেখা-কুঞ্চিত এক বৃদ্ধ।

গ্রেবারের চোখের স্তব্ধ-বিস্ময় বৃদ্ধ বোধহয় পড়তে পেরেছিলেন। 'হ্যাঁ এর্নস্ট, বহুকষ্টে এই বইগুলো এখনও টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছি।'

গ্রেবার ঘুরে দাঁড়ালো। 'গত কয়েক বছর বইয়ের কোন সংস্পর্শেই আসতে পারিনি।'

'প্রয়োজনীয় জিনিসেই তোমাদের সৈনিকের ঝোলা ভরে থাকে, অত বড় বড় বই বয়ে বেড়াবার অবকাশ কোথায়?'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না। স্নিগ্ধ সবুজ বাতিটার দিকে ও উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো।

'তুমি এখানে কেন এসেছো, এর্নস্ট?'

'ফ্রেজেনবুর্গের অনুরোধে। ও বলেছিলো আমি যেন ছুটির মধ্যে অবশ্যই আপনার সঙ্গে একবার দেখা করি।'

'তুমি ওকে ভালো করে চেনো?'

'ও আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু—যার অন্তত এতটুকু মানবিক বোধ আছে, যাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ওর ধারণা আপনি আমার অনেক না-খুঁজে পাওয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।'

গ্রেবার বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালো। ওর প্রথম যৌবনে দেখা শান্ত সৌম্য নিরহঙ্কার মানুষটা আজ প্রবৃদ্ধ, যার ভাগ্য প্রায় নির্ধারিত হয়ে গেছে, তিনি যেন এখন হঠাৎ উদ্ধত যৌবন কোন পরীক্ষকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তাঁর জীবনের শেষ পরীক্ষা দিতে।

'প্রশ্ন!'

'হ্যাঁ। আমি বুঝতে চাই, আমি জানতে চাই, গত দশ বছর ধরে এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে আমি কতটা জড়িত এবং কি করা উচিত।'

পোলমান ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। তারপর ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করলেন। তাক থেকে একটা বই টেনে নামিয়ে পাতা ওলটালেন। 'জানো, তুমি কি প্রশ্ন করছো?'

'জানি।'

'আজকের দিনে এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ কারণে মানুষকে গুলি করে মারা হচ্ছে, তুমি জানো?'

'জানি।'

পোলমান চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর তাঁর চেয়ারে ফিরে এলেন। 'তুমি কি যুদ্ধের কথা বলছো, এর্নস্ট?'

'সবকিছুর কথা। এই মিথ্যাচার, এই অন্যায়, এই বর্বরতা—এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত যাকিছু, বন্দীশিবির শাস্তিশিবির ক্রীতদাস শিবির গণহত্যা—সব সব।'

পোলমান নিশ্চুপ।

গ্রেবারের মনে হলো ওর বুকের ভেতরে কি যেন একটা দাউদাউ করে জ্বলছে। তবু প্রতিটা শব্দের নিঃসরণে ও যেন একটু একটু করে হালকা হয়ে যাচ্ছে। 'আমি নিজে চোখে দেখেছি খুব কম, অথচ শুনেছি তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি জানি এ যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, তবু এখনও লড়ছি শুধু লোভের আসনে ক্ষমতার আসনে সরকারকে আরও কিছুদিন টিঁকিয়ে রাখার জন্যে।'

'তোমাকে তো আবার সীমান্তে ফিরে যেতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

পোলমান গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তোমার পক্ষে সেটা হবে আরও মর্মান্তিক।'

'যুদ্ধে হেরে গেছি বলে আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু যখনই ভাবি আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে, আর যাকিছু অমানুষিক তাকে টিকিয়ে

রাখার জন্যে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে, তখনই নিজেকে আমার সবচেয়ে অপরাধী বলে মনে হয়।'

মুহূর্তের মধ্যে বৃদ্ধের মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেলো। শুধু জ্বলে উঠলো অপলক তাকিয়ে থাকা ওঁর সমুদ্র-নীল চোখের মণিদুটো। গ্রেবারের হঠাৎ মনে হলো ঠিক এই চোখদুটো এর আগে ও যেন কোথায় দেখেছে, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না।

'তোমাকে ফিরে যেতেই হবে, এর্নস্ট ?'

'নাও পারি। তখন গুলি করে মারা হবে। লুকতে কিংবা পালাতে পারি। খুঁজে বার করতে কয়েক ঘণ্টাও সময় লাগবে না। আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে বাড়ির সবাইকে তখন হত্যা করা হবে। একান্ত খুঁজে না পেলে বাবা-মার ওপর ওরা প্রতিশোধ নেবে।'

এই মুহূর্তে বৃদ্ধ কিছু বলতে পারলেন না। ভাসা-ভাসা তন্ময় চোখে কেবল সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সারা ঘর জুড়ে নেমে এলো একটা নিস্তব্ধতা। নিটোল নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতার মাঝে মান্ধাতার আমলের পুরনো ঘড়িটা হঠাৎ বেয়াড়াভাবে বেজে উঠলো। গ্রেবার এতক্ষণ ওটাকে লক্ষ্যই করেনি।

'তাহলে সীমান্তে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই ?'

'কোন উপায় নেই।' একটু বিরতির পর গ্রেবার আবার বললো, 'এক আত্মহত্যা করতে পারি। কিন্তু তা আমি চাই না।'

'এখানে কোথাও বদলি হয়ে আসতে পারো না ?'

'না। স্বাস্থ্য আমার বরাবরই ভালো···আর বদলি হয়ে এলেও সমস্যাকে এড়ানো যাবে, সমাধান কিছু হবে না। তাছাড়া অফিসে বসে কি দুষ্কর্মের সহভোগী হওয়া যায় না, বলুন ?'

'যায়, এর্নস্ট।' বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

হঠাৎ ওঁর মুখের দিকে তাকাতেই গ্রেবার থমকে গেলো। দেখলো যন্ত্রণা-হত ম্লান চোখে উনি নিঃশব্দে কি যেন হাতড়ে হাতড়ে খোঁজার চেষ্টা করছেন। বিচারকের আসনে না বসিয়ে আমি ওঁকে অভিযুক্ত করছি? গ্রেবার ভাবলো। আর তখনই ওর মনে হলো একদিন যাঁর কাছে শিক্ষা নিয়েছি, আজ সেই বৃদ্ধ মানুষটাকে আমি অহেতুক আত্মনিপীড়নে কষ্ট দিচ্ছি। সম্মান থেকে বিচ্যুত, নিতান্ত গ্রেপ্তার এড়িয়ে অশীতিপর যে বৃদ্ধ দিনের পর দিন প্রাচীনতম অন্ধকার গুহায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন, তাঁকে এভাবে বিব্রত করবার জন্যে গ্রেবার লজ্জিত হলো।

'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, হের পোলমান। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা মানেই তার স্বীকৃতি জোর করে আদায় করে নেওয়া। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কাছ থেকে কোন উত্তর আদায় করে নিতে চাইনি। আমি শুধু নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম।'

'না না, এর্নস্ট, না…' পোলমান বিচলিত হয়ে উঠলেন। 'উত্তর চাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে।' হঠাৎ উনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'তুমি হয়তো জানো না এর্নস্ট, যুক্তি দিয়ে বিচার করার মতো মন তৈরি হবার আগেই ওরা কিভাবে কিশোরদের বিষিয়ে দেয়। তার পরিণতি এই যে দুঃখ বেদনা হতাশা, এই যে বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিকতা—তুমি কি ভাবো এ-সম্পর্কে আমি ভাবি না? ভাবি। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই ভাবি।'

গ্রেবার এখন হঠাৎ মনে করতে পারলো পোলমানের এই চোখদুটো ও কোথায় দেখেছে। সমুদ্র-নীল আয়ত এই চোখদুটো সেই রাশিয়ান বৃদ্ধের, যাকে ও নিজে হাতে গুলি করে মেরেছে। ওর কথা মনে পড়তেই গ্রেবারের মন খারাপ হয়ে গেলো। ও উঠে পড়লো। 'আজ আমি যাই।'

পোলমানও উঠে দাঁড়ালেন। 'তাহলে কি ঠিক করলে, এর্নস্ট?'

'জানি না। ভাবার এখনও দু সপ্তা সময় আছে।'

'আবার এসো।' বৃদ্ধ ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। 'যাবার আগে একবার অন্তত আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।'

'আসবো।'

'আর চিঠি লিখলে ফ্রেজেনবুর্গকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

'নিশ্চয়ই।'

পোলমান ইতস্তত করলেন। 'তোমাকে আমি কিছু বলতে পারলাম না, এর্নস্ট। আর বললেও সেটা হতো এক ধরনের এড়িয়ে যাওয়া। শুধু এইটুকু বলতে চাই নিজের ওপর কখনও বিশ্বাস হারিও না।'

গ্রেবার ম্লান ঠোঁটে হাসলো। কোন উত্তর দিলো না।

'তুমি হাসছো, এর্নস্ট?' পোলমানের সেই আয়ত চোখদুটো আবার দীপ্ত জ্বলে উঠলো। 'আমি হলে প্রতিবাদ করতাম!'

'করছি তো। চিৎকার করে প্রতিবাদ করছি। কেবল আপনিই যা শুনতে পাচ্ছেন না।'

চোদ্দ

'আজ আমাদের খুব ভালো ভীনের শনিটসেল আছে, স্যর।' সারস-গলা বুড়ো পরিচারক খুশির চোখে তাকালো।

'বাঃ,' গ্রেবার দুষ্টুমি করে হাসলো। 'আজ আমাদের দুজনের ভার সম্পূর্ণ তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। তুমি যা ভালো বুঝবে, আনবে। আমি কিচ্ছু বলবো না।'

বুড়ো হাসতে হাসতে চলে গেলো। গ্রেবার আয়েস করে হাত পা ছড়িয়ে বসলো। এখন ওর মনে হচ্ছে মারাত্মক যুদ্ধাঞ্চল থেকে ও যেন বেরিয়ে এসেছে শান্তির কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। সন্ধ্যের আগেই যেন যুদ্ধ থেমে গেছে আর গাছেরা তাদের সবুজ পল্লব মেলে দিয়ে বিদায়-সূর্যের শেষ রাঙা আলো-টুকুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। হঠাৎ এখন জীবনকে ওর খুব কাছাকাছি মনে হলো। ভাবলো জীবনের এই দুটো সপ্তাকে আমি নিবিড় করে আঁকড়ে ধরবো, গাছের সবুজ পল্লব যেমন আঁকড়ে ধরে সূর্যের আলো।

গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকালো। আজও সে বসেছে তার মুখো-মুখি উলটোদিকের আসনে। চুলগুলো টুপিতে ঢাকা। আঁটসাঁট পোশাকে ওকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন কোন কিশোর। চঞ্চল দু চোখে ভাসছে হালকা খুশির রেশ। 'আজকে ঘরোয়া কোন পোশাক পরলে না কেন?'

'পারলাম না। আসলে পোশাক পালটাবার মতো কোন জায়গাই খুঁজে পেলাম না।'

সাত সকাল থেকেই ও ভেবেছিলো বিনডিং-এর ওখানে গিয়ে একটু কেতা-দুরস্ত হয়ে নেবে। কিন্তু বিকেলে পোলমানের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর ওখানে যেতে ওর আর ইচ্ছে করলো না।

'তুমি ইচ্ছে করলে আমার ঘরে পালটাতে পারতে।'

'তোমার ঘরে!' গ্রেবার অবাক হলো। 'আর তোমার ডাইনি লিজার?'

'উচ্ছন্নে যাক ডাইনি লিজার।'

পরিচারক ফিরে এলো। 'আপনাদের জন্যে ইয়োহানিস্‌বের্গের ককস্‌-বের্গই নিয়ে এলুম, স্যর।'

'ইয়োহানিস্‌বের্গের ককস্‌বের্গ!'

'সত্যি বলতে আপনারাই এর একমাত্র মর্ম বোঝেন।' বোতলটা খুলে ও টেবিলের ওপর রাখলো। আর ঠিক তখনই ককিয়ে ওঠা একটা আর্তনাদে

সবার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। বুড়ো করুণ স্বরে বললো, 'ক্ষমা করবেন স্যর, সত্যিই আমি দুঃখিত।'

ব্যাখ্যা করে আর বলার দরকার হলো না। মুহূর্তের মধ্যে সারা হল-ঘরের চাপা গুঞ্জনে সাইরেনের শব্দ ডুবে গেলো। টেবিল থেকে এলিজাবেথের গ্লাসটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেলো।

গ্রেবার পরিচারককে জিজ্ঞেস করলো, 'সবচেয়ে কাছের চোরা-কুঠরিটা কোথায়?

'এখানে এই হোটেলেই আছে, স্যর।'

'এটা কি শুধু সভ্যদের জন্যে?'

'আপনারাও এ হোটেলের সভ্য। আমাদের চোরা-কুঠরিটা অন্য যে-কোন জায়গার চাইতে মজবুত। উচ্চপদস্থ অফিসারদের জন্যে···বুঝতেই পারছেন···'

'ঠিক আছে। আর একটা গ্লাস নিয়ে এসো।'

বুড়ো চলে গেলো। গ্রেবার তার গ্লাসটা ভর্তি করে এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে দিলো। 'নাও, সবটা খেয়ে ফ্যালো।'

'আমরা যাবো না?'

'এখনও অনেক সময় আছে। এটা প্রথম সংকেত। হয়তো গতবারের মতো দেখবে এবারেও কিছু হবে না।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, স্যর।' বুড়ো গ্লাসটা টেবিলে রেখে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

গ্রেবার গ্লাসটা ভর্তি করে কয়েক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলো। তারপর এলিজাবেথের দিকে তাকালো। 'একি, কি ভাবছো? খাও। এখনও অনেক সময় আছে। ইচ্ছে করলে আমরা বোতলটাই শেষ করে দিতে পারি।'

এলিজাবেথ স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মতো নিঃশব্দে গ্লাসে চুমুক দিলো। স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো টেবিলের দিকে। গ্রেবার ওর দিকে ঝুঁকে এলো। 'সবটা খেয়ে ফ্যালো এলিজাবেথ, দেখবে প্রথম ভয়টা কেটে যাবে।'

'আমার হাতটা কেমন কাঁপছে দেখ।'

'না, কাঁপছে না। কাঁপছে তোমার বুকের ভিতরের জীবনটা। আর আমাদের চাইতে আমাদের জীবনের দুঃসাহস অনেক বেশি, এলিজাবেথ।'

'ভালো বলেছো। দাও, আমার গ্লাসটা ভর্তি করে দাও।'

গ্রেবার হাসলো। 'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে!'

'আমার ছোট মেয়েটা খুব অসুস্থ, স্যর। এই সবে এগারোয় পা

দিয়েছে। যেমন ফুটফুটে দেখতে, তেমনি স্বাস্থ্য। অথচ ওর মা শয্যাশায়ী, অনেকদিন ধরে যক্ষ্মায় ভুগছে···তাছাড়া আমাদের মাটির নিচের কুঠরিটা ভালো নয়। আমি থাকলে হয়তো ওদের সাহায্য করতে পারতুম। কিন্তু আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

গ্রেবার চট করে ওপাশের ফাঁকা টেবিল থেকে একটা গ্লাস এনে ভর্তি করে ফেললো। তারপর পরিচারকের হাতে গুঁজে দিলো। 'নাও, আমাদের সঙ্গে পান করো।'

'কিন্তু···'

'কোন সংকোচের দরকার নেই।'

'কাজের সময় আমাদের পান করার নিয়ম নেই, স্যর।'

'এইটেই আমাদের প্রাচীন সৈনিক-রীতি, যখন কিছু করার নেই তখন পান করো।'

'ধন্যবাদ, স্যর।' বুড়ো চোখ মিটমিট করে হাসলো। 'আপনার পদোন্নতির আশা আমি কামনা করি, স্যর।'

'আমার পদোন্নতির আশা···ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'মানে আপনি করপোরাল পদে উন্নীত হন, এই কামনাই করছি, স্যর।'

'ধন্যবাদ।' গ্রেবার মনে মনে ভাবলো ঠিক ধরেছি, তুমি ব্যাটা একটা আস্ত বাস্তুঘুঘু।

'এই রকম দামী মদ আমি এক ঢোকে খেতে চাই না, স্যর। এমনকি বিশেষ কোন ক্ষেত্রেও না।'

'বেশ তো, সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে যাও।'

'অশেষ ধন্যবাদ, স্যর।'

গ্রেবার দুজনের গ্লাসদুটো আবার ভর্তি করে দিলো।

'ও কেমন করে জানতে পারলো?' এলিজাবেথের বিস্ফারিত চোখের মণি থেকে তখনও মুছে যায়নি বিস্ময়ের রেশ।

গ্রেবার মুচকি মুচকি হাসলো। 'তুমি জানো না এলিজাবেথ, ওদের চোখজোড়া শকুনের চোখ। অনেক দূর থেকেও ঠিক চিনতে পারে। এমনকি গতকাল ফ্রিটস্‌ও আমাদের একনজরে চিনতে পেরেছিলো। তাই আমি ওর হাতে দুটো নোট গুঁজে দিয়ে ছিলাম।'

'চোরা-কুঠরিতে অফিসাররা যদি তোমায় চিনতে পারে?'

'পারবে না।'

ঝিনুকের মতো আয়ত চোখছুটো ওর আরও বড় হয়ে উঠলো। 'কেন ?'

'আমি জানি।'

'কিন্তু ওরা যদি…'

এই মুহূর্তে এলিজাবেথের চোখের ভয় দেখে গ্রেবার আর এগুতে দিলো না। কোমল স্বরে ও বললো, 'ওরা এখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, অন্য কারুর দিকে নজর দেবার সময় কোথায় ?' গ্রেবার উঠে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথের কাঁধে হাত রাখলো। 'এসো, এলিজাবেথ। প্রথম ভয়টা এখন আমরা নিশ্চয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছি ?'

বারের এক পাশেই বিমান-আক্রমণের এই চোরা-কুঠরিটা। নতুন তৈরি। সিমেণ্ট আর লোহার রড দিয়ে শক্ত করে জমানো দেওয়াল। ঝকঝকে সাদা রঙ করা। মেঝেতে গালচে পাতা। চারদিকে চেয়ার টেবিল সোফা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। একদিকের দেওয়ালে কাচের তাকে রয়েছে পেয়ালা আর মদের বোতল। হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না এটা কোন চোরা-কুঠরি।

সেণ্টার অ্য লুকস্ !

গ্রেবার মনে মনে হাসলো, অভিজাত চোরা-কুঠরিই বটে ! ওরা দুজনে একপাশে চলে এলো। চলে এলো বললে ভুল হবে, ভিড়ের চাপে চলে আসতে বাধ্য হলো। ওদের ঠিক সামনেই বসে রয়েছে আশ্চর্য রূপসী একজন তরুণী। রাজহাঁসের পালকের মতো ধবধবে সাদা সান্ধ্যবেশ। পিঠের দিকের প্রায় সবটাই খোলা। মুক্তো-বসানো হাতের কঙ্কন থেকে ঠিকরে উঠছে দ্যুতি। ওর সঙ্গী ভদ্রলোক টাক-মাথা, ছুঁচলো চিবুক, কদাকার দেখতে একজন লেফটেনাণ্ট। এবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেলো দারুণ সাজগোজ করা এক বৃদ্ধা আর কয়েকজন অফিসারকে। একজন ছোকরা পরিচারক সামনের দিকের হোমরাচোমরাদের মদ পরিবেশন করছে।

গ্রেবার এলিজাবেথের কানে ফিসফিস করে বললো, 'আমরাও আমাদের বোতলটা নিয়ে এলে ভালো করতাম।'

কান্না-ভেজা গলায় এলিজাবেথ দ্রুত মাথা নাড়লো। 'না গ্রেবার, না। দুঃসময়ে আমার এসব ভালো লাগে না !'

'ঠিক বলেছো।' গ্রেবার ভাবলো সাহস তো নয়, এ এক ধরনের অভিনয়। অথচ এই ছেলেমানুষীর পরিণাম কি ভয়াবহ হতে পারে, জীবনে ও অজস্রবার দেখেছে।

পেছন থেকে কে যেন বললো, 'এটা দ্বিতীয়বারের সংকেত! এবার ওরা আসছে!'

'আমার ভয় করছে, এর্নস্ট।'

গ্রেবার তার চেয়ারটা এলিজাবেথের একেবারে গা ঘেঁষে সরিয়ে আনলো। শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ওর কাঁধদুটো আর তখনই অনুভব করতে পারলো কতটা চাপা উত্তেজনায় ও ছটফট করছে। ও যেন ঠিক পশুর মতন, বিপদের গন্ধ পেয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। অথচ কোন অভিনয় করতে চায়নি, নিজের এতটুকু সাহস দিয়েই ও নিজেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলো। দ্বিতীয় সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কথাটা ওর স্পষ্ট মনে পড়েছে এবং ও তাকে এতটুকু গোপন করতে চায়নি। হঠাৎ কবোষ্ণ ভালবাসার একটা তরঙ্গ স্পর্শ যেন গ্রেবারকে নাড়া দিয়ে গেলো, আর গ্রেবার ওর কাঁধ দুটো জড়িয়ে ধরলো আরও নিবিড় করে।

প্রথমে মৃদু কম্পন, পরে বিস্ফোরণের অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো। চলকে উঠলো ভেতরের গুঞ্জন। এবার আরও কাছে, আরও স্পষ্ট শোনা গেলো পরপর তিনটে বিস্ফোরণের শব্দ। গ্রেবার এলিজাবেথকে বুকের কাছে টেনে নিলো। টাক-মাথা লেফটেনান্টের হাসি এখন মাথায় উঠে গেছে। অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সমস্ত কুঠরিটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। ছোকরা পরিচারক ভয়ে ঘোরানো সিঁড়ির লোহার থামটা জড়িয়ে ধরলো। কে যেন বিজ্ঞের মতো বললো, 'কেউ ভয় পাবেন না। আসলে ওরা এখনও অনেক দূরে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দেওয়ালগুলো চিড় খেয়ে গেলো, আলোটা ভীষণ কমে এলো। ঠিক সিনেমার ফিলম কেটে যাবার আগে যেমন হয়। বাইরে, কাছেই কোথাও দেওয়াল ভেঙে পড়ার শব্দ পাওয়া গেলো। স্বল্প আলো-ছায়ায় সমস্ত দৃশ্যটা মন্থরগতিতে চালানো একটা চলচ্চিত্রের মতো মনে হলো। প্রথম দৃশ্যে খোলা-পিঠ সেই রূপসী তরুণী বেশ স্থির হয়েই বসেছিলো। দ্বিতীয় দৃশ্যে ও চকিতে উঠে দাঁড়ালো। তৃতীয় দৃশ্যে ও এখন ছুটছে, লোকেরা অন্ধকারে ওকে ধরার চেষ্টা করছে আর ও পরিত্রাহি চিৎকার করছে। কমতে কমতে আলো যখন সম্পূর্ণ নিভে গেলো, চেঁচামেচির শব্দ যেন হাজার গুণ বেড়ে গিয়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো ভেতরের বদ্ধ বাতাসে। সমস্ত কুঠরিটা এখন মনে হলো যেন তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের অতল অন্ধকারে।

'ভয় পেও না এলিজাবেথ, আলোটা শুধু নিভে গেছে।' গ্রেবার ওর কানের ওপর ঠোঁট রেখে জোরে জোরে বললো, 'হয়তো কোথাও তার

ছিঁড়ে গ্যাছে। হোটেলের এখনও কোন ক্ষতি হয়নি।'

এলিজাবেথ এবার ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলো। গ্রেবার ঠোঁট রাখলো এলিজাবেথের তপ্ত কপালে। অনুভব করলো পাগলের মতো স্পন্দিত ওর বুকের ওঠা-নামা।

কে যেন চেঁচিয়ে বললো, 'আলো কিংবা একটা বাতি নিয়ে এসো··· শিগ্‌গির!'

'ছু-একটা মোমবাতি তো রাখতে পারে।'

'ঠিক সময়েই ওগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কারুর কাছে টর্চ আছে? দেখুন তো···'

কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠলো। অন্ধকারে আলোগুলোকে মনে হলো নির্জন কোন জঙ্গলে ডাকাতদের উল্লসিত মশালের মতো। আর যারা কাঠিগুলো ধরে রয়েছে তাদের হাত, মুখের আলোকিত অংশগুলো মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার স্রোতে ভাসছে, শরীরের বাকি অংশগুলো বুঝি ওদের কোনদিনও ছিলো না।

'এতে হবে না। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিলো আগে থেকে আলোর ব্যবস্থা করে রাখা। খানসামাগুলোই বা গেলো কোন্ চুলোয়?'

'যাবে আর কোথায়, হয়তো কাছেই কোথাও গল্প মারছে।'

'দেখবেন, ঠিক দরকারের সময়ে কারুর টিকি পাওয়া যাবে না।'

হঠাৎ পিলে-চমকানো আওয়াজে সব শব্দ ডুবে গেলো। আর তখনই সমস্ত কুঠরিটা সমুদ্রের অতল থেকে যেন ছিটকে লাফিয়ে উঠলো অসীম শূন্যে। দৈত্যের প্রচণ্ড থাবায় পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার যোগাড়। ঝনঝন শব্দে কোথায় যেন কাচের গ্লাস ভাঙলো। গ্রেবারের মনে হলো শিরা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। সামলে নিতে ওর সময় লাগলো।

দূরে দেখা গেলো একটা টর্চের আলো, ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে নামছে। আলোটা কাছে এগিয়ে এলো। ভয়ার্ত নারীকণ্ঠে কে যেন আর্তনাদ করে উঠলো, 'বাঁচাও! বাঁচাও! আগুন! আমাকে বাঁচাও!'

আলো পড়তে দৃশ্যটা আরও করুণ হয়ে উঠলো। সেই রূপসী তরুণী! দু পাশ থেকে বলিষ্ঠ দুটো বাহু ওর হাত চেপে ধরে আছে, আর ও আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার। হঠাৎ-আলোয় বিচ্ছুরিত হলো ওর রত্ন-বলয়ের দ্যুতি। আতঙ্ক-বিস্ফারিত দুই চোখ, এলোমেলো সোনালী চুল। কাঁধের দু পাশ থেকে নেমে গেছে ওর সান্ধ্যপোশাক। অন্তর্বাসের আড়ালে মসৃণ পাথরের মতো নিটোল দুটো স্তন। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ও

পাগলের মতো পুরুষ-হাতদুটোকে কামড়াবার চেষ্টা করছে।

কানের ওপর হাত রেখে গ্রেবার এলিজাবেথের মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরলো, যাতে কোন শব্দ ওর কানে না প্রবেশ করতে পারে। গ্রেবার যেন রক্ত মাংস, পোড়া চুলের গন্ধ পেলো।

'ডাক্তার! এখানে কোন ডাক্তার আছে?'

'মামার বাড়ি!'

'বাজে বোকো না, একে একখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'এখন? অসম্ভব!'

কেউ আর কোন কথা বললো না। সেই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় সবাই কান খাড়া করে শুনলো বাইরে বিমান-বিধ্বংসী-কামানের একটানা গুলির আওয়াজ। অথচ বিস্ফোরণ কিন্তু অনেক আগেই থেমে গেছে।

'ওরা এখন চলে গ্যাছে।'

এলিজাবেথ মাথা তোলার চেষ্টা করলো। গ্রেবার বাধা দিলো। 'উঁহু, একটুও নোড়ো না।'

কে যেন বললো, 'এখনই কেউ বাইরে বেরুনোর চেষ্টা করবেন না। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন।'

আবার একটা টর্চের জোরালো আলো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে এলো। তরুণী আবার ককিয়ে উঠলো, 'না না, নিভিয়ে দাও। আগুন! আগুন!'

'আগুন নয়, এটা টর্চের আলো।'

আলোটা অন্ধকার কুঠরির প্রতিটি দেওয়ালের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো।

'কি ব্যাপার?'

'কে আপনি?'

'আলো নিয়ে এখানে কি করছেন?'

আলোটা এবার দেওয়াল থেকে সরে এলো ছাদের সিলিংয়ে। 'আমি হেড ওয়েটার, ফ্রিটস্। খাবার ঘরটা ধ্বংস হয়ে গ্যাছে। তাই আলো নিয়ে দেখছি এটার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা।'

অন্ধকারে গম্ভীর গলায় কে যেন ধমকালো, 'ওসব বাজে কাজ ছাড়ো। শিগ্গির একবার এদিকে এসো। এখানে একজন অজ্ঞান হয়ে গ্যাছে।'

এলিজাবেথের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে আলোটা এবার মেঝেতে এসে পড়লো। চেয়ার টেবিল উল্টে একশা। দেওয়ালের ওপাশে কে যেন তাল-

গোল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। সেই বৃদ্ধা। সাদা চুল রক্তে থৈ থৈ করছে। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন একজন মেজর।

'সর্বনাশ!'

'চুপ, চুপ করো সব।' মেজর ধমকে উঠলেন।

'ওদিকে তাকিও না, এলিজাবেথ।' গ্রেবার ফিসফিস করে বললো। 'বিমান-আক্রমণের সময় এ ধরনের দুর্ঘটনা যে-কোন জায়গাতেই ঘটতে পারে। কিন্তু তোমার আর শহরে থাকা চলবে না। আমি তোমাকে কোন গ্রামে নিয়ে যাবো। সেখানে তুমি অনেক নিরাপদে থাকবে।'

'স্ট্রেচার! এখানে কোন স্ট্রেচার পাওয়া যাবে?' মেজর উঠে দাঁড়ালেন।

'যাবে, স্যর।' ফ্রিটস্ ঢোক গিললো। 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এখানে কেউ আহত হয়েছেন।'

'কথা না বাড়িয়ে শিগ্‌গির যাও···না, দাঁড়াও। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

দুজনে চলে যেতেই আবার সেই অন্ধকার যেন ওদের গিলতে এলো।

কে যেন বললো, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

'না। এখনও বিপদ-মুক্তির সংকেত হয়নি।'

'আরে রাখুন মশাই, আপনার বিপদ-মুক্তি! এদিকে বলে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

'এত অন্ধকারে থাকা যায় নাকি?'

'আলো থাকলে তবু না হয় কথা ছিলো।'

'আলো! আলো এখন কোথায় পাবেন?'

'ওই তো, আসছে···'

দুজনে ফিরে এলো। এবার মেজরের হাতে একটা লণ্ঠন। পেছনে কালো টাই-পরা দুজন ছোকরা পরিচারক। মেজর লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রাখলেন।

'আগুন! আগুন! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!' হঠাৎ বীভৎস সেই চিৎকারে সবাই চমকে উঠলো। যেন এতক্ষণ তরুণীর কথা কারুর মনেই ছিলো না।

লেফটেনাণ্ট এবার বিব্রত বোধ করলো। 'একখুনি একে একবার ডাক্তার দেখানো দরকার, মর্ফিয়া না দিলে শান্ত হবে না।'

'এদিকে এদিকে, স্ট্রেচারটা এদিকে নিয়ে এসো।' মেজর দু হাত দিয়ে লোকজন সরিয়ে পরিচারকদের পথ করে দিলেন। 'দেখো দেখো, খুব

সাবধানে। উঁহু, মাথাটা…' মেজর নিজেই মাথাটা ধরলেন।

'ফ্রিটস্ ?'

'ইয়েস, স্যর।'

'তুমি বাইরে বেরিয়ে ছাখো কোন অ্যাম্বুলেন্স পাও কিনা।'

'আচ্ছা, স্যর।'

ফ্রিটসের পেছনে টেবিলের আচ্ছাদন ঢাকা দেওয়া স্ট্রেচারটা তুলতে তুলতে ওপরে উঠে গেলো।

'উনি কি মারা গেছেন, এর্নস্ট ?'

'না।'

'কি করে হলো বলো তো ?'

'ঠিক বলতে পারবো না। তবে আমার মনে হয় ছিটকে পড়ার সময় দেওয়ালে মাথা ঠুকে, না হয় ভাঙা বোতলে এই কাণ্ড ঘটেছে। আমার তখনই মনে হয়েছিলো এ-ধরনের কোন বিপদ হতে পারে।'

'চলো, এবার যাই।'

'চলো।'

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় হঠাৎ এলিজাবেথের খেয়াল হলো টুপিটা ওর মাথায় নেই।

বাইরে বেরিয়ে এসে গ্রেবার দেখলো ছোকরা পরিচারক তুজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্ট্রেচারটা একপাশে নামানো। আশেপাশে ফ্রিটস্ বা মেজরকে কোথাও দেখতে পেলো না। গ্রেবার থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর পেছন থেকে একজন পরিচারকের কাঁধে হাত রাখলো।

'মদ পরিবেশন করে সেই বুড়ো খানসামাকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো ?'

'কে বলুন তো ! অটো না কার্ল ?'

'রোগা হ্যাংলা চেহারা, সারসের মতো লম্বা গলা।'

'ওঃ বুঝতে পেরেছি—অটো।' ছেলেটার চোখতুটো ছলছল করে উঠলো। 'ও মারা গেছে।'

'কি বললে ?'

'মারা গেছে, স্যর। বারে ওর ডিউটি ছিলো। বড় একটা ঝাড়লণ্ঠন সোজা ওর মাথায় ছিঁড়ে পড়ে।'

গ্রেবারের বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠলো। একটু চুপ করে থাকার পর ও বললো, 'আমাদের কাছে ও এক বোতল মদের দাম পাবে।'

'আপনি ইচ্ছে করলে আমার কাছেও দিতে পারেন। কি মদ?'

'ইয়োহানিস্‌বের্গের ককস্‌বের্গ।'

পরিচারক তার পকেট থেকে একটা তালিকা বার করলো। টর্চের আলোয় দেখে আবার তালিকাটা যথাস্থানে রেখে দিলো। 'চার মার্ক। বকশিশ নিয়ে চার-চল্লিশ, স্যর।'

গ্রেবার টাকাটা ওর হাতে গুঁজে দিলো। বুঝলো ওটা ওর পকেটেই যাবে। তবু নিজেকে ওর অনেকটা হালকা মনে হলো। এলিজাবেথের দিকে ফিরে বললো, 'এসো।'

দুজনে এগিয়ে চললো।

চাপা আগুনের রক্তিমাভায় লালে লাল হয়ে রয়েছে দক্ষিণের আকাশ। এলোমেলো বাতাসে থমথম করছে বারুদের গন্ধ। গ্রেবার এলিজাবেথের কাঁধে হাত রাখলো। 'চলো, দেখে আসি তোমাদের বাড়িটার কোন ক্ষতি হয়েছে কি না।'

'তার জন্যে অনেক সময় আছে। বরং চলো, ফাঁকা কোন জায়গায় একটু বসি।'

'চলো।'

আসার পথে প্রথম দিনে আশ্রয় নেওয়া বিমান-আক্রমণের সেই চোরা-কুঠরিটা গ্রেবারের চোখে পড়লো। যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গের মতো ওর মুখটা অন্ধকারে হাঁ হয়ে রয়েছে।

রাস্তাটা দ্রুত পায়ে পেরিয়ে ওরা পার্কের একটা বেঞ্চিতে এসে বসলো।

'তোমার খিদে পেয়েছে?'

এলিজাবেথ মাথা নাড়লো।

'অনেকক্ষণ তো কিছু খাওনি?'

'এখন আমি খেতেই পারবো না।'

ওভারকোটটা খুলে ভাঁজ করে রাখার সময় ঠুংঠাং শব্দ হলো।

'আরে! এ দুটো আবার কোত্থেকে এলো!' গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। ভাবলো নিশ্চয়ই রয়টারের কম্ম। 'দেখেছো কাণ্ড! একেই বলে সৈনিকের কপাল। একেবারে বিশুদ্ধ কনিয়াক।'

এলিজাবেথ দুষ্টুমি করে হাসলো। 'কপাল, না ছাই। আসার সময় তাক থেকে দুটো বোতল পকেটে পুরে নিয়েছো।'

গ্রেবার কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বললো, 'ভুলে যেও না, পাকা সৈনিক কখনও চুরি করে না।'

এলিজাবেথ খিলখিল করে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লো। 'ও বাব্বা! সৈনিকবাবুর আঁতে ঘা লেগেছে তাহলে ?'

'এই, এই এলিজাবেথ···ভালো হচ্ছে না কিন্তু!'

'কি জানি, কার মনে কি আছে। আমি তো আর তোমার সবটা জানি না।'

'জানার দরকারও নেই। তুমি রয়েছো, আমি রয়েছি আর এই মদের বোতল, এ ছাড়া আর কি চাই বলো ?'

এলিজাবেথ গ্রেবারের কাঁধে মাথা রাখলো। 'আর কিচ্ছু চাই না, এর্নস্ট। দাও তোমার বিশুদ্ধ কনিয়াক।'

গ্রেবার দুটো বোতলই পায়ের চাপে খুলে ফেললো। 'এইই সবচেয়ে ভালো, যখন কিছু করার নেই তখন পান করো।'

'এর্নস্ট! কেন তুমি একথা বললে ?' এলিজাবেথের আর্তস্বরে গ্রেবার চমকে উঠলো। 'কেন তুমি আমাকে বুড়ো পরিচারকের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে ? ওর জন্যে আমার ভীষণ মন খারাপ লাগছে, এর্নস্ট।'

এলিজাবেথ এতক্ষণ চুপটি করে গ্রেবারের কোলে মুখ গুঁজে পড়েছিলো। যখন মুখ তুললো সবকিছু যেন আশ্চর্য বদলে গেছে। মাথার ওপরে চাঁদ, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পার্কটা ঠিক যেন পরীর দেশের রূপকথার মতো মনে হচ্ছে। একপাশে হেলে পড়া বিশাল গাছটার দিকে তাকিয়ে ও অবাক হয়ে গেলো। এটা কি আগেও এখানে ছিলো! দেখলো সারা গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে রয়েছে।

'এই, ছাখো!'

'দেখেছি।'

এলিজাবেথ উঠে পায়ে পায়ে গাছটার দিকে এগিয়ে গেলো। এপারে জ্যোৎস্না, ওপারে পাতার আড়ালে অন্ধকার। গ্রেবার নির্নিমেষ চোখে এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পরে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে ও ফিরে এলো। ঠিক যেন আলোকিত মঞ্চ থেকে ফিরে যাওয়া কোন নটিনী, হালকা পায়ে নাচতে নাচতে আবার মঞ্চে ফিরে এলো।

'এখন কি ঋতু জানো ? বসন্ত। ছাখো, ফুলগুলো কি সুন্দর!'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ!' গ্রেবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এইসব গাছেদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। কতদিন দেখছি পাতগুলো সব ঝরে গ্যাছে, ডালপালাগুলো ভেঙেচুরে মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে, তবু কাউকে কোন অভিযোগ করেনি। যখনই সুযোগ পেয়েছে, একটা না একটা শেকড় অন্তত চালিয়ে দিয়েছে মাটির মধ্যে—শুধু ফুল ফোটাবে বলে।'

এলিজাবেথ মুগ্ধ বিস্ময়ে গ্রেবারের মুখের দিকে তাকালো, আর গ্রেবার দেখলো সমুদ্র-ঝিনুকের মতো ওর স্বচ্ছ আয়ত চোখদুটো। কপাল, মসৃণ চিবুক বেয়ে পিছলে পড়ছে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ মাধুরিমা। কুঁড়ির কি যেন গোপন রহস্য নিয়ে আশ্চর্য ফুটে উঠতে চাইছে ওর সারা মুখ। গ্রেবার নিবিড় করে ওকে টেনে নিলো বুকের কাছে, আর তখনি গাছটা মনে হলো অনেক উঁচুতে। তার পল্লবিত শাখাগুলো যেন ঠেকেছে আকাশে আর ফুলগুলো সাজানো রয়েছে ওর মাথার চারপাশে। গ্রেবারের মনে হলো এলিজাবেথ যেন এখন চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করছে ওর বুকের গভীরে।

পনরো

আটচল্লিশ নম্বরে আজ দারুণ অবস্থা। হৈচৈ, তর্জনগর্জনে কান পাতা দায়। ডিমের মতো লম্বা-মাথা আর অন্য দুজন খেলুড়েকে আজ সীমান্তে ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনজনেই ওয়ান-এ সৈনিকের পোশাকে সজ্জিত। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লম্বা-মাথার অবস্থাই সবচেয়ে কাহিল। একে তো ওই বেঁটে গুড়গুড়ে চেহারা, তার ওপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে সারা তাঁবু তোলপাড় করছে। সীমান্তে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে ওর যত ঝাল তাঁবুর অন্যান্য বন্ধুদের ওপর। কুতকুতে চোখে ও রয়টারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার আর কি! ভাঙা পা নিয়ে এখানে বসে বসে আরামসে মজা লুটবেন আর আমি এতবড় একটা পরিবারের কর্তা, আমাকে এখন ফিরে যেতে হচ্ছে সীমান্তে।'

রয়টার কোন কথা বললেন না।

'নাঃ, মাথাটাই শুধু ডিমের মতো দেখতে, ভেতরে কুসুম-জাতীয় পদার্থ বলে কিৎসু নেই! সাধে কি আর ডিম্বু বলি!' ফেল্ডমান এবার বিছানায়

সোজা হয়ে বসলো। 'তখন থেকে খালি বোকার মতো বকবক করছো কেন? তোমাকে যেতে হচ্ছে যেহেতু তুমি ওয়ান-এ সৈনিক। উনিও যদি তোমার মতন ওয়ান-এ সৈনিক হতেন, যেতেন আর তুমি তখন এখানে বসে বসে আরামসে মজা লুটতে, বুঝলে?'

'না, বুঝলুম না।' ডিম্বু খেপে ফায়ার হয়ে গেলো। 'আমাকে যেতে হচ্ছে, তাই আমার যা খুশি তাই বলবো। তোমরা এখানে মজাসে খাবে ঘুমবে আড্ডা মারবে আর আমাদের যেতে হবে, ওটি হবে না।'

রয়টার মুচকি মুচকি হাসলেন, 'যাবার জন্যে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে? থেকে যাও না আর কটা দিন।'

'অসম্ভব! তাছাড়া জীবনে কোন দায়িত্ব আমি কখনও এড়িয়ে যাইনি।'

'বাঃ, তাহলে আর অসুবিধেটা কোথায়?'

'মানে?'

'বলছিলাম জীবনে কোন দায়িত্ব যখন এড়িয়ে যাওনি, তখন কাউকে অভিযোগ না করে সীমান্তে ফিরে যাওয়ার জন্যে বরং তোমার গর্বিতই হওয়া উচিত।'

'একথা আবার আপনাকে কখন বললুম? দেখুন, আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। এখন যদি আপনার নামে রিপোর্ট করি তো আপনাকে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাবে।'

'চলো চলো, আর নাটক করতে হবে না,' খেলুড়েদের একজন ওকে তাড়া দিলো। 'আমাদের সময় হয়ে গ্যাছে।'

'নাটক আমি করছি, না ওরা করছে? প্রত্যেকেরই সহ্যের একটা সীমা থাকে। আমি এত বড় একটা পরিবারের কর্তা, এখন আমাকে সীমান্তে যেতে হবে আর ওনারা এখানে পড়ে পড়ে মদ গিলবেন। তুমি বলো, এ অন্যায় সহ্য করা যায়?'

'আরে রাখো তোমার অন্যায়। আমাদের মতো হেঁজিপেঁজি সৈনিকদের কাছে আবার ন্যায়-অন্যায় কি হে? চলো…' সৈনিকটি রয়টারের দিকে ফিরে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'রিপোর্টের কথা ও এমনি রাগের মাথায় বলেছে, আপনি কিন্তু কিছু মনে করবেন না। সবাই শরীরের যত্ন নেবেন। বিদায়!'

'বিদায়!'

খেলুড়ে দুজন ডিম্বুকে টানতে টানতে ওদের সঙ্গে নিয়ে গেলো। ও তখন ঘামছে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সারা মুখ। দরজার দিকে মাথা ঘুরিয়ে

ও যেন চিৎকার করে কি একটা বলার চেষ্টা করলো, পারলো না। সঙ্গী দুজন ঠেলতে ঠেলতে ওকে সিঁড়ি পার করিয়ে নিয়ে গেলো।

'বেচারির অবস্থা সত্যিই কাহিল।' ফেল্ডমান ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আমাকে শুয়ে থাকতে দেখলেই ও খেপে যেতো।'

'না, সেজন্যে নয়,' হঠাৎ সবাইকে প্রায় চমকে দিয়ে রুমেল কথাটা বললো, কেননা এতদিন পর্যন্ত ওকে কেউ টুঁ শব্দটিও করতে শোনেনি। তাই রয়টার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন। 'আসলে ও এ পর্যন্ত তেইশ মার্ক হেরেছে। নিজে খেলেনি বটে, কিন্তু যতবার ও বাজি ধরেছে ততবারই হেরে গেছে। তেইশ মার্ক আজকের দিনে চাড্ডিখানেক কথা নয়। আমার উচিত টাকাটা ওকে ফিরিয়ে দেওয়া।'

'বেশ তো, তোমার যদি তাই মনে হয় দিয়ে এসো। গাড়ি এখনও ছাড়েনি।'

রুমেল ছুটে বেরিয়ে গেলো।

গ্রেবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। 'কোন লাভ নেই, সীমান্তে গিয়ে আবার জুয়া খেলে উড়িয়ে দেবে।'

রয়টার হাসলেন। 'আমার কিন্তু মনে হয় ও খেপে গেছে ওর বউয়ের জন্যে। ওর ধারণা সীমান্তে চলে গেলেই বউ আবার নষ্টামি শুরু করবে। এবং ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওর বউ ইতিমধ্যেই গর্ভবতী। ও থাকবে সীমান্তে আর ওর বউ পাবে দম্পতি-ভাতা, এটা ওর ঠিক সহ্য নয়।'

'দম্পতি-ভাতা!' গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। 'ওরকম আবার কোন জিনিস আছে নাকি?'

'তুমি আছো কোথায়?' ফেল্ডমান চোখ বড় বড় করে তাকালো। 'মাসের প্রথমেই দুশো মার্কের করকরে নোট এসে পৌঁছবে ওর বউয়ের হাতে, সোজা কথা নয়, বুঝলে? সেই লোভে তো আজকাল অনেকে বিয়ে করছে।'

'ওঃ ভালো কথা, বলতে একদম ভুলেই গেছি···' রয়টার গ্রেবারকে বললেন, 'তোমার বন্ধু বিনডিং তোমার খোঁজ করছিলো।'

'কিছু বলেছে?'

'কি যেন একটা ছোট উৎসব আছে, আজ তোমাকে একবার বিশেষ করে যেতে বলেছে।'

'আর কোন খবর দেয়নি?'

'না।'

রুমেল ফিরে এলো।

ফেল্ডমান জিজ্ঞেস করলো, 'দিয়েছো ?'

'হ্যাঁ।'

রুমেল সোজা টেবিলে গিয়ে আবার তাস বিছিয়ে বসলো।

রয়টার হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখভঙ্গি করলেন। 'কার কি মেজাজ বোঝাই ভার! তারপর···' উনি গ্রেবারের দিকে ফিরলেন। 'তোমার আর কতদিন ছুটি বাকি আছে ?'

'এগারো দিন।'

'এগারো দিন! এখনও অনেক সময় আছে।'

গ্রেবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কাল সকালে মনে হয়েছিলো অনেক দিন, আজ মনে হচ্ছে খুব কম।'

'এখানে এখন কেউ নেই,' এলিজাবেথ দুষ্টুমি করে হাসলো। 'না ফ্রাউ লিজার, না তাঁর ছোট বাচ্ছাটাও।'

'চমৎকার! থাকলে হয়তো একটা রক্তারক্তি কাণ্ডই করে বসতাম। তারপর, কাল রাত্তিরে ডাইনিটা তোমাকে কিছু বলেছে নাকি ?'

'না।' একটু নীরবতার পর এলিজাবেথ ম্লান হাসলো। 'উনি এখন আমাকে একটা নষ্ট মেয়েমানুষ বলেই ধরে নিয়েছেন।'

'কেন ?'

'কেন আবার কি ? কয়েকদিন ধরে তুমি আমার পেছনে ঘুরঘুর করছো, সেটা উনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন।'

'কিন্তু আমরা···'

'মেয়েছেলের অতশত জানার দরকার হয় না। চোখ বুজেই ওরা সব বলে দিতে পারে।'

'আচ্ছা শয়তান তো! ও কোথায় গ্যাছে কিছু জানো ?'

'গ্রামে, পার্টির চাঁদা আদায় করতে। কাল রাত্তিরের আগে আর ফিরছে না।'

'তাই নাকি!' আবেগের চোটে গ্রেবার এলিজাবেথের কপালে একটা চুমুই দিয়ে ফেললো।

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যে আর কাল সারাটা দিন এখনও আমাদের হাতে রয়েছে।'

'কাল তুমি কারখানায় যাবে না ?'

'কাল রোববার, আমার ছুটি। এখনও পর্যন্ত আমরা শনিবার অর্ধেক, রোববারে পুরো ছুটি পাই।'

'ধ্যাৎ, আগে থাকতে বলবে তো ? জানো, দিনের বেলায় তোমাকে দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করে।'

'তাই নাকি ?'

'নিশ্চয়ই ! তুমি বলো, সন্ধ্যে কিংবা রাত্তির ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হয়েছে ?'

এলিজাবেথ চকিতে গম্ভীর হয়ে গেলো। 'হবে কি করে এর্নস্ট, আমরা যে নিশাচর।'

'তুমি একটা প্যাঁচা ! অন্তত এখন যেরকম মুখ করে রয়েছো···'

এলিজাবেথ হেসে ফেললো। 'সত্যি এর্নস্ট, আমিও তোমাকে কোনদিন দিনের বেলায় দেখিনি।'

'আচ্ছা, কাল সকালে রূপোলী রোদে আমরা দুজনে যখন মুখোমুখি দাঁড়াবো, তখন কেমন মনে হবে বলো তো ?'

'সে কালকে ভাবা যাবে। আজ রাত্তিরটা কি করবো তাই বলো ?'

এবার গ্রেবারের গম্ভীর হবার পালা। 'চলো, জার্মানিয়া থেকে ঘুরে আসি।'

'তুমি যাও। আমি আর ও-মুখো হচ্ছি না।'

গ্রেবার হাসলো। 'তাহলে এখানেই কাটিয়ে দাও। এখনও কয়েকটা বোতল রয়েছে। চাই কি আমি তোমাকে কিছু রেঁধেও খাওয়াতে পারি।'

'কিচ্ছু করতে হবে না। যদি একটু স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারো তো দাঁড়াও, নইলে যাও, সোজা কেটে পড়ো।'

'সত্যি, তোমার এই ডাইনি চেড়ীটা না থাকলে এ জায়গাটা মনে হয় ঠিক যেন নন্দনকানন !'

'তাহলে এত ছটফট না করে সুস্থির হয়ে একটু বোসো। বসে বসে পারিজাত তোলো, আমি ততক্ষণ রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি।'

'ও-বাব্বাঃ, তুমি আবার রান্নাও করতে পারো নাকি ?'

'সব পারি ! জিনিসপত্তর থাকলে তোমাকে দেখিয়ে দিতুম। কিন্তু আজকাল কুপন ছাড়া কিচ্ছু পাবার উপায় নেই।'

'চলো দেখি, তোমার ভাঁড়ারে কি কি আছে।'

এলিজাবেথের পেছন পেছনে গ্রেবার রান্নাঘরে এলো। চারদিক বিস্ময়ে

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। ঠিক বিস্ময়ে নয়, কৌতূহলে। যেন এতদিন অজানা একটা গোপন রহস্য লুকনো ছিলো ওর চোখের আড়ালে, আজ তাকে দেখার সুযোগ হলো। কিন্তু কোথাও কিছু নেই বললেই চলে—একটুকরো রুটি, একটু মাখন, দুটো ডিম আর কয়েকটা নষ্ট হওয়া আপেল।

এলিজাবেথ করুণ চোখে গ্রেবারের দিকে তাকালো। 'আর কিছু নেই, এর্নস্ট। আমার কয়েকটা কুপন আছে, দেখি যদি···'

গ্রেবার ওকে বাইরে বার করে এনে রান্নাঘারের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। 'ওগুলো তুমি রেখে দাও, পরে কাজে লাগবে। দেখি, আমি একবার চেষ্টা করে···'

'তুমি এখন আবার কোথায় চেষ্টা করবে ?'

গ্রেবার হাসলো। 'শত্রু-সীমান্তে আমরা বুকে বুক দিয়ে লড়ুয়ে সৈনিক। আমাদের অনেক রকম সুযোগ-সুবিধে আছে। সেসব তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।'

বিনডিং দু হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো। 'তোমার কথাই ভাবছিলাম, এর্নস্ট এসো, ভেতরে এসো। আজ আমার জন্মদিন। তাই কয়েকজন বন্ধুকে আসতে বলেছি।'

গ্রেবার উঁকি দিয়ে দেখলো বাইরের বসবার ঘরটা ধোঁয়া আর মানুষে ভর্তি। তাই চৌকাঠ না মাড়িয়ে ও চট করে ঘুরে দাঁড়ালো। 'কিন্তু আজ যে আমি থাকতে পারবো না, আলফনস্। বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে। শুধু তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে এসেছি।'

'আজ আমি ওসব কোন কথা শুনছি না।'

'না, আলফনস্। বিশ্বাস করো, একখুনি আমাকে যেতে হবে। তোমার খবর পাবার আগেই আমি কথা দিয়েছি।'

'দিয়েছো, ফিরিয়ে নাও। বলবে জরুরী কোন মিটিং ছিলো, কিংবা··· ভেতরে দুজন গেস্টাপোর অফিসার রয়েছে, চাও তো আলাপ করিয়ে দিতে পারি। বলবে বিশেষ একটা কাজে গেস্টাপোয় যেতে হয়েছিলো, কিংবা ওই ধরনের এলতাবাড়ি বেলতাবড়ি একটা কিছু বলে দেবে। অসুবিধে না হলে ওকেও এখানে নিয়ে এসো।'

'অসম্ভব।'

'আজকের দিনে অসম্ভব বলে কিছু নেই, এর্নস্ট। চলো, ভেতরে চলো।'

বিনডিং নাছোড়বান্দা। গ্রেবার দেখলো এর চাইতে সত্যি কথা বলাটাই সবচেয়ে সহজ। 'বিশ্বাস করো আলফনস্, আজ তোমার জন্মদিন আমি জানতাম না। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে কিছু খাবার চাইতে, এবং একখুনি ফিরে যেতে না পারলে খুব অসুবিধে হবে।'

বিনডিং খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'নাঃ তুমি একটি বাঁদর, এবং তোমার আশা আমার অনেকদিন আগেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিলো।'

'রাগ কোরো না, আলফনস্।'

'রাগ আমি করিনি, এর্নস্ট।' হাসতে হাসতে বিনডিং গ্রেবারের কাঁধে চাপ দিলো। 'কিন্তু তোমাকে ঘরের ভেতরটা একবার দেখানোর ইচ্ছে ছিলো। ওখানে একজোড়া ডানা-কাটা পরী রয়েছে। দেখলে তোমার রক্ত টগবগ করে ফুটবে। মেয়ে-বন্দীশিবিরের ওয়ার্ডেন, ইরমার আবার সীমান্তের তাগড়াই সৈনিকদের বেশি পছন্দ করে। ওকে সব সময়েই পাওয়া যাবে। ইচ্ছে করলে আজ রাত্তিরে তুমি ওকে নিয়ে শুতে পারো এবং যতবার খুশি। ট্রেঞ্চের গন্ধে ও নাকি আবার উত্তেজিত হয় সবচেয়ে বেশি।'

'কিন্তু ভাই, আমি যে উত্তেজিত হবো না।'

বিনডিং হাসলো। 'ভয় নেই, ইরমার গায়ে বন্দীশিবিরের গন্ধ নেই।'

'না, সেজন্যে নয়।'

'তাহলে ওটাকে ছাখো, ওই যে কোণের দিকে মোটা মতন ভদ্রলোকের পাশে। কি, কেমন বুঝছো?'

'সত্যি, চোখ ফেরানো যায় না।'

'বলো, চাই? কিছুক্ষণ থেকে গেলে ওকেও দিতে পারি।'

গ্রেবার মাথা নাড়লো।

'মাথা নাড়ছো যে বড়! একবার শুলে তখন আর উঠতে চাইবে না।'

গ্রেবার হেসে ফেললো। 'সত্যি বলতে কি, ওটাকেও আমার শোয়াতে ইচ্ছে করছে না।'

'বুঝতে পেরেছি। তুমি এর চেয়ে সত্যিকারের কোন সুন্দরী জুটিয়েছো। উহুঁ, এতে সংকোচ করার কিছু নেই, এর্নস্ট। চলো, রান্নাঘরে গিয়ে দেখি কি পাওয়া যায়। কিন্তু আমার জন্মদিনে এক গ্লাস অন্তত তোমাকে পান করতেই হবে। কি, রাজী তো?'

'রাজী।'

ফ্রাউ ক্লাইনার্ট দাঁড়িয়ে ছিলো রান্নাঘরের ভেতরে। বিনডিং ওকে বললো,

'খাবারের সুন্দর করে একটা প্যাকেট করে দিন। আমরা ততক্ষণে ভাঁড়ার থেকে একবার ঘুরে আসছি। এসো, এর্নস্ট।'

ভাঁড়ার তো নয়, যেন মণিহারীর দোকান। থরে থরে সাজানো রয়েছে টিনের খাবার—ফ্রান্স থেকে আসা কাছিমের ডিম, হল্যাণ্ডের শাকসব্জী, চোকেস্লোভাকিয়ার মটরশুঁটি, পোল্যাণ্ডের শুয়োরের দাবনা, ডেনমার্কের মাখন আর পনির। নানা ধরনের ফলের রস। প্রত্যেকটা থেকে দুটো করে টিন বিনডিং আলাদা করে সরিয়ে রাখলো।

বিনডিং গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলো। 'স্ট্রবেরীর এই টিনটাও সঙ্গে নিয়ে যাও। বিশেষ সময়ে মেয়েরা আবার এই জিনিসটা বড্ড বেশি পছন্দ করে।'

এলিজাবেথের কথা মনে পড়তেই ওর রান্নাঘরের দৃশ্যটা গ্রেবারের চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

ভাঁড়ারের অন্যদিকে বোতলের মিছিল। বিনডিং বললো, 'যা খুশি এখান থেকে বেছে নাও।'

'না না, তুমি বেছে দাও,' গ্রেবার আপত্তি করলো। তাছাড়া মদের কথা ও তেমন করে ভাবেনি। 'জানো তো বাঁশবনে ডোম কানা, এখন আমার অবস্থাও তাই।'

'বহুৎ আচ্ছা! আমার সবচেয়ে প্রিয় স্যাম্পেন কি জানো তো? ক্যামেল, পুরনো ক্যামেলই সবচেয়ে বিশ্বস্ত। খেয়ে দেখো, যদি ভালো লাগে তখন আমার কথা মনে কোরো।'

হরেক রকমের বোতলের মধ্যে থেকে কয়েকটা বোতল বেছে বেছে বিনডিং টেবিলের ওপর রাখলো। তারপর বোতলকটা বগলদাবা করে রান্নাঘরে ফিরে এলো। 'ফ্রাউ ক্লাইনার্ট, এগুলোর আর একটা আলাদা প্যাকেট করে দিন। বোতলের ফাঁকে ফাঁকে কাগজ গুঁজে দেবেন যাতে ভেঙে না যায়। আর ভাঁড়ারঘরে কয়েকটা টিনে আলাদা করে রাখা আছে, ওগুলো খাবারের প্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিন। আর শুনুন, আধ পাউণ্ড সবচেয়ে ভালো বিন-কফিও দিয়ে দেবেন। আর কি চাই, এর্নস্ট?'

'কিছু না। এবার এগুলোকে বয়ে নিয়ে যেতে পারলে হয়।'

'সে তুমি যাই বলো এর্নস্ট, আলফনস্ কিন্তু কোন কিছুর আধাআধি পছন্দ করে না, আর তার জন্মদিনে তো নয়ই। বিশেষ করে তার স্কুল-সহপাঠীর বেলায় আদৌ না।' বিনডিং-এর চোখদুটো এখন পাখির খাঁচার সামনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা শিশুর মতো মনে হচ্ছে। বিনডিং

গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো, 'কফিটা কাল সকালের জন্যে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, কাল রোববার আর আজ একদম তাঁবুতে ফিরবে না। এবার চলো, গেস্টাপোর ছুজন বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। ঠিক ছু মিনিট। যা বলবার আমি বলবো, তুমি কিন্তু কিচ্ছু বলবে না। তারপর আমরা ছুজনে শুধু এক গ্লাস করে পান করবো।'

'না এর্নস্ট, রান্নাঘরে এসব রাখা ঠিক হবে না। অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। ফ্রাউ লিজার যদি দেখতে পান, ঠিক আমার নামে নালিশ করে আসবেন।' এলিজাবেথ খিলখিল করে হাসলো। 'তারপরই হয়তো দেখবে কালোবাজারীর তালিকায় আমার নাম উঠে গ্যাছে।'

'তাই তো, ও কথা আমার একবারও মনে হয়নি।' গ্রেবার উঠে সিগারেটটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিলো। 'তাহলে এক কাজ করো, ছুদিন ধরে আগে খাই। তারপর যা থাকবে তোমার ওই ডাইনি বুড়ীটাকে দিয়ে দেবে।'

'আচ্ছা পেটুক তো! এত খাওয়া যায় বুঝি? তাছাড়া ফ্রাউ লিজার কারুর কিছু নেন না। নিজের রেশন কুপনে যা পাওয়া যায় তাতেই উনি চালিয়ে নিতে ভালোবাসেন এবং তার জন্যে গর্ববোধও করেন।'

'ভারি বয়েই গ্যালো, দেবো না। তোর গর্ব তোর কাছেই থাক!'

গ্রেবারের ছেলেমানুষী দেখে এলিজাবেথ হেসে ফেললো। 'সবচেয়ে ভালো, এই ঘরে কোথাও লুকিয়ে রাখা।'

'কেন, তোমার বইয়ের তাকের পেছনে, যেখান থেকে সেদিন গ্লাসছুটো বার করেছিলে?'

'ঠিক বলেছো।' এলিজাবেথ খুশিতে চলকে উঠলো।

'কিন্তু ডাইনিটা যদি এসে গন্ধ পায়?'

'দরজা বন্ধ থাকবে। যদি কোথাও যাই চাবি দিয়ে যাবো।'

'ওর কাছে যদি অন্য কোন চাবি থাকে?'

এলিজাবেথ যেন নিভে গেলো। 'থাকতেও পারে, অসম্ভব কিছু নয়।'

'আরে ধ্যাৎ, ছাড়ো ওসব। আগে তো খাই, তারপর কালকের কথা কালকের বিকেলে ভাবা যাবে। তার আগে এসো বরং জিনিসগুলো সব টেবিলে এক জায়গায় সাজিয়ে ফেলি।'

'টিনগুলোও?'

'হ্যাঁ, টিনগুলোও। ওগুলো এখন খোলার দরকার নেই। যা রাখা যাবে না সেইগুলো আগে খেয়ে ফেলি।'

'আর বোতলগুলো ?'

'বোতলগুলোও এর পাশে সাজিয়ে রাখো। দেখলে যেন মনে হয় কোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া জন্মদিনের উপহার।'

এলিজাবেথ বাতাসে ঢেউ তুলে খিলখিল করে হাসলো। 'কার ?'

'কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। ধরে নাও এই মুহূর্তটার জন্মদিনে পাওয়া।'

টেবিলটা ওরা টেনে আনলো ঘরের মাঝখানে। তারপর প্যাকেটের জিনিসপত্তর সব নামিয়ে মন্দিরের চূড়ার মতো সুন্দর করে সাজালো। দু পাশে রাখলো স্লিভোভিৎস, কনিয়াক, ক্যুমেলের বোতলগুলো। শুধু স্যাম্পেনের একটা বোতল খুলে গ্রেবার দুটো গ্লাস ভর্তি করে নিলো।

'সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না ?' এলিজাবেথ টেবিলের পাশ থেকে সরে এলো। 'আজ আমাদের কিসের উৎসব বলো তো ?'

গ্রেবার একটা গ্লাস ওর দিকে এগিয়ে দিলো। 'সবকিছুর। আমাদের তো আর আলাদা আলাদা করে উৎসব পালন করার সময় নেই। তাই এই মুহূর্তে আমরা সবকিছুর উৎসব পালন করছি, বিশেষ করে আমরা এখানে রয়েছি আর আমাদের হাতে রয়েছে এখনও দুটো দিন।'

গ্রেবার উঠে এলিজাবেথকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো। অনুভব করলো ওর কবোষ্ণ শরীরের স্নিগ্ধ মাধুরিমা। মনে হলো দ্বিতীয় জীবন যেন উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার বুকের ভেতরে, যা তার নিজের জীবনের চেয়ে রঙিন, যা আরও সহজ—যেখানে সীমান্ত নেই, না অপরাধবোধের কালো ছায়া; যেখানে অতীত নেই অনাগত নেই, কেবল বর্তমান আর এই মুহূর্তের নিটোল একটা অস্তিত্ব !

জানলাগুলো সব হাটহাট করে খোলা। গত রাত্রের আঘাতে জানলার কয়েকটা শার্সি ভেঙে গিয়েছিলো, এলিজাবেথ আবার সেগুলো কালো কাগজে তালি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। জানলার উজ্জ্বল রঙিন পর্দাগুলো এখন বাতাসে কাঁপছে, মাঝে মাঝে নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠছে।

ওরা আলো জ্বালেনি। থেকে থেকে নিচের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে ভারি বুটের আওয়াজ। কোথায় যেন রেডিও বাজছে। ওপাশের ফ্ল্যাটে

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ আর ককিয়ে ওঠা বাচ্ছার কান্না শোনা গেলো। দূরে কে যেন কাশলো।

এলিজাবেথ ফিসফিস করে বললো, 'সারা শহর এবার ঘুমতে চললো।'

বিছনায় ওরা তুজন পাশাপাশি শুয়েছিলো। টেবিলে তখনও কিছু অভুক্ত খাবার পড়ে রয়েছে, কনিয়াকের অর্ধেক খালি বোতলটা নামানো রয়েছে খাটের নিচে। স্যাম্পেনের তুটো বোতল ঠাণ্ডা হবার জন্যে রাখা হয়েছে বেসিনের জলে।

গ্রেবার তার গ্লাসটা বিছানার পাশে ছোট টেবিলটার ওপর নামিয়ে রাখলো। অন্ধকারে মনে হলো ও যেন শুয়ে রয়েছে কোন ছোট্ট শহরে। দূর থেকে ভেসে আসছে পাহাড়ী ঝরনার গান আর মর্মরিত পাতার গুঞ্জন। রাস্তার ওপারে কে যেন করুণ সুরে বেহালা বাজাচ্ছে।

এলিজাবেথ বললো, 'একটু পরেই চাঁদ উঠবে, দেখো।'

হ্যাঁ, একটু পরেই চাঁদ উঠবে—গ্রেবার ভাবলো। আর তার কোমল জ্যোৎস্না চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করবে ওদের রক্তে।

জানলায় আবছা একটা আলোর রেখা পড়লো। রেখাটা কাঁপতে কাঁপতে আবার হারিয়ে গেলো।

'কি ব্যাপার!' এলিজাবেথ উঠে অন্ধকারেই চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে নিলো, তারপর জানলার সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালো। কোন কিছুতে নিজেকে ঢেকে নেবার কথা ওর মনেই হয়নি। আবছা আঁধারে এখন দেখা যাচ্ছে ওর অনন্য দেহরেখা। 'রাস্তার ওপারে চোরা-লণ্ঠন নিয়ে লোকজন কাজ করছে। কোদাল শাবল দিয়ে ওরা কি যেন খুঁড়ছে।'

'সকাল থেকেই ওরা খোঁড়াখুঁড়ি করছে।'

'কই, আমি দেখিনি তো! তোমার কি মনে হয় এখনও কেউ ওখানে চাপা পড়ে রয়েছে?'

'না। ওরা বিজলিবাতির তার ঠিক করছে।'

'তাই হবে।' এলিজাবেথ ফিরে এলো। 'জানো, বিমান-আক্রমণের পর মাঝে মাঝে আমার ভীষণ ইচ্ছে করে—আমি বেশ ফিরে গিয়ে দেখবো এই বাড়িটা পুড়ে গ্যাছে। এই ঘর, আসবাব, জামাকাপড়, স্মৃতি, সব সব···আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না, এর্নস্ট।'

'এলিজাবেথ!'

'শুধু আমার বাবার স্মৃতি ছাড়া আর যা কিছু সব—যা কিছু ভয়ের, যা বিষণ্ণ, যা কিছু আমি ঘৃণা করি। আমার মনে হতো বাড়িটা যদি জ্বলে পুড়ে

শেষ হয়ে যেতো, হয়তো আমি আবার নতুন করে শুরু করতে পারতাম।'

গ্রেবার ওর দিকে তাকালো। বাইরে থেকে মরা আলোর রেখা এসে পড়েছে ওর কাঁধে। শাবল গাঁইতির কর্কশ শব্দ ভেসে আসছে।

'বেসিনের বোতলটা দাও না, লক্ষ্মীটি।'

'স্যাম্পেন ?'

'হ্যাঁ।'

'এখন থাক না।'

'না এলিজাবেথ, যতক্ষণ পর্যন্ত না বেহেড মাতাল হই, এসো, আমরা দুজনে পান করি। স্যাম্পেনের দুটো বোতলই খুলে ফ্যালো। তাছাড়া কখন কোন্ মুহূর্তে বিমান-আক্রমণ হবে কেউ বলতে পারে না। কার্বন ডিঅক্সাইডের জন্যে এগুলো তখন দারুণ ক্ষতি করতে পারে।'

'তাই নাকি ?'

'নিশ্চয়ই। ওগুলো তখন এক-একটা হাত-বোমার চেয়ে কম মারাত্মক নয়।'

'ওরে বাব্বা !' এলিজাবেথ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বোতলদুটো নিয়ে এলো। 'গ্লাস চাই নাকি ?'

'তুমি একটা কিৎসু জানো না। গ্লাস ছাড়া স্যাম্পেন জমেই না। দস্তুর মতো প্যারিস থেকে শিখে এসেছি, জানো ?'

এলিজাবেথের আয়ত চোখের মণিদুটো আরও বড় হয়ে উঠলো। 'ওমা, তুমি আবার প্যারিসে ছিলে নাকি ?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের গোড়ার দিকে।'

এলিজাবেথ গ্লাসদুটো রেখে ওর কোলের কাছে গুটিয়েসুটিয়ে শুলো। গ্রেবার সাবধানে বোতল খুলে গ্লাসে ঢাললো। উপচে উঠলো ফেনা। এলিজাবেথ একটা গ্লাস তুলে নিলো। 'কতদিন তুমি প্যারিসে ছিলে ?'

'দিন পনেরো।'

'ওরা তোমাদের খুব ঘেন্না করতো ?'

'জানি না। হয়তো করতো। কেননা অনেক কিছু দেখার সুযোগ আমরা পাইনি। অবশ্য দেখতেও আমরা চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধ জয় করতে। তারপর খোলা রাস্তার সামনে বিদেশের কোন কাফেতে বসে পান করা···বুঝতেই পারছো, তখন আমার কাঁচা বয়েস।'

'ইশ্, এমনভাবে বলছো যেন কতদিন আগেকার ঘটনা !'

'জানো, আমার কাছে কিন্তু সত্যিই তাই মনে হয়।'

পান করার আগে এলিজাবেথ গ্লাসটা তুলে ধরলো জানলায় প্রকম্পিত আলোর সামনে। গ্লাসে ঝিকমিক করে উঠলো সফেন মদিরা। গ্রেবার দেখলো ওর নগ্ন কাঁধ, ঢেউ-খেলানো চূর্ণ কুন্তল আর আধো আলো-ছায়ায় ওর মসৃণ পিঠের দীর্ঘ ঢালু রেখা। ভাবলো, ও এখন ভুলে গেছে ওর পোশাক, ওর কাজ, এমনকি সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার কথা। হয়তো ও এখন নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে জানলার ওপারে নিষুত রাতের নিবিড় প্রশান্তিতে, রক্তের অন্ধ উত্তেজনায়; স্খলিত বিচ্ছিন্নতা এমনকি মৃত্যুলীন মানুষের অন্তিম আর্তনাদেও। তবু এই বিস্মৃতি, এই হতাশ নির্জনতার ও যেন কেউ নয়, যেন কোনদিন কেউ ছিলোও না! যেন সবকিছু নির্মম দু হাতে ও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে।

এলিজাবেথ ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিলো। 'জানো, এখন মনে হচ্ছে সেদিন আমিও তোমার সঙ্গে ছিলাম প্যারিসে।'

গ্রেবার হাসলো। 'যুদ্ধের পরেও আমরা ওখানে যেতে পারি।'

'ওরা আমাদের ঢুকতে দেবে?'

'কেন নয়? আমরা তো আর প্যারিসের কোন ক্ষতি করিনি।'

'কিন্তু ফ্রান্সে?'

অন্যান্য দেশের তুলনায় সে কিছুই নয়। আমরা খুব অল্প কয়েকদিনই ওখানে ছিলাম।'

'তবু যতটুকু ক্ষতি করেছো, তার জন্যে দীর্ঘদিন ওরা আমাদের ঘৃণা করবে।'

গ্রেবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'হ্যাঁ, যুদ্ধের এইসব ক্ষত মানুষের জীবন থেকে মুছে ফেলতে অনেক—অনেক দিন সময় লাগবে।'

'আমরা অন্য কোথাও যেতে পারি। এমন কোন দেশে যেখানে কোন ক্ষতি হয়নি।'

'সেরকম দেশ খুব কমই আছে।' গ্লাসের বাকি পানীয়টুকু গ্রেবার এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলো। 'আমার গ্লাসটা ভর্তি করে দাও না লক্ষ্মীটি।'

এলিজাবেথ দুটো গ্লাসই ভর্তি করে দিলো। 'তুমি আর অন্য কোথায় ছিলে?'

'আফ্রিকায়।'

'অনেক দিন?'

'অনেক দিন।'

'ওখানে অনেক কিছু দেখেছো, তাই না ?'

'হ্যাঁ। তবে ছোটবেলায় যেভাবে দেখার স্বপ্ন দেখতাম সেভাবে নয়।'

এলিজাবেথ খালি বোতলটা খাটের নিচে নামিয়ে রাখলো। ওর মসৃণ পিঠের ওপর দিয়ে পিছলে গেলো অস্পষ্ট আলোর রেখা। এই মুহূর্তে গ্রেবারের কাছে সবকিছু কেমন যেন অবাস্তব মনে হলো। শুধু আকণ্ঠ মদিরার জন্যেই নয়, ওর মনে হচ্ছে ঝরঝর ঝরনার মতো শব্দগুলো যেন এখন গোধূলি আলোয় কাঁপছে—যে শব্দগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন, আর অর্থবহ শব্দগুলো সম্পূর্ণ শব্দহীন। ওর মনে হচ্ছে নাম-না-জানা স্রোতে শব্দগুলো যেন নিঃশব্দে ভেসে চলেছে।

'আর কোথায় ছিলে ?'

হ্যাঁ, ঠিক যেন তাই পাল-তোলা নৌকার মতো শব্দগুলো এখন নিঃশব্দে ভেসে চলেছে কোন অজানার দেশে।

'এর্নস্ট ?'

'উঁ !'

'আর কোথায় ছিলে বলবে না ?'

'হল্যাণ্ডে। সে আরও আগে, যুদ্ধের একদম গোড়ার দিকে। জানো, নিচু নিচু আর চওড়া হ্রদের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন বজরা করে বেড়াতাম, তখন মনে হতো ঠিক যেন সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে বেড়াচ্ছি। বেলা-শেষের সূর্য ডুবে গেলে আকাশে এমন চমৎকার একটা রঙ হতো, গোধূলি আলোয় তখন সবকিছু আশ্চর্য রঙিন মনে হতো। লাল, নীল, হলুদ ছিট-দেওয়া প্রজাপতিগুলো উড়তো···'

যুদ্ধ শেষ হলে আমরাও ওখানে যেতে পারি। আমরা বেশ সাদা রুটি, পনির আর কোকো খাবো। তারপর সন্ধ্যেবেলায় হ্রদে পানসি চড়ে ঘুরে বেড়াবো।'

গ্রেবার ওর দিকে করুণ চোখে তাকালো। ভাবলো আজকের দিনে সুখের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার স্থূল ভাবনা কত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ও দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'যুদ্ধের পরেও ওখানে যাওয়া যাবে না, এলিজাবেথ। ওখানে আমরা ধ্বংস করতে আর কিছু বাকি রাখিনি। চোখের পলকে হল্যাণ্ডকে জ্বালিয়েপুড়িয়ে শ্মশান করে দিয়েছি, রোটার ডাম গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিয়েছি ধুলোর সঙ্গে। এসব আমি নিজের চোখে দেখেছি। একটা অক্ষত বাড়িও আমার চোখে পড়েনি। ওখানে মানুষের জীবন নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলেছি, শুধু মৃতের সংখ্যাই ছিলো ত্রিশ হাজার। আমার ভয়

হচ্ছে এলিজাবেথ, ওরা আমাদের কোনদিনও ক্ষমা করতে পারবে না।'

এলিজাবেথ মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো। তারপর হঠাৎ খালি গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে। গ্লাসটা আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেলো। 'আমরা কোথাও যেতে পারি না, কোথাও না…' আর্ত কান্নায় করুণ হয়ে উঠলো এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর। 'অথচ কি বোকার মতো স্বপ্ন দেখি! আমরা বন্দী, আমরা নিঃস্ব, রিক্ত, জঘন্য—আমরা কোথাও যেতে পারি না!'

গ্রেবার সোজা হয়ে বসলো। বাইরের ফ্যাকাশে আলোয় দেখলো ওর কালো চোখের মণিদুটো কাচের মতো চিকচিক করছে। 'উঁহু, নোড়ো না। আলো জ্বেলে কাচের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে না নিলে পা কেটে যাবে। দাঁড়াও, তার আগে জানলাটা বন্ধ করে দিই।'

গ্রেবার সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালো। জানলা বন্ধ করে আলোটা জ্বালতেই এলিজাবেথ চমকে উঠলো। সলজ্জ ভঙ্গিতে চট করে নৈশবাসটা টেনে নিলো খোলা বুকের ওপর। 'এদিকে কিন্তু একটুও তাকাবে না। আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'আহা, লজ্জা করে না বুঝি? এভাবে এর আগে আমি আর কখনও শুইনি।'

'তোমাকে কিন্তু তখন আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিলো।' গ্রেবার দুষ্টুমি করে হাসলো। 'যাই বলো, তোমাকে কিন্তু এই পরিবেশে মানায় না।'

এলিজাবেথ ঠোঁট ওলটালো। 'কোথায় মানায় আমি নিজেই জানি না।'

'আমিও না। তবে আর যেখানেই হোক, সুন্দর সাজানো কোন রূপসীর ঘরে তো নয়ই।' একটু নীরবতার পর গ্রেবার বললো, 'জানো, প্রথম দিন তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় অসহায়।'

'এখনও তাই, এর্নস্ট।'

'অসহায় আমরা সবাই, এলিজাবেথ। তবু যেভাবেই হোক এ অবস্থা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবেই।'

খাবারের প্যাকেটে মোড়া খবরের কাগজটা তখনও পড়েছিলো টেবিলের নিচে, তার খানিকটা মেঝেতে পেতে বাকি কাগজটা ন্যাতার মতো পাকিয়ে ভাঙা কাচের টুকরোগুলো ঝেঁটিয়ে আনলো কাগজের ওপর। কাগজটা মোড়ার সময় দেখলো শিরোনামায় লেখা রয়েছে: জরুরী প্রয়োজনে ফুয়রার তাঁর যুদ্ধ-সীমান্তরেখা সংক্ষিপ্ত করেছেন। ওরেলের চারপাশে এখন তুমুল

লড়াই চলেছে। গ্রেবার ঠোঁট চেপে হাসলো। বাইরে থেকে ভেসে আসছে শাবল গাঁইতির শব্দ আর লোকজনদের চাপা কণ্ঠস্বর। যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তীব্র আলোয় ঘরের ভেতরটা মনে হলো যেন অন্যরকম। টেবিলে সাজানো রয়েছে বিনডিং-এর দেওয়া খাবারের টিন আর মদের বোতলগুলো। ঠিক তখুনি গতকালের কয়েকটা স্মৃতি ওর মনে দ্রুত ভিড় করে এলো। এই মুহূর্তে ভেবে পেলো না ভাঙা কাচের টুকরোগুলো ও কোথায় ফেলবে।

এলিজাবেথ হাসলো। 'ওই কোণেই রেখে দাও। পরে আমি ফেলে দেবো।'

'কোথায় ফেলবে ?'

'তার জন্যে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

মুগ্ধ চোখে গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'এই, অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছো ?'

'তোমাকে।'

'ভাবছো আমি প্রতিদিন কেমন পালটে যাচ্ছি, তাই না ?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। প্রতি দিন নয়, প্রতি মুহূর্তে তুমি যেন পালটে যাচ্ছো!'

'আর তুমি ?'

'আমি ? হ্যাঁ, আমিও।'

'তাহলে তো ভালোই।'

'আর ভালো না হলেও, এখন আর আমাদের কিছু এসে যায় না।'

এলিজাবেথের স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো এবার আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। 'সত্যিই কি কিছু এসে যায় না, এর্নস্ট ?'

'না।'

এলিজাবেথ আলো নিভিয়ে জানলাটা খুলে দিলো। 'এই দ্যাখো, দ্যাখো কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে!'

স্বচ্ছ নয়, চাঁদের বৃত্তের চারপাশটা কেবল দগদগে গভীর ক্ষতের মতো লাল হয়ে রয়েছে।

গ্রেবার খাটের নিচে থেকে কনিয়াকের বোতলটা তুলে নিলো।

দুজনে অনেকক্ষণ পাশাপাশি চুপচাপ শুয়ে রইলো। একটু একটু করে চাঁদ উঠলো মাথার ওপরে। বিছানায় এসে পড়েছে তার স্নিগ্ধ একফালি মদির জ্যোৎস্না। সেদিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি বলো তো, আমরা কি—সুখী, না অসুখী ?'

'তুটোই।' পাশ ফিরে গ্রেবার তু হাতে মালার মতো ওর কাঁধটা নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো। 'অন্তত আজ এই প্রথম কথাটা আমার মনে হচ্ছে, এলিজাবেথ। একমাত্র পাথর ছাড়া আজকের দিনে অবিমিশ্র আবিল সুখী বোধহয় কুকুরেরাও নয়।'

'এবং তাতেও আমাদের কিছু এসে যায় না, বলো?'

'না।' গ্রেবার দেখলো হালকা জ্যোৎস্নায় ঘরের ভেতরটা এখন ভরে উঠেছে। এলিজাবেথের মুখের দিকে তাকিয়ে ও চুপ করে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'কিছুই এসে যায় না এলিজাবেথ, যেহেতু আমরা এখনও বেঁচে রয়েছি।'

ষোলো

পরের দিন ভোরে কি ভেবে গ্রেবার আঠারো নম্বরে এসে হাজির হলো। বাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই ও চমকে উঠলো। ভগ্নস্তূপের মধ্যেও বাড়িটার যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। স্নানের পাত্রটা নেই, সিঁড়িগুলো তকতক করছে। বাগানের দিকে উঠোনের অনেকটা অংশ পরিষ্কার করা। দেওয়ালের পাশ দিয়ে ভেতরে প্রবেশের সরু একটা পথ দেখা যাচ্ছে। গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। মনে হলো সামরিক বাহিনীর লোকজনরা যেন সবে পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগিয়েছে।

দেওয়ালের পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে ও আধভাঙা একটা ঘরে এসে প্রবেশ করলো। লাইটার জ্বেলে ভালো করে দেখতেই ঘরটা ও চিনতে পারলো। এটা ওদের ভাঁড়ার ঘর। অন্য ঘরের তুলনায় ছাদটা একটু নিচু, কিন্তু ভাঁড়ার থেকে ভেতরের ঘরে যাবার যে একটা পথ ছিলো! এখন তো আর দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ওর পেছনে কে যেন বললো, 'কে, কে ওখানে? শিগ্‌গির বেরিয়ে এসো।'

ভেতরে গমগম করে উঠলো সেই ভরাট কণ্ঠস্বর। গ্রেবার চকিতে ফিরে তাকালো। অন্ধকারে কাউকে দেখতে পেলো না। গ্রেবার বাইরে বেরিয়ে এলো। দেখলো ক্রাচ্ বগলে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাধারণ পোশাকের ওপর শতছিন্ন একটা সামরিক ওভারকোট পরা। গ্রেবারের

আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ও জিজ্ঞেস করলো, 'কি করছো এখানে ?'

'আমি এখানে থাকি। আপনি ?'

লোকটা ধমকে উঠলো, 'বাজে বোকো না। আমি ছাড়া এখানে আর কেউ থাকে না। কি ঝাড়ার মতলবে এখানে ছোঁকছোঁক করছো শুনি ?'।

'আপনি কিন্তু মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। এটা আমাদের বাড়ি। আমার বাবা-মা এখানে থাকতেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে আমিও থাকতাম। কি, এবার খুশি হয়েছেন তো ?'

'না, খুশি হইনি।' লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো। 'কোন প্রমাণ আছে ?'

'কি হয়েছে অটো ?' খোঁড়া লোকটাকে কে যেন জিজ্ঞেস করলো।

গ্রেবার দেখলো গাঁইতি হাতে ষণ্ডা-মার্কা একটা লোক বাগানের ওদিক থেকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে বাচ্চার হাতধরা একজন বয়স্ক মহিলা।

ওদের এগিয়ে আসতে দেখে অটোর তড়পানি আরও বেড়ে গেলো। 'আর বলো কেন। কিছু ঝাড়ার মতলবে লোকটা এখানে ঘুরঘুর করছিলো। ধরে ফেলেছি, এখন বলছে কিনা এটা ওদের বাড়ি।'

গাঁইতি হাতে লোকটা গ্রেবারের দিকে কটমট করে তাকালো। 'আর কিছু বলার আছে ?'

'না।'

'তাহলে সোজা এখান থেকে দূর হয়ে যাও। আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনবো। তার মধ্যে যদি চলে না যাও, মাথাটা দু ফাঁক করে দেবো। এক···'

গ্রেবার এক লাফে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপর। লোকটা ছিটকে পড়লো মাটিতে। গ্রেবার ওর হাত থেকে গাঁইতিটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। 'এবার যদি কোন ট্যাঁ-ফোঁ করতে শুনি তো এক ঘুষিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।'

লোকটা ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো। নাক দিয়ে তখন ওর দরদর করে রক্ত ঝরছে। এবার বয়স্ক মহিলা ভয়ে ভয়ে গ্রেবারের দিকে দু পা এগিয়ে এলো। 'তুমি রাগ কোরো না বাবা, আমরা এখানে থাকি···'

'দেখুন, রাগ আমি করিনি। আমার বাবা-মা এখানে থাকতেন, তাই আমি দেখতে এসেছিলাম।'

অটো জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যস, আর কিছু নয় ?

'আবার কি ?'

'চুরি-টুরি…'

'এখানে চুরি করার কি আছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !'

মহিলা বললো, 'অনেক কিছু আছে বাবা, অন্তত যাদের কিছু নেই।'

গ্রেবার নরম হলো। 'দেখুন, আমি সৈনিক। কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছি, আবার চলে যাবো। বাইরে একটা চিঠি ছিলো দেখেননি ?'

'ওটা কি আপনার ?' অটো অবাক হলো।

'হ্যাঁ।'

অটোর চোখের ভাষাই এখন বদলে গেছে। 'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা, কমরেড। পুলিসের চোখে আমরা সন্দেহজনক। তাই এখানে গোপনে আশ্রয় নিয়েছি।'

এবার অবাক হবার পালা গ্রেবারের। কয়েকটা প্রশ্ন একসঙ্গে দ্রুত ভিড় করে এলো ওর মনে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো। 'আপনারা কি নিজেরাই এই জায়গাটা খুঁড়ে পরিষ্কার করেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কোন মৃতদেহ খুঁজে পাননি ?'

'না।'

'আপনি ঠিক জানেন ?'

'হ্যাঁ। যদিও এ ধ্বংসস্তূপটা বেশ কিছুদিন আগের তবু আপনাকে সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এর নিচে কোন মৃতদেহ নেই।'

গ্রেবারের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'আমি শুধু এইটাই জানতে চেয়েছিলাম।'

'এটুকু জানার জন্যে রক্তারক্তি কাণ্ড করার কোন দরকার ছিলো না।' গ্রেবার দেখলো জামার হাতায় নাক মুছতে মুছতে লোকটা মিটমিট করে হাসছে।

গ্রেবার হাসলো। 'এইটুকু জানার জন্যেই হয়তো আমার মাথাটা দু ফাঁক হয়ে যেতে পারতো।'

ফিরে আসার সময় গ্রেবার বাড়িটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। দেখলো বাগানের এক কোণে সদ্য-বাঁধা একটা ডেরা। স্নানের পাত্র, ছেঁড়া কাপড়, টুকরো কাঠকুটো, টিনের পাত্র, তোবড়ানো একটা সুট-কেস সাজানো রয়েছে তাঁবুর সামনে। গ্রেবার মনে মনে ভাবলো, এখানেও শুরু হয়ে গেছে জীবন-প্রবাহ। রাত্তিরে বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে আসা একটা রিক্ত পরিবার। গ্রেবার দেখলো বাচ্চাটা টলটলে পায়ে সেই বেড়ালটা ধরার

চেষ্টা করছে। মৃত্যুকে অতিক্রম করে আসা নিরুদ্বিগ্ন তন্ময় একটা শিশু।

আনমনে পথ হাঁটছিলো গ্রেবার। কে যেন পেছন থেকে ওকে ডাকলো, 'এর্নস্ট !'

গ্রেবার ঘুরে দাঁড়ালো। দেখলো ক্রাচে ভর দিয়ে একজন ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। প্রথমে ও ভাবলো বোধহয় অটো। কিন্তু এ রাস্তায় ও আসবে কেমন করে! কাছে আসতেই ও মুটসিগ্‌কে চিনতে পারলো। ওর ছেলেবেলার সহপাঠী।

'কার্ল, তুমি !' গ্রেবার বিস্মিত হলো। 'তুমি এখানে কোত্থেকে ?'

'এখানেই তো রয়েছি। হুঁ, তা প্রায় মাস ছয়েক হলো।'

ওরা পরস্পরের দিকে স্তব্ধ চোখে তাকালো।

'তোমার অবাক লাগছে, তাই না এর্নস্ট ?'

গ্রেবার কি বলবে ভেবে পেলো না। করুণ চোখে ওর ক্রাচ্‌টার দিকে তাকিয়ে রইলো। মুটসিগ্‌ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আর কতদিন ছুটি আছে, এর্নস্ট ?'

'এখনও কয়েকদিন বাকি আছে।'

'তাহলে চলে এসো না একদিন সময় করে। বের্গমানও এখানে রয়েছে। বগল থেকে ওর দুটো হাতই কেটে বাদ দিতে হয়েছে।'

'কোথায় রয়েছো ?'

'শহর-হাসপাতালে। ব্যবচ্ছেদ বিভাগ। ঢুকেই বাঁদিকে।'

'যাবো একদিন।'

'সত্যি ?'

'ঠিক।'

'অনেকেই আমরা ওখানে আড্ডা দিই। বিশেষ করে আমার ঘরে··· দেখো, তোমার খুব একটা খারাপ লাগবে না।'

'যাবো, কার্ল।'

ওরা আবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। তিন বছর দেখা হয়নি, অথচ যা-কিছু বলার ছিলো সব যেন তিন মিনিটেই বলা হয়ে গেলো।

'এর্নস্ট !'

'কার্ল !'

ওরা পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

'সিয়েবের্ত মারা গ্যাছে, তুমি জানতে ?'

'না, কার্ল।'

'দেড় মাস আগে। আর লেনেরের খবর জানো ?'

'না।'

'লেনের আর লিনগেন, দুজনেই একসঙ্গে মারা গ্যাছে। ক্রুয়েনিং পাগল হয়ে গ্যাছে। হলমানের খবর জানো ?'

'না।'

'বের্গমানের কাছে শুনলাম ও-ও নাকি মারা গ্যাছে। যাই হোক, তুমি কিন্তু শরীরের যত্ন নিও, এর্নস্ট। আর একদিন আমাদের এখানে আসতে যেন ভুলো না।'

'ভুলবো না, কার্ল। দেখো, একদিন ঠিক গিয়ে হাজির হবো।'

মুটসিগ্ খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলো। গ্রেবার ভাবলো, মৃত্যুর কথা বলে নিজের দুর্লভ জীবনের প্রতি ও কেবল সান্ত্বনাই পেতে চেয়েছিলো। সত্যি, কি আশ্চর্য এই মানুষের জীবন! বিষণ্ণ চোখে গ্রেবার ওর দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। ওর একটা পা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। অথচ এই মুটসিগ্ই একদিন ওদের ক্লাসে প্রতি বছর দৌড়ে প্রথম হতো। গ্রেবার বুঝতে পারলো না ওকে ও করুণা করবে, না হিংসে করবে। আর যাই হোক, ওকে তো আর কখনও সীমান্তে ফিরে যেতে হবে না।

গ্রেবার ফিরে এসে দেখলো এলিজাবেথ মাথায় সাদা একটা তোয়ালে পাগড়ির মতো জড়িয়ে বসে আছে। চমৎকার অনায়াস একটা ভঙ্গি। যেন পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তিতে দাঁড়ে-বসা কোন উজ্জ্বল সাদা কাকাতুয়া, ইচ্ছে করলেই যে-কোন মুহূর্তে জানলা দিয়ে উড়ে পালাতে পারে।

গ্রেবার মুচকি মুচকি হাসলো। 'কি ব্যাপার ?'

'এক সপ্তা পরে আজ মাথায় সাবান ঘষে গরম জলে স্নান করলাম। তুমি এটাকে আমার বিলাসিতাও বলতে পারো।'

'নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়াটা বিলাসিতা নয়, এলিজাবেথ।'

গ্রেবার জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। ওপরে ধূসর আকাশ, নিচে নির্জন ফাঁকা পথ। রাস্তার ওপারের জানলা থেকে ভেসে আসছে মহিলা-কণ্ঠে গলা-সাধার উৎকট চিৎকার। গ্রেবারের মনে হলো গাধা-চেঁচানিও

বোধহয় এর চেয়ে ভালো। সারাদিনের একটা তিক্ততা, একটা অস্থিরতা যেন ওকে পাগল করে তুলছিলো। আঁকড়ে ধরার মতন একটা অবলম্বন, একটা নোঙর চাই। নইলে সব ভেসে যাবে, ঝরে যাবে, যা আর কোনদিন ফিরবে না। কোনদিনও না। কিন্তু কি সেই অবলম্বন, সেই নোঙর? এলিজাবেথ? ও কি ওর? এ কদিনে ও ওর কতটুকুই বা জেনেছে? তাছাড়া আবার কত বছরের জন্যে সীমান্তে ফিরে যেতে হবে কে জানে! আজকের দিনের কোন সঞ্চয়ই কি থেকে যাবে না ওর স্মৃতির মণিকোঠায়? আর ও কি ওকে অনুভব করতে পারবে না তার উদ্বেল উষ্ণ রক্তস্রোতে?

'এলিজাবেথ,' হঠাৎ গ্রেবার ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমাদের দুজনের বিয়ে হওয়া উচিত, এলিজাবেথ।'

'বি-য়ে হওয়া উচিত!' এলিজাবেথ প্রথমে চমকে ওর মুখের দিকে তাকালো। তারপর ঝরঝর ঝরনার মতো হাসিতে লুটিয়ে পড়লো। 'কেন?'

'নইলে, যেহেতু, সবকিছু অর্থহীন। যেহেতু আমরা পরস্পরকে আরও নিবিড় করে জানতে চাই, বুঝতে চাই, পরস্পরকে পেতে চাই, তাই।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো—যেহেতু আমরা নিঃসঙ্গ, আমরা মরিয়া এবং যেহেতু আমাদের অন্যকিছু করার নেই?'

'না।'

এলিজাবেথ অবাক চোখে ওর দিকে তাকালো।

'না এলিজাবেথ, সে জন্যে নয়।'

'তাহলে?'

গ্রেবার নিঃশব্দে লক্ষ্য করলো ওর স্পন্দন, ওর বুকের প্রতিটা ওঠা-নামা। এই মুহূর্তে মনে হলো ও যেন তার কত অপরিচিত। ওর সারা মুখ, ওর দু বাহু, ওর অবয়ব, ওর ভাবনা, ওর জীবন বুঝি এখন কিছুই অনুভব করতে পারবে না আমার আর্তি, আমার নিঃশব্দ যন্ত্রণা! তাছাড়া আমিই বা ওকে কেমন করে বোঝাবো হঠাৎ কেন আমি এমন ভাবলাম।

'বিয়ে হলে তোমাকে আর ফ্রাউ লিজারের ভয় করতে হবে না।'

'কেন?'

'একজন সৈনিকের স্ত্রী হিসেবে তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকার নিজে হাতে তুলে নেবে।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই।' ছুরির ফলার মতো ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে গ্রেবার বিব্রত বোধ করলো। 'অন্তত কোন না কোন দিক থেকে সুবিধে হবেই।'

'ওটা কোন যুক্তিই নয়, এর্নস্ট। তাছাড়া বিয়ের জন্যে নিতান্ত যেটুকু সময় লাগে, তাও আমাদের হাতে নেই।'

'কেন নয়?'

'নানান কৈফিয়ত। অনুমতি-পত্র চাই, আর্য-রক্ত প্রমাণ করতে হবে, ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল জানাতে হবে। আর সব যেন কি কি লাগে, আমি ঠিক জানি না। অন্তত সপ্তাখানেকের ধাক্কা।'

'না না, সৈনিকদের বেলায় এসব কিচ্ছু লাগে না।' গ্রেবার যেন আশার ক্ষীণ আলোটুকুকে আঁকড়ে ধরতে চাইলো। 'যুদ্ধ-বিবাহের জন্যে দু-একদিন সময়ই যথেষ্ট। আমি তাঁবুতে কয়েকজনকে বলাবলি করতে শুনেছি।'

'তখন থেকেই বুঝি পরিকল্পনাটা তোমার মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে?'

'না এলিজাবেথ, না। বিশ্বাস করো, আজ সকালের আগে আমি এসব কিছুই ভাবিনি। যদিও তাঁবুতে এ সম্পর্কে ওরা প্রায়ই আলোচনা করে। সীমান্তে থাকাকালীন সময়ে বিবাহিতা স্ত্রী প্রতি মাসে দুশো মার্ক করে বাড়তি ভাতা পায়। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, বিয়ে হলে তোমাকে আর পোশাকের কারখানায় যেতে হবে না।'

'হয়তো হবে না। কিন্তু তাতে লাভ কি হবে? কারখানায় না গেলে সারাদিন নিঃসঙ্গ একা একা ঘরে বসে কি করবো বলো?'

গ্রেবারের এবার নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হলো। গলার ভেতরটা ওর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভাবলো আমাদের কারুরই কিছু করার নেই। অথচ আমরা তরুণ, পরস্পরে উচ্ছল স্বাধীনভাবে একত্রে বাঁচতে চাই। ও বললো, 'আমরা দুজনেই নিঃসঙ্গ, এলিজাবেথ। কিন্তু বিয়ে হলে আমাদের এই অসহায়তা অনেকটা কমে যাবে।'

এলিজাবেথ মাথা নাড়লো।

'কেন?'

'অসহায়তা কমবে না, বরং আরও বাড়বে।'

ওপারের গাধা-চেঁচানি এখন গ্রেবারের কাছে অসহ্য মনে হলো। ভদ্রমহিলা এখন গলা-সাধা বন্ধ করে কি যেন একটা সুর ভাঁজছেন। সুর তো নয়—অসুর! গ্রেবার মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। 'তুমি যতটা ভাবছো, বিয়েটা আসলে ততটা অসহ্য নয়। তাছাড়া ইচ্ছে করলে আমরা যখন খুশি বিচ্ছেদ করতে পারি।'

'তাহলে আর বিয়ে করার দরকারই বা কি?'

'কিন্তু…'

'কোন কিন্তু নয়, এর্নস্ট।' এলিজাবেথ উঠে পড়লো। 'দোহাই তোমার, এ সম্পর্কে আর কিছু বোলো না। আমরা একসঙ্গে আছি এই-ই যথেষ্ট।'

'তুমি চাও না?'

'না।'

এবার কি বলবে গ্রেবার ভেবে পেলো না। ওর মনে হলো বুকের ভেতরটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। আর সেই শূন্যতা থেকে অন্ধ একটা ক্রোধ যেন নিঃশব্দে ফেটে পড়তে চাইছে। গলার ভেতরটা ওর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখলো টেবিলটা পরিষ্কার, একটাও বোতল নেই।

'আমাদের পান করার আর কিছু নেই?'

'স্লিভোভিৎসের বোতলটা রয়েছে। পোল্যাণ্ডের…'

'ক্যামেলের একটা বোতল ছিলো না?'

'আছে। রান্নাঘরে রেখেছি।'

রান্নাঘরে প্রবেশ করে গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। আধো-অন্ধকারে সাজানো রয়েছে বিনডিং-এর দেওয়া টিনের খাবার। ভেতরে বাসী খাবারের চাপা গন্ধ। ক্যামেলের বোতলটা নিয়ে ও দ্রুত বেরিয়ে এলো।

এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে ছিলো জানলার সামনে। গ্রেবারের পায়ের শব্দে ও ঘুরে দাঁড়ালো। 'কি বিশ্রী মেঘলা করেছে ছাখো, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।'

'তাতে বিশ্রীর কি আছে?'

'বিশ্রী নয়? এই আমাদের প্রথম রোববার। আমরা হয়তো একটু বেড়াতে যেতে পারতাম। বাইরে এখন বসন্ত, সেদিকে খেয়াল আছে?'

খেয়াল তোমার চেয়ে আমার কম নেই, মনে মনে ভাবলেও গ্রেবার মুখে সেকথা বললো না। 'তুমি বাইরে যেতে চাইছিলে নাকি?'

'না। ফ্রাউ লিজার এখানে না থাকলেই আমি সবচেয়ে খুশি। আমি বলছিলাম তোমার জন্যে। এখানে একঘেয়ে বসে না থেকে একটু বেড়ালে হয়তো…'

'তার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। জীবনে দীর্ঘদিন আমি প্রকৃতির কোলেই শুয়ে বসে কাটিয়ে এসেছি। আজ তার সম্পর্কে যদি কোথাও কোন স্বপ্ন থেকে থাকে, তা হলো বুলেটের ক্ষতচিহ্নবিহীন শুধু শান্তির ছোট্ট একটা নীড়। তবু এখানে যা পেয়েছি, এই-ই আমার কাছে স্বপ্নের অতীত। এর চেয়ে বেশি আমি আর কিছু চাই না। অবশ্য তোমার তা মনে নাও হতে পারে। যদি তুমি চাও আমরা সিনেমায় যেতে পারি।'

এলিজাবেথ মাথা নাড়লো।

'তাহলে বরং কোথাও না গিয়ে এখানেই চুপচাপ বসে থাকি। আমরা যদি বাইরে যাই দিনটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে, ছড়িয়ে পড়বে। আমরা তাকে আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারবো না।'

গ্রেবার পায়ে পায়ে এলিজাবেথের পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর পেছন থেকে আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরলো। এলিজাবেথ মুখ ফেরাতেই তোয়ালেটা মাথা থেকে খসে পড়লো। গ্রেবার দেখলো ওর ছু চোখ জলে ভেজা। গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় টনটন করে উঠলো। 'কি হয়েছে এলিজাবেথ! আমি কি তোমাকে আঘাত করেছি?'

'না।'

'তাহলে কাঁদছো কেন? নিশ্চয়ই আমি কিছু বলেছি?'

এলিজাবেথ কিছু বললো না।

'কি হয়েছে আমাকে বলবে না?'

এলিজাবেথ তবু কিছু বললো না। বাইরের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

গ্রেবার ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। নিচের খোঁড়া গর্তে ছুটো বাচ্চা লুকোচুরি খেলছে। গ্রেবারের মনে পড়লো হাকেনষ্ট্রাসে বেড়ালের পেছনে ধাওয়া করে ফেরা নিরুদ্বিগ্ন সেই বাচ্চাটার কথা। 'আমাকে ক্ষমা করো, এলিজাবেথ। আজকের দিনে এমন মন খারাপ কোরো না, লক্ষ্মীটি!'

রাস্তার ওপার থেকে ভেসে আসছে সেই মহিলার কর্কশ কণ্ঠস্বর: মম মনের বনের শাখে যেন নিখিল কোকিল ডাকে···

এলিজাবেথ ঘুরে গ্রেবারের গলাটা জড়িয়ে ধরলো। 'না এর্নস্ট, আমি আর মন খারাপ করবো না।'

বিকেলের দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। আগে থেকেই আকাশ মেঘলা করেছিলো, তারপর মেঘে মেঘে শুরু হলো ঘনঘটা। ওরা ছুজনে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আলো জ্বালেনি। সামনের জানলাটা খোলা। বাইরে এখন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। বিরামবিহীন। বৃষ্টির শব্দে গ্রেবারের মনে পড়লো রাশিয়ার কথা। ওখানের মাঠ-ঘাট এখন নিশ্চয় কাদায় ডুবে গেছে। ও

যখন ফিরে যাবে তখনও হয়তো কাদায় প্যাচপ্যাচ করবে। কল্পনায় দৃশ্যটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে গ্রেবারের মন খারাপ হয়ে গেলো।

'আমার মনে হয় এখন চলে যাওয়া উচিত। ফ্রাউ লিজার হয়তো তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে।'

'আসুকগে,' ঘুম-জড়ানো স্বরে এলিজাবেথ বললো। 'তোমার কি মনে হয় অনেক রাত হয়ে গ্যাছে ?'

'না, রাত বেশি হয়নি। হয়তো বৃষ্টির জন্যই ও তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

'হয়তো বৃষ্টির জন্যে উনি আজ ফিরতেই পারবেন না।'

'হুঁ, তাও হতে পারে।'

এলিজাবেথ গ্রেবারের বুকে মুখ রাখলো। 'আমার মনে হয় কাল সকালের আগে উনি আর ফিরছেন না।'

'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমাকে তাহলে আর এই ঝড়-বাদলার মধ্যে ফিরে যেতে হবে না।'

গ্রেবার অপলক চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলো। অন্ধকারে যতটা না দেখতে পেলো. ঝমঝম বৃষ্টির শব্দের উন্মাদনাটুকু বুকের মধ্যে অনুভব করলো তার চাইতে বেশি। এখন মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছে।

গ্রেবারের বুকে অনেকক্ষণ কুমিরের মতো চুপচাপ পড়ে থাকবার পর এলিজাবেথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইছো কেন, এর্নস্ট ? তুমি তো আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না।'

'জানি। অনেক অনেক দিন থেকে জানি।'

'অনেক দিন থেকে জানো ?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। এক-আধদিন নয়, দু-দুটো বছর। চাই কি তারও বেশি হতে পারে। কাউকে জানার পক্ষে সেটা কম দিন নয়।'

'তুমি কি আমাদের ছোটবেলার কথা বলছো, এর্নস্ট ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'ছুটি পাবার আগে, গত দু বছর আমি কারুর কথা মনে মনে ভীষণভাবে ভেবেছি। তাকে অনুভব করেছি আমার বুকের মধ্যে, গ্রহণ করেছি আমার স্বপ্নিল রক্তস্রোতে। তোমার সঙ্গে জানা আমার সেই দিন থেকে।'

এলিজাবেথ মুখ তুললো। 'আমি ঠিক ওভাবে ভাবিনি, এর্নস্ট।'

'নিশ্চয়ই না, কেননা ভেবেছি আমি একা। তবে বিয়ের কথা ভেবেছি খুব সাম্প্রতিক।'

'কবে থেকে?'

আজ ভোরে তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে আর বাইরের অন্ধকারে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিলো, তখন।'

'বৃষ্টি আর অন্ধকারের জন্যেই কি?'

'না। তার চেয়ে গভীর কিছু আমার বুকের মধ্যে তখন তোলপাড় করছিলো, এলিজাবেথ। তখন···তখন আমার মনে হচ্ছিলো এই রুক্ষ হাতে রাইফেল চেপে ধরার চেয়ে সুন্দর কিছু আঁকড়ে ধরতে পারি, কাউকে আমি নিবিড় করে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি।'

'কই, দুপুরে তো তুমি এসব কিছু বলোনি?'

'দুপুরে এসব কথা বলা যায় না, এলিজাবেথ।'

'বলা যায়, খুব বলা যায়। সেটা তোমার তাঁবুর বন্ধু কিংবা দুশো মার্কের বিবাহ-ভাতার চেয়ে অন্তত ভালো শোনাতো।'

এলিজাবেথের শেষের কথাগুলো কান্নায় ভিজে এলো।

'একই ব্যাপার, শুধু কয়েকটা শব্দের তফাত।

'শব্দ সময় সময় অপরিহার্য, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, এর্নস্ট।'

'অতশত আমার তখন মনেই হয়নি। আমি তখন শুধু ভাবছিলাম সময়ের কথা।'

'সময়!'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। গতকাল ভেবেছিলাম এখনও আমার অনেক সময় আছে আর আগামীকাল ভাববো কাল অনেক সময় ছিলো।'

গ্রেবার ঠোঁট রাখলো এলিজাবেথের কপালে। ওর চূর্ণ কুন্তল কাঁধের দু পাশ থেকে ছড়িয়ে রয়েছে বালিশের চারদিকে। বৃষ্টির অস্পষ্ট ছায়াগুলো কাঁপছে ওর মুখে।

এলিজাবেথ চাপা স্বরে বললো, 'কিন্তু এর্নস্ট, এখনও তুমি জানো না আমাকে তুমি ভালবাসো কি না?'

'এসব জিনিস এত সহজে জানা যায় না, এলিজাবেথ। তার জন্যে সময় চাই, তার জন্যে পরস্পরকে কাছে থাকতে হয়।'

'নিশ্চয়ই, আর সেই জন্যেই তো আমার কৌতূহল তুমি এখনই বিয়ে করতে চাইছো কেন?'

'যেহেতু তোমাকে ছাড়া আমার জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অর্থহীন।'

একটু নীরবতার পর এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা এর্নস্ট, এমনও তো হতে পারে আজ আমার সম্পর্কে তুমি যেমন করে ভাবছো, একদিন হয়তো অন্য কারুর সম্পর্কে ঠিক তেমনি করে ভাববে ?'

জানলায় বৃষ্টি-প্রকম্পিত ছায়াগুলোর দিকে গ্রেবার নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিলো। এবার ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'ভবিষ্যতের কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না, এলিজাবেথ। তবে, এই মুহূর্তে আমি অন্য সম্ভাবনার কথা আদৌ কল্পনা করতে পারছি না।'

এলিজাবেথ এবার দু কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে হাতের তালুতে মুখ রেখে গ্রেবারের মুখের দিকে তাকালো। 'তুমি এখন যেভাবে বলছো, দুপুরে কিন্তু কিচ্ছু বলোনি।'

'দীর্ঘদিন আমি কাউকে কিছু বলিনি, এলিজাবেথ। বলতে পারিনি। হয়তো এখন রাত্রি বলেই বলতে পারলাম। তাছাড়া আমার ধারণা বিয়ে না করলে পরস্পরকে সত্যি করে জানা যায় না, অনুভব করা যায় না, ভালবাসা যায় না···'

'এর্নস্ট !'

'আর ঠিক সেই জন্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, এলিজাবেথ। শুধু তোমাকে ভালবাসবো বলে।'

এলিজাবেথ দুষ্টুমি করে হাসলো, 'আর তখন আমাকে ভাল না বাসতে পারলে বিচ্ছেদ করবে, তাই তো ?'

'না,' গ্রেবার অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলো। 'না এলিজাবেথ, না।'

এলিজাবেথ পাগলের মতো বিপুল উচ্ছ্বাসে ওকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর নিবিড় প্রশান্তিতে ওর বুকে মাথা রেখে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো। আর গ্রেবার ওর মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে পলকহারা চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগলো। হঠাৎ মনে হলো ওকে যেন ওর অনেক কিছু বলার ছিলো।

সতেরো

খোলা দরজা থেকে বিনডিং চেঁচিয়ে বললো, 'কোন সংকোচ কোরো না, এর্নস্ট। তোমার যা প্রয়োজন খুশিমতো ব্যবহার কোরো।'

'ঠিক আছে।'

গ্রেবার কোলা ব্যাঙের মতন হাত পা ছড়িয়ে স্নানের টবে চিৎ হয়ে পড়ে ছিলো। ঘরের এক কোণে চেয়ারে ছাড়া রয়েছে ওর সৈনিকের পোশাক। চেয়ারের পেছনে ঝুলছে রয়টারের ধার দেওয়া নীল কোটটা।

বিনডিং-এর স্নানের ঘরটা বেশ বড় অথচ খোলামেলা। মেঝেতে ঝকঝকে সবুজ চীনামাটির টালি বসানো। ওপরে ধারাস্নান। গরম জলে অবগাহনের আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। ওদের তাঁবুর স্নানঘরের তুলনায় এটা স্বর্গ। দেওয়ালের হুকে ছোট-বড় তোয়ালে ঝুলছে। সাবানটা ফ্রান্স থেকে আনানো। ছোট একটা তাকে সুগন্ধি তেল, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, পুরুষের উপযোগী নানারকম প্রসাধন সামগ্রী।

ভাবনাবিহীন শিথিল আবেশে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে গ্রেবার জলের উষ্ণ উত্তাপটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করলো। শুধু জলের উষ্ণ উত্তাপই নয়, এই নিটোল নির্জনতা আর নিজের শরীরের যা-কিছু একান্ত গোপনীয়—সেটুকুও প্রাণভরে উপলব্ধি করলো। আঃ, ছুটির শেষ দিনকটা যদি এমন ভাবনাবিহীন অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারতাম! রয়টার ঠিকই বলেছিলেন, আবার কতদিন কত বছর পরে ছুটি পাওয়া যাবে কে জানে! লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে গ্রেবার চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিলো দূরে, যাতে সৈনিকের পোশাক ওর চোখে না পড়ে। তারপর একমুঠো বাথ-সল্ট মিশিয়ে দিলো স্নানের জলে। এ যেন একমুঠো বিলাসিতা। এলিজাবেথের সঙ্গে জার্মানিয়ার প্রথম দিনের সন্ধ্যার মতো এ যেন মুঠো মুঠো শান্তির বিলাসিতা।

অনেকক্ষণ পরিপূর্ণ অবগাহনের পর গা মুছে জামা-কাপড় পরে নিলো। সৈনিকের ভারি পোশাকের পর বিনডিং-এর আটপৌরে পোশাক ভীষণ হালকা মনে হলো। সবকিছু পরার পরেও গ্রেবারের মনে হলো সাধারণ অন্তর্বাস ছাড়া যেন ও আর কিছুই পরেনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রেবার নিজেকে চিনতেই পারলো না। যেন অপরিচিত কোন কিশোর

বিস্ময়-আহত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যাকে ও সীমান্তে কখনও দেখেনি।

'বরযাত্রী, না কনেযাত্রী?'

বিনডিংকে ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসতে দেখে গ্রেবার গম্ভীর হলো। 'দেখে কি মনে হচ্ছে?'

'হুঁ, বিয়েবাড়ি বিয়েবাড়ির গন্ধ পাচ্ছি।'

গ্রেবার অপ্রস্তুত হলো। 'তুমি জানলে কেমন করে?'

'তোমাকে দেখে। তোমাকে কিন্তু এখন আর আদৌ সৈনিকের মতোই মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে···'

'কি?'

'একদা বিস্মৃত অস্থির সন্ধানে ফেরা সেই বিষণ্ন কুক্কুট।'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে গ্রেবার হেসে ফেললো। 'ওরে বাব্বা!'

'তুমি কি সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছো নাকি, এর্নস্ট?'

'হ্যাঁ।'

কিন্তু সবদিক ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখেছো তো?'

'না।'

'না মানে!'

'গত কয়েক বছর ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখার কোন অবকাশই পাইনি, আলফনস্।'

বিনডিং স্তম্ভিত চোখে ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবলো। তারপর দুবার জোরে জোরে বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো। 'হুঁ, যা ভেবেছি তাই!' ও আবার মুচকি মুচকি হাসলো। 'ল্যাভেণ্ডারের নিকুঞ্জ একেবারে উজাড় করে এনেছো দেখছি!'

গ্রেবার নিজের হাত শুঁকলো। 'কই, আমি তো পাচ্ছি না!'

'পাবে ভায়া, পাবে। খোদ প্যারিসের। আগে ফুরফুরে হাওয়া ছাড়ুক, তখন টের পাবে। তার আগে এক হাত কনিয়াক হয়ে যাক।'

কথা বলতে বলতেই বিনডিং বোতল খুলে দুটো গ্লাস ভর্তি করে ফেললো।

'প্রস্ত, এর্নস্ট!'

'প্রস্ত, আলফনস্।'

'তাহলে তুমি সত্যি বিয়ে করছো?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের দুজনকেই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, আলফনস্।'

'আমার তো আর বিয়ের জল গায়ে পড়লো না, চিরকাল ধর্মের ষাঁড় হয়েই কাটালাম। থাকগে ওসব কথা···তারপর, তোমার বউয়ের কথা আমাকে বলবে না?'

'না।' এক চুমুকে গ্রেবার বাকি কনিয়াকটুকু শেষ করে ফেললো। মনে মনে নিজের উপরই ক্রুদ্ধ হলো। কেন ওকে এসব বলতে গেলাম!

বিনডিং গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো। গ্রেবারের গলার ঝাঁজটুকু উপলব্ধি করতেই ওর সব উৎসাহ কে যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলো। 'যদি কোথাও কোন প্রয়োজন হয় আমাকে জানাতে ভুলো না, এর্নস্ট।'

'কোন প্রয়োজন হবে না, আলফনস্। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ।'

'আমি জানি, সৈনিক হিসাবে তোমার দিক থেকে কাগজপত্রের খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

'কারুর দিক থেকেই হবে না। যুদ্ধের সময়ে বিয়েতে ওসব কিছু লাগে না।'

'তবু যদি কোন কারণে দেরি হয়, আমাকে তুমি নিঃসঙ্কোচে জানিও। গেস্টাপোয় আমার কয়েকজন বন্ধু আছে।'

'গেস্টাপো? গেস্টাপোর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধকালীন বিয়ের সম্পর্ক কোথায়?'

বিনডিং বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলো। 'গেস্টাপো মাথা ঘামায় না এমন কোন জিনিসই নেই। অবশ্য সৈনিক হিসেবে এটা তোমার জানার কথা নয়। কিন্তু এর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আর যাই হোক, তুমি তো আর ইহুদি কিংবা কোন কমিউনিস্ট মেয়েকে বিয়ে করছো না। নিয়মরক্ষা ছাড়া এক্ষেত্রে ওরা বিশেষ কিছুই অনুসন্ধান করবে না।'

গ্রেবার কিছু বললো না। মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলো। কোন অনুসন্ধান হলেই ঘুরেফিরে ওরা ঠিক জানতে পারবে এলিজাবেথের বাবা এখন রয়েছেন বন্দীশিবিরে। ও আপ্রাণ চেষ্টা করবে যাতে ঘুণাক্ষরেও কেউ এসব টের না পায়।

বিনডিং গ্লাসদুটো আবার ভর্তি করলো। 'তুমি এত ভাবছো কেন, এর্নস্ট? সেদিন তোমাকে যে দুজন অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, প্রয়োজন হলে ওরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে।'

গ্লাসটা হাতে নিয়ে গ্রেবার বাইরের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিলো। এলিজাবেথ সাতসকালেই বেরিয়ে গেছে টাউন হলে তার কাগজ-পত্র সংগ্রহ করতে। গ্রেবার নিজেই তাকে পাঠিয়েছে। আশ্চর্য! তখন গেস্টাপোর কথা ওর একবারও মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে ওকে একলা পাঠানো উচিত হয়নি। যদি জানতে পারে, হয়তো গেস্টাপোই ওকে টেনে নিয়ে যাবে বন্দীশিবিরে। কথাটা ভাবতেই রক্ত ওর গরম হয়ে উঠলো। বলা যায় না, হয়তো ফ্রাউ লিজারই এ সম্পর্কে তার অনেকখানি কাজ গুছিয়ে রেখেছে।

গ্রেবার উঠে পড়লো।

'কি ব্যাপার, এর্নস্ট!' বিনডিং ওর পথ আটকে দাঁড়ালো। 'গ্লাসটা তো এখনও শেষই করলে না। নাকি খুশিতে একেবারে স্বর্গরাজ্যে বাস করছো?'

ওর ঠাট্টায় গ্রেবার হাসলো না। বিনডিং-এর চোখের দিকে তাকাতেই ওর মনে হলো কোথায় যেন একটা বিপদ ওত পেতে রয়েছে।

'মদে তোমার অরুচি, আমার জানা ছিলো না এর্নস্ট। একেবারে খাঁটি নেপোলিয়ন কনিয়াক। নাও, খেয়ে ফ্যালো।'

'প্রস্ত, আলফনস্।'

'প্রস্ত, এর্নস্ট।'

গ্রেবার খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো। হঠাৎ একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি ওর মাথায় খেলে গেলো। 'সত্যিই তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও আলফনস্, আমাকে দু পাউণ্ড চিনি দাও। এক পাউণ্ড এক পাউণ্ড করে আলাদা দুটো প্যাকেটে।'

'চিনি! চিনি কি হবে? অনেক মিষ্টি রয়েছে, যত খুশি নিতে পারো।'

'একজনকে ঘুষ দেবো।'

'ঘুষ! কিন্তু এর্নস্ট, আমার মনে হচ্ছে এসবের কোন দরকার ছিলো না। আমরা ইচ্ছে করলে এটাকে আরও সহজভাবে নিতে পারতাম।'

'না আলফনস্, এক্ষেত্রে অসম্ভব। তাছাড়া এটা সত্যিকারের ঘুষ নয়। চিনিটা আমি একজনকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দিতে চাই।'

'ঠিক আছে। বিয়ের উৎসব কিন্তু আমার বাড়িতে হবে, আর মহামান্য আলফনস্ হবে এই উৎসবের একমাত্র উদ্যোক্তা।'

কয়েকটি ভাবনা দ্রুত কাজ করে গেলো। গ্রেবার ভাবলো আর এগুনো ঠিক নয়। অনেক আগেই ওর উচিত ছিলো এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া।

'উৎসবের কোন দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না, আলফনস্।'

'সেসব তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আজ রাত্তিরে তুমি আমার এখানে ঘুমবে। তোমাকে আমি একটা চাবি দিয়ে রাখবো। তুমি যখন খুশি আসবে, যা খুশি ব্যবহার করবে। আর তাঁবুর ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না।'

মনে মনে ইতস্তত করলেও, বিনডিং-এর বলার ভঙ্গি দেখে গ্রেবার না হেসে পারলো না। 'ঠিক আছে আলফনস্, আমার মনে থাকবে।'

'বাঃ, এই তো বন্ধুর মতো কথা।' বিনডিং যেন উচ্ছল খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। 'এবার থেকে দুজনে একসঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করবো। এখনও পর্যন্ত তার তো কোন সময়ই হয়ে উঠলো না। এসো, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই···না, তার আগে বোতলটা শেষ করে ফেলি।' বিনডিং বোতল উপুড় করে গ্লাসদুটো ভর্তি করে নিলো। 'ভদ্রমহিলার কথা তুমি কিন্তু আমাকে কিচ্ছু বললে না। অবশ্য অনুমানেই বুঝতে পারছি—উপমায় তুমি অনন্যা—আহা, যেন উর্বশীর সমান রূপসী!'

গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো বিনডিং মুচকি মুচকি হাসছে। ওর মনে হলো এ মুখটা ও যেন কোথায় দেখেছে। শিশুর মতো নিষ্পাপ, আশ্চর্য সরল। অথচ কোথায় যেন একটা ক্রূর নিষ্ঠুরতা জড়িয়ে রয়েছে। আর ঠিক তখনই ওর মনে পড়লো স্টেইনব্রেনারের ঘুমন্ত মুখটা। 'না আলফনস্, বলার মতো তেমন কিছুই নেই। একদিন তুমি সব জানতে পারবে।'

ফ্রাউ লিজার প্রথমে গ্রেবারকে চিনতেই পারেননি। নতুন সার্ট-প্যাণ্টে ও তখন পুরোদস্তুর সাহেব। যখন চিনতে পারলেন, বিস্ময়ে চোখের মণি-দুটো ওঁর বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, 'ওমাঃ আপনি! কিন্তু ফ্রয়লাইন ক্রুজে তো এখন বাড়ি নেই।'

'আমি জানি।'

'তাহলে?'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো ওঁর চোখের দৃষ্টি। গ্রেবার লক্ষ্য করলো ভ্রূর ভাঁজে ওঁর সূক্ষ্ম রেখাদুটো। বাদামী রঙের ব্লাউজের হাতায় পিন দিয়ে আটকানো স্বস্তিকা। এলোমেলো চুলে তেল চকচক করছে। হাতে তোয়ালে। সম্ভবত স্নানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

'ফ্রয়লাইন ক্রুজের জন্যে এই প্যাকেটটা এনেছিলাম। যদি কিছু মনে না করেন, এটা অনুগ্রহ করে ওর ঘরে রেখে দেবেন?'

ফ্রাউ লিজার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না, দোনামোনা করলেন।

গ্রেবার মোড়কটা ওর দিকে এগিয়ে দিলো। 'আপনি এটা শুধু ওঁর ঘরে রেখে দেবেন। আমার কাছে অবশ্য আর একটা প্যাকেট রয়েছে। পাউণ্ড-খানেক চিনি আছে···ঠিক বুঝতে পারছি না এটা নিয়ে কি করবো। আপনার ঘরে বাচ্ছা রয়েছে, ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারেন।'

ফ্রাউ লিজারের মুখ অভিব্যক্তিতে কঠিন হয়ে উঠলো। 'কালোবাজারী জিনিস আমরা ব্যবহার করি না। সম্মানীয় ফুরার আমাদের যতটুকু দেন, তাতেই আমরা খুশি।'

'কিন্তু আপনার শিশু···'

'ভুলে যাবেন না আমি ওর মা।'

'এটা অবশ্য খুবই সৎ মনোভাব,' গ্রেবার এবার আর ওঁর মুখের দিকে তাকালো না। এই রকম পরিস্থিতির জন্যে ও মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিলো। তাই মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বললো, 'এবং সীমান্ত সৈনিকের মতো পরিবারের আর সবাই যদি এই মনোভাব পোষণ করতে পারতেন, তাহলে আমাদের মুখের চেহারাটাই পালটে যেতো।' গ্রেবার দু ঠোঁটের প্রান্তে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। 'যাই বলুন, এটা কিন্তু কালোবাজারের জিনিস নয়। ছুটিতে আসা প্রিয় সৈনিকদের জন্যে ফুরারের দেওয়া উপহার, যা তারা পরিবারের জন্যে স্বচ্ছন্দে নিয়ে আসতে পারে। এবং যেহেতু আমি আমার পরিবারের কাউকে এখন খুঁজে পাচ্ছি না, আপনি নিঃসংকোচে এটা ব্যবহার করতে পারেন।'

ফ্রাউ লিজারের মুখ এবার যেন উজ্জ্বল প্রশান্তিতে ভরে উঠলো। 'আপনি সীমান্ত থেকে ফিরেছেন বুঝি?'

'নিশ্চয়ই।'

'রাশিয়া থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার স্বামীও এখন রাশিয়াতে রয়েছেন।'

'ও, আচ্ছা!' গ্রেবার আন্তরিক হবার ভান করলো। 'উনি এখন কোথায় আছেন?'

'কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীতে। জায়গার নামটা ঠিক বলতে পারবো না।'

গ্রেবার মনে মনে ভাবলো, তুমি ডাইনি কম নয়! বলতে পারবে না, না বলতে চাও না! তাছাড়া জায়গার নাম জানার জন্যে আমার ভারি বয়েই গেছে! 'তা যেখানে থাকুন না কেন, শান্তিতে থাকুন এইটেই কামনা করি।'

'শান্তি? শান্তি এখন কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সেনা-

বাহিনীকে একেবারে সীমান্তে লড়াই করতে হচ্ছে।'

গ্রেবারের ইচ্ছে হলো ওর ঝুঁটি ধরে বুঝিয়ে দেয়—পবিত্র জন্মভূমি, ফুরার আর এই অন্ধ গর্ববোধের ওপারে সত্যিকারের সীমান্ত কাকে বলে। কিন্তু নিজেকে কোনরকমে সামলে নিলো। 'আশা করি, উনি শিগ্‌গিরি ফিরে আসবেন।'

'ওঁর সময় এলে উনি নিশ্চয়ই আসবেন। তবে এ সম্পর্কে ওপর-মহলে ধরা-করাটা উনি একদম পছন্দ করেন না।'

'জানেন, পারতপক্ষে আমিও এসব পছন্দ করি না···যার জন্যে আমার ছুটি পেতে প্রায় দু বছর দেরি হয়ে গেলো।'

'আপনি কি বরাবর রাশিয়ায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের শুরু থেকে।'

ওঁর চোখের দিকে তাকাতেই গ্রেবার মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। একটু একটু করে ও যে কখন ওঁর চোখের মণিতে পরিপূর্ণ বীর সৈনিক হয়ে উঠেছিলো, গ্রেবার খেয়ালই করেনি। সহযোদ্ধার কৃতিত্বে ওঁর চোখদুটো যেন চকচক করছে। অথচ এই দেশপ্রেমিকার চোখের অনুকম্পা কুড়োতে ও কি নিজেই নিজেকে বড় করে তোলেনি? নিশ্চয়ই তাই। নইলে অনেক আগেই আমার ওঁকে গুলি করে মারা উচিত ছিলো—ঠিক যেমন ওঁর স্বামী, হয়তো কোন এস ডি, ফুরারের জঘন্য লেবেন্‌স্‌রাউমের নামে রাশিয়ান কৃষক শ্রমিকদের গুলি করে মারছে।

ফ্রাউ লিজার হাসলেন। 'কি ব্যাপার, আজ হঠাৎ অসামরিক পোশাকে?'

'আমার সামরিক পোশাকটা কাচতে দিয়েছি।'

'ও, তাই বলুন। আমি ভেবেছিলুম···'

গ্রেবার ভেবেই পেলো না ডাইনিটা আবার কি ভাবতে পারে। গন্ধ পায়নি তো?

'ঠিক আছে, দিন। চিনিটা আমি বাচ্চার জন্যে ব্যবহার করতে পারবো। ও আবার মিষ্টি ভীষণ ভালবাসে।'

'ধন্যবাদ।'

গ্রেবার দুটো মোড়কই ওঁর হাতে দিলো। ওর মনে হলো মোড়ক-দুটোর কোনটের পরিমাণ বেশি উনি যেন সেটা হাতের অনুমানে বোঝার চেষ্টা করছেন। রাক্ষসী, তোমাকে আমার আর চিনতে বাকি নেই! গ্রেবার ভাবলো, আমি চলে গেলেই তুমি এলিজাবেথের মোড়কটাও খুলে দেখবে, তখন তোমার মনের অবস্থাটা কি হবে ভাবতেও আমার হাসি পাচ্ছে।

'আজ তাহলে চলি, হাইল হিটলার !'

ফ্রাউ লিজার অবাক চোখে ওর দিকে তাকালেন। 'হাইল হিটলার !'

কেন জানি গ্রেবারের এখন নিজেকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো। হালকা পায়ে সিঁড়ি কটা ও দ্রুত পেরিয়ে এলো। সদর দরজার সামনে দেখলো বাড়ির দারোয়ান ছোট একটা টুলে বসে হাই তুলছে। প্রথম দিনের রাত্রির পর ওকে আর ভালো করে দেখার কোন অবকাশই হয়নি। ছোকরার বয়েস খুব অল্প। এস এ ট্রাউজার পরা ল্যাকপ্যাকে চেহারা। দেখলে মনে হবে সারারাত যেন ভালো করে ঘুমোয়নি। তোমাদের চরিত্র আমার জানা আছে, চাঁদ। ওই যে কথায় বলে না বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, তোমরা হচ্ছো সেই জাতের। গ্রেবার ভাবলো ওর সঙ্গে আলাপটা একটু ঝালিয়ে রাখা ভালো।

'আজকে আবহাওয়াটা ভারি চমৎকার, তাই না ?'

'হ্যাঁ, বৃষ্টি হবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

গ্রেবার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করলো। নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিলো। 'নিন।'

ছোকরা একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো। গ্রেবার জ্বলন্ত লাইটারটা এগিয়ে ধরলো ওর মুখের সামনে। ছোকরা সিগারেটটা ধরিয়ে খুব কায়দা করে টানলো।

গ্রেবার মুচকি মুচকি হাসলো। 'কি, ভালো নয় ?'

'ফাস-কেলাস ! যাই বলুন, ভালো সিগারেটের মর্ম আমি বুঝি।'

'একেই রেশনে খুব কম সিগারেট দেয়, তার ওপর ভালো সিগারেট তো পাওয়া যায় না বললেই চলে।'

'এক্কেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। চেষ্টা করলে রাত্তিরে নিয়ে শোবার মতন ভালো মেয়ে পাওয়া যাবে, কিন্তু হাজার মাথা খুঁড়লেও এখন আর কোথাও ভালো সিগারেট পাওয়া যাবে না।'

'আমার এক জানাশোনা বন্ধুর কাছে কিছু ভালো সিগারেট আছে। পরের বারে যখন আসবো দু প্যাকেট নিয়ে আসবো। খুব ভালো সিগারেট।'

'বাইরের ?'

'তা ঠিক জানি না। তবে এস এ কম্যাণ্ডার যখন, বাইরের সিগারেট হওয়াই স্বাভাবিক।'

'এস এ কম্যাণ্ডার !'

'হ্যাঁ, আলফনস্ বিনডিং। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'হের বিনডিং আপনার বন্ধু ?'

'শুধু বিনডিং নয়, এস এস কম্যাণ্ডার রিয়েসও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

ছোকরা দারোয়ান চোখ কপালে তুললো। গ্রেবার ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারলো, ও এখন ভাবছে বিনডিং এবং রিয়েস যদি এতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় তাহলে স্বাস্থ্যদপ্তরের উপদেষ্টা ডাক্তার ক্রুজেকে কি করে বন্দীশিবিরে আটকে রাখা সম্ভব। ও মুখ খোলার আগেই গ্রেবার দ্রুত ঘড়ি দেখলো। 'ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেছে ! আমি চলি।'

'সিগারেটের কথাটা আবার ভুলবেন না যেন।'

গ্রেবার রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বললো, 'না, ভুলবো না।'

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে গ্রেবার ভাবলো শুরুটা কিন্তু খুব একটা খারাপ হয়নি। অন্তত ফ্রাউ লিজারের বিকৃতির ক্লেদাক্ত মুখোশটাকে আরও কাছ থেকে চেনার সুযোগ পাওয়া গেলো। এ বিকৃতি শুধু ওঁর নয়, আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে; শিকারী বেড়ালের মতো ওত পেতে রয়েছে আনাচে-কানাচে। কিন্তু সত্যিই কি এটাকে ওর নতুন করে চেনার কোন দরকার ছিলো ? কথাটা ভাবতেই ওর মন খারাপ হয়ে গেলো। হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে কেমন যেন ছেলেমানুষির মতো মনে হলো।

এই পোশাকটাই যত নষ্টের মূল। ও চেয়েছিলো সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পেতে, স্বস্তিতে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে। কিন্তু তার পরিবর্তে কখন যে একটু একটু করে ভয়ের রাজত্বে ঢুকে পড়েছে ও টেরও পায়নি। এলিজাবেথের জন্যে ওর ভাবনা হলো সবচেয়ে বেশি। বেচারি বেরিয়েছে সেই সাতসকালে, সন্ধ্যের আগে হয়তো ফিরতে পারবে না। আদৌ ফিরতে পারবে কিনা কেউ জোর করে বলতে পারে না। কাল যার নিরাপত্তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, আজ তাকেই আমি নিজের হাতে ঠেলে দিয়েছি অনিশ্চিত বিপদের মুখে। অশ্রুত ব্যথায় গ্রেবারের বুকটা টনটন করে উঠলো। নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হলো। হঠাৎ কেন জানি ওর হির্শলাণ্ডের মুখটা মনে পড়লো। ও-ও সৈনিক হয়েছিলো শুধু ওর পারিবারিক নিরাপত্তার জন্যে। রাত্রে জেগে পাহারা দিতো, ওর ধারণা তাতে হয়তো ওরা ওর বাবা-মাকে বন্দীশিবিরে আটকে রাখবে না। ও হো,

ওদের বাড়িতে তো একবার দেখা করার কথা ছিলো !

গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। ঠিকানাটা যেন কোথায় রেখেছে ! প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওর মনে হলো—ওদের সঙ্গে দেখা করাটা অত্যন্ত জরুরী। এলিজাবেথের সঙ্গে কোথায় যেন এর একটা যোগ রয়েছে। যদিও ছেলেমানুষ, তবু ওর মনে হলো ওদের সঙ্গে দেখা করলে হয়তো এলিজাবেথের সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। নিজের মনে উল্লসিত হবার এ এক ধরনের সৈনিকী কুসংস্কার। গ্রেবার বোঝে, তবু তাকে বিশ্বাস করতে ওর ভীষণ ইচ্ছে হলো।

ছোট তিনতলা বাড়ি। দোতলায় উঠে ও ঘণ্টা বাজালো। খুব সন্তর্পণে দরজাটা খুলে গেলো এবং শুকনো চেহারার এক প্রৌঢ়া বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'আমি ফ্রাউ হির্শলাণ্ডের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

প্রৌঢ়া অবাক চোখে তাকালেন। 'বলুন।'

'আপনিই কি ফ্রাউ হির্শলাণ্ড?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আপনার ছেলের বন্ধু। একই সেনাবাহিনীতে রয়েছি।'

প্রৌঢ়া অদ্ভুত চোখে গ্রেবারের মুখের দিকে সমানে তাকিয়ে ছিলেন। গ্রেবার কেন জানি তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো ওর শঙ্কিত চোখের দৃষ্টিটা ঠিক সহ্য করতে পারছিলো না। 'হির্শলাণ্ড আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলো। কয়েকদিন হলো আমি এখানে ছুটিতে এসেছি। তাই আর সৈনিকের পোশাক পরিনি।'

'এসো, ভেতরে এসো।'

প্রৌঢ়া ওকে শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। ভেতরে আসবাবপত্রের কোন বাহুল্য নেই। একপাশে টেবিল চেয়ার, অন্যপাশে বড় একটা বিছনা পাতা। ঘরের বাইরে রাস্তার ওপর একফালি ঝুলনো বারান্দা। দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটা ছবি। ভদ্রমহিলা চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন। 'এটাতে বসো, বাবা।'

চেয়ারে বসে গ্রেবার চারদিকে একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। ওর মনে হলো উনি হয়তো এবার কিছু জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু করলেন না, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

'দু সপ্তা আগে আমরা দুজনে একসঙ্গে ছিলাম।'

'তুমি কিছু খাবে ? যদিও খুব সাধারণ···তবু···হয়তো এখনও···'

গ্রেবারের হঠাৎ মনে হলো ও তৃষ্ণার্ত। 'হ্যাঁ, এক গ্লাস জল খাবো।'

'তুমি একটু বসো, আমি একখুনি আসছি।'

হালকা নিঃশব্দ পায়ে উনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই গ্রেবারের কাছে অদ্ভুত মনে হলো। উনি শুধু ভীতই নন, কেমন যেন অস্বাভাবিক। গ্রেবার উঠে ঘরময় পায়চারি করলো। তারপর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওপরের ছবিটার দিকে চোখ রাখলো। বিখ্যাত কোন শিল্পীর আঁকা। ফুলে ফুলে ছাওয়া একটা বাদাম গাছ, তার নিচে জলের পাত্র নিয়ে একটি ফ্লোরেনটান কিশোরী। ছবিটা এর আগেও ও যেন কোথায় দেখেছে, অথচ কোথায় দেখেছে এখন আর স্পষ্ট মনে করতে পারলো না। ফিরে আসার সময় টেবিলের নিচে কিসে যেন পা ঠেকতেই ও চমকে উঠলো। মেঝে পর্যন্ত ঝোলানো টেবিলের ঢাকা। ঝুঁকে টেবিলের ঢাকাটা একটু তুলতেই ও দেখলো কোন বাচ্চার শীর্ণ দুটো হাত। গ্রেবার হেসে ফেললো। বাচ্চাটা ভয়ে এখানে এসে লুকিয়েছে। কিছু না বলে ও আবার তার চেয়ারে এসে বসলো।

ফ্রাউ হির্শলাণ্ড ফিরে এলেন। ট্রেতে এক গ্লাস লাল মদ, প্লেটে দু-টুকরো রুটি।

'এইটুকু খেয়ে নাও, বাবা।'

'এসবের কোন দরকার ছিলো না।' গ্রেবার সংকোচ করলো।

'খুবই সামান্য···তাছাড়া, তুমি আমার ছেলের মতন···'

গ্রেবার গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো।

'আপনার ছেলে কিন্তু ভালোই আছে। আমি যখন আসি, আমরা তখন নিরাপদ স্থানেই ছিলাম।'

প্রৌঢ়া আবার অভিব্যক্তিহীন বোবা দৃষ্টি মেলে তাকালেন। গ্রেবার গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো। আশ্চর্য! উনি তো এবারেও জিজ্ঞেস করলেন না ওরা এখন কোথায় আছে, খাওয়া-দাওয়া কেমন, লড়াইয়ের পরিস্থিতি কি, সব মায়েরাই সাধারণত যেসব প্রশ্ন করে থাকেন।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর উনি ম্লান স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও তাহলে ভালোই আছে?'

'ভালো বলতে রণাঙ্গনে যতটা ভালো থাকা সম্ভব। অনেকটা এখানেরই মতো অবস্থা বলতে পারেন।'

গ্রেবার অপেক্ষা করলো। কিন্তু না, উনি আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

গ্রেবার ভাবলো উনি বোধহয় টেবিলের নিচে লুকনো বাচ্চাটার জন্যে অস্বস্তি বোধ করছেন। অস্বস্তি বোধ করলো গ্রেবার নিজেও। ও উঠে দাঁড়ালো। 'আমি হির্শলাণ্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। যদি কোন খবর পাঠানোর থাকে দিন, আমি আর কয়েকদিনের মধ্যেই সীমান্তে ফিরে যাবো।'

'না।'

'কোন অসুবিধে হবে না। কোন চিঠি কিংবা প্যাকেট আমাকে নিঃসংকোচে দিতে পারেন। যদি বলেন তো যাবার আগেও একবার দেখা করে যেতে পারি।'

উনি মাথা নাড়লেন।

গ্রেবার স্তম্ভিত বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকালো। মা হিসেবে এই ধরনের ব্যবহার ওর কাছে কল্পনাতীত। ওর মনে হলো উনি বোধহয় ওকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। কথাটা ভাবতেই গ্রেবারের খুব খারাপ লাগলো। রাগ করে পকেট থেকে ও কাগজপত্তর সব টেনে বার করলো। 'আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না, কিন্তু এই দেখুন আমার পরিচয়পত্র···'

ফ্রাউ হির্শলাণ্ড পরিচয়পত্রটা ছুঁলেনও না। বরং এমন কাতর চোখে তাকালেন, গ্রেবারের পিত্তি জ্বলে গেলো।

'সত্যি কি না, দেখুন।'

চোখের দৃষ্টি উনি নামিয়ে নিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'ও মারা গ্যাছে।'

'কি বললেন?'

'মারা গ্যাছে।'

গ্রেবারের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। 'অসম্ভব! কয়েকদিন আগেও আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি।'

ভদ্রমহিলা কোনরকমে চোখের পাতা দুটো টেনে তুললেন। 'পরশুদিন খবর এসেছে।'

'কিন্তু···'

'না না···দোহাই তোমার, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

গ্রেবার বোবা চোখে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে ও হির্শলাণ্ডের মুখটা মনে করার চেষ্টা করলো। ব্যক্তিজীবনে ওকে ও চেনে না বললেই চলে।

এমন কি ওর প্রথম নামটাও জানে না। হঠাৎ ওর মনে পড়লো হির্শলাণ্ডের দেওয়া সিগারেটগুলোর কথা। আর তখনই মনে হলো কোথা থেকে যেন একটা বোবা আঁধার ঘনিয়ে আসছে ওর বুকের চারপাশে। এলিজাবেথের জন্যে মনটা ওর ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো।

কারখানার অদূরে দাঁড়িয়ে গ্রেবার উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে ছিলো। ছুটির কিছুক্ষণ পরেও এলিজাবেথকে না দেখে ও অস্থির হয়ে উঠলো। অশুভ একটা আশঙ্কায় গ্রেবার মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠছিলো। ঠিক যখন ফিরে আসার কথা ভাবছিলো, হঠাৎ পেছনে শুনলো খিলখিল মেয়েলী হাসির শব্দ। 'ইস্, যা সুন্দর দেখাচ্ছে না! আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। ভেবেছিলাম ··'

'কি ?'

'গেস্টাপোর কেউ। তাই মেয়েদের পেছনে নিজেকে আড়াল করে·· '

'এলিজাবেথ !'

'হ্যাঁ এর্নস্ট, সত্যিই তাই ভেবেছিলুম।' গ্রেবারের বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ হাসলো। 'তোমাকে কিন্তু আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন তরুণ নায়ক।'

'কিন্তু আমার নিজেকে কি মনে হচ্ছে জানো ?'

'কি ?'

'ঠিক যেন একশো বছরের প্রাচীন প্রবৃদ্ধ।'

'কেন এর্নস্ট ?'

'জানি না। হয়তো এই পোশাকটার জন্যেই।'

'না এর্নস্ট, এই পোশাকটায় তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে।'

'চুলোয় যাক ! তারপর, তোমার ওদিককার খবর কি ?'

'ভালো।'

'ভালো মানে ?'

এলিজাবেথ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। তারপর গ্রেবারের উৎকণ্ঠিত চোখের দৃষ্টি চিনতে পেরে মুচকি মুচকি হাসলো। 'ভালো মানে ভালো। আমি আজ টিফিনে বেরিয়েছিলাম। যেখানে যা আবেদন করার সব করা হয়ে গ্যাছে।'

'কোন অসুবিধে হয়নি ?'

'ওমা, অসুবিধে হবে কেন !'

'তুমি জানো না এলিজাবেথ, সারাটা দিন আমার কিভাবে যে কেটেছে! যখন শুনলাম এই ধরনের অনুসন্ধান গেস্টাপোর মাধ্যমেও হতে পারে, তখন থেকেই একটা বিশ্রী আশঙ্কা কেবল আমার মনের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছিলো।'

এলিজাবেথ থমকে দাঁড়ালো। 'তুমি ভেবেছিলে বাবার জন্যে ওরা আমাকেও হয়তো গ্রেপ্তার করতে পারে, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'সে আশঙ্কা এখনও চলে যায়নি, এর্নস্ট।'

'জানি। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।'

'আবেদনপত্রগুলো আবার ফিরিয়ে নিতে পারি।'

'তাতে সন্দেহ বাড়বে বই কমবে না।'

'তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'না এলিজাবেথ, এখন আর কোন উপায় নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এ ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।'

দুজনে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো। কারখানাটা বড় একটা পার্কের মধ্যে গাছপালা দিয়ে ঘেরা। চট্ করে দেখলে মনে হবে ওটা বিরাট পরিত্যক্ত একটা বাড়ি। গ্রেবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো। 'কারখানাটার তো এখনও কোন ক্ষতি হয়নি দেখছি ?'

'না।'

'কিন্তু এমন খোলামেলা জায়গায়, ওপর থেকে চেনা তো খুব সহজ'

'ছাদের ওপরে কৃত্রিম ঘাস দেওয়া আছে।'

'তোমাদের নিজস্ব কোন বিমান আক্রমণের চোরাকুঠরি নেই ?'

'আছে।'

'মজবুত ?'

'হ্যাঁ, খুব মজবুত।'

গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকালো। ছন্দিল পায়ে ওর পাশাপাশি হেঁটে চলেছে, কোথাও কোন জড়তা নেই। ফল্গু স্রোতের মতো কি যেন একটা ফেনিয়ে উঠলো ওর বুকের মধ্যে। 'তুমি বিশ্বাস করো এলিজাবেথ, আমার যা-কিছু ভয় শুধু তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, এর্নস্ট। নতুন করে ভয় পাবার আমার আর কিছু নেই।'

'কিন্তু আমার আছে, এলিজাবেথ। তুমি যখন কাউকে ভালবাসো, অজস্র নতুন ভয় তোমাকে তখন পেয়ে বসে যার সম্পর্কে তুমি আগে কিছুই জানতে না।'

এলিজাবেথ স্খলিত ঝরনার মতো ঝরঝর করে হাসলো।

গ্রেবার গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো। 'হাসছো যে বড় ?'

'বারে ! হাসির কথা বললে হাসবো না ?'

গ্রেবার প্রথমে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারলো খুশিতে চলকে ওঠা এলিজাবেথের চপল চোখের চাউনি দেখে। সত্যি, প্রথমে এলিজাবেথই ভয় পেয়েছিলো আর গ্রেবার ছিলো নিরুদ্বিগ্ন। এখন ঠিক তার উলটো। শুধু উলটোই নয়, ভয়কে দু পায়ে মাড়িয়ে এলিজাবেথ যেন ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছল তরুণীমায় আবিল হয়ে উঠছে।

পায়ে পায়ে ওরা দুজন হিটলারপ্লাটস্ পেরিয়ে এলো। গির্জার পেছনের আকাশটা অনন্য একটা সূর্যাস্তের আলোয় রাঙা হয়ে রয়েছে। গ্রেবার এলিজাবেথের কাঁধে হাত রাখলো। 'এই দেখ, কি সুন্দর !'

এলিজাবেথ আরও নিবিড় হয়ে এলো ওর পাশে। 'এত সুন্দর সূর্যাস্ত আমি অনেকদিন দেখিনি, এর্নস্ট।'

ওরা এগিয়ে চললো। আরও গাঢ় হয়ে উঠলো পশ্চিমের আকাশ। সামনের দিক থেকে আসা পথচারীদের মুখে পড়ছে তার আরক্তিম আভা। গ্রেবারের হঠাৎ মনে হলো প্রতিটি মুখই যেন ওর আশ্চর্য চেনা। কেন এমন হলো ? ও তো এর আগে ওদের কখনও দেখেনি ! ওর মতো একই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত বলেই কি ওদের চিনতে পারছে ? হয়তো তাই। মানুষকে সহজে কেউ চিনতে পারে এবং দুঃসাহসী হতে পারে তখনই, যখন সে নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা। অন্য অর্থে ও নিজেও তাই। আর এখন ওর কাছে এটা একটা দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রেবার বুক খালি করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ওর মনে হলো শত্রুরাজ্যে দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে আজ ও যেখানে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে, মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি সেখানেও কোন অংশে কম নয়। তবু এই মুহূর্তে এলিজাবেথের এই নিবিড় কোমল সান্নিধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে ওর ভীষণ ইচ্ছে হলো।

'আশ্চর্য ! দ্যাখো দ্যাখো, ঠিক যেন আকাশে কে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে !' এলিজাবেথ কপালের ওপর থেকে চুলের গুচ্ছটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিলো। 'এখন বসন্তকাল, তুমি জানো ?'

'হ্যাঁ, কোথায় যেন ভায়োলেটের গন্ধ পেলাম।'

আঠেরো

ব্যোটশার জিনিসপত্তর সব গোছগাছ করছে। অন্যেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত ওকে খুঁজে পেলে?'

'হ্যাঁ।'

'এবং রাস্তায়?'

'হ্যাঁ, রাস্তাতেই। ও তখন দাঁড়িয়েছিলো কেলারষ্ট্রাসে আর বিয়েরষ্ট্রাসের মোড়ে ঠিক ছাতার দোকানটার সামনে।' ব্যোটশার উজ্জ্বল চোখে তাকালো। 'বিশ্বাস করো, প্রথমে আমি ওকে চিনতেই পারিনি।'

'এতদিন ও কোথায় ছিলো?'

'এরফুটের কাছে একটা তাঁবুতে। তারপর কি হলো শোন—ছাতার দোকানের সামনে ও তো দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে আমি হনহন করে হেঁটে যাচ্ছি। ওকে আমি দেখতেও পাইনি। পেছন থেকে কে যেন ডাকলো, 'অটো!' আমি চমকে ফিরে তাকালুম। ও বললো, 'তুমি আমাকে চিনতে পারছো না, অটো?' আরে ভাই, চিনবো কি করে তোমরাই বলো? কোন মেয়ের শরীরের ওজন যদি আশি পাউণ্ড কমে যায়, তখন তাকে কি চেনা যায়?'

'তাঁবুটার কি নাম?'

'নামটা আমি ঠিক জানি না। আচ্ছা, ওকে জিজ্ঞেস করবো। তারপর কি হলো শোন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'আলমা, তুমি?' ও বললো, 'হ্যাঁ অটো, আমি। আমি জানতুম তুমি ছুটিতে আসবে, আমার মন বলছিলো। তাই আমি এখানে ফিরে এসেছি।' আমার পা তো তখন বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছে। চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। তাকাবো কি, প্যাঁকাটির মতো এই রোগা হয়ে গ্যাছে। কঙ্কালসার শরীরে জামাটা ঢলঢল করছে। দুশো পাউণ্ডের জায়গায় একশো কুড়ি পাউণ্ড...'

'কত লম্বা?' ফেল্ডমান ওকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'মানে?'

'বলছি তোমার স্ত্রী কত লম্বা?'

'পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। কেন?'

'তাহলে এখন স্বাভাবিক ওজনই আছে।'

'স্বাভাবিক ওজন! বাজে বোকো না।' ব্যোটশার চটে উঠলো।

'তোমার কাছে হতে পারে, আমার কাছে নয়। আমি চাই আগেরই মতো সুন্দর স্বাস্থ্যল শরীরে ওকে দেখতে। আর সেই জন্যেই কি আমরা লড়াই করছি না ?'

'তিন বছর সীমান্তে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি এই শিখলে ?' রয়টার ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলেন। 'আমরা লড়াই করছি আমাদের প্রিয় ফুয়ার আর পবিত্র জন্মভূমির জন্যে, তোমার স্ত্রীর হারানো ওজনের জন্যে নয়।'

'হারানো ওজন! সে তো এখন বলবেনই। ওর আগেকার স্বাস্থ্য দেখলে···'

'বেশ তো,' রয়টার হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন। 'এখন যখন খুঁজে পেয়েছো, ওকে নিয়ে এবার সুখী হবার চেষ্টা করো।'

'নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে! আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।'

'শুধু চেষ্টা করলে হবে না, ওকে ভালো করে খাওয়াতে হবে।' ফেল্ডমান ফোড়ন কাটলো।

'তা তো জানি। কিন্তু খাওয়াবোটা কি? আজকের দিনে রেশনের কুপনে কারুর আধপেটাও কুলোয় না।'

'পেছনের দরজা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।'

'মুখে ওসব উপদেশ দেওয়া খুব সহজ।' ব্যোটশার এবার রীতিমত খেপে গেলো। 'আমার বলে আর মাত্তর তিনদিন ছুটি আছে। কড-লিভার তেলে ডুব দিয়ে ও যদি চান করে আর দিনে সাতবার করেও খায়, তবু তিনদিনে তিন পাউণ্ডও বাড়বে না।'

ফেল্ডমান ওকে রাগাবার জন্যে ইচ্ছে করেই বললো, 'কেন, তোমার জলহস্তিনী তো রয়েছে। ওর কাছ থেকে কিছু মাংস ধার চেয়ে নাও।'

গ্রেবার মনে মনে ভাবলো, শেষ সময়ে একটা হাতাহাতি কাণ্ড না বেধে ওঠে। কিন্তু না, ব্যোটশার কোন উত্তর দিলো না। গুম হয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবলে। তারপর উঠে সামরিক ঝোলাটা কাঁধে ফেলে নিলো। গ্রেবার আন্তরিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আর তোমার স্ত্রী কোথায় থাকবে, কিছু ঠিক করেছো ?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি। ভেবেছি দুটো রাত এখানে-ওখানে কোথাও একসঙ্গে কাটিয়ে দেবো। তারপর আমি ফিরে যাবো সীমান্তে আর ও ফিরে আসবে ওর তাঁবুতে।' ব্যোটশার ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'দেখি, ওকে যতটা খুশি করতে পারি।'

দরজার কাছ থেকে ও বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

রয়টার ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'বেচারি!'

'সীমান্তে এখন দারুণ অবস্থা মশাই, দারুণ অবস্থা! ভালো না খারাপ, শুধু সেইটেই যা কেউ বলতে পারছে না।'

'একটা শিশুও বলতে পারে।' সামরিক তথ্য দপ্তরের তরুণ কর্মচারীটিকে মুচকি মুচকি হাসতে দেখে গ্রেবারের পিত্তি জ্বলে গেলো। 'কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমি তো এখন ছুটিতে।'

'সে কথা আপনি জোর করে বলতে পারেন না।'

'কেন?'

'আপনি কি করে জানছেন যে আজই আসা জরুরী নির্দেশনামাটা আমি আপনাকে দেখাতে পারবো না?'

'সেটা অবশ্য আলাদা কথা।' মুখে বললেও সার্টের ভেতরটা তখন ওর ঘামে ভিজে উঠেছে।

'তবে আর বলছি কি। খবর এসেছে একখুনি রঙরুট পাঠাতে হবে এবং বিশেষ কারণ ছাড়া সমস্ত ছুটি বাতিল হয়ে গ্যাছে। বুঝুন ঠ্যালা!'

গ্রেবার সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলো। তারপর রুক্ষ চিবুকে হাত বোলালো। 'বিশেষ কারণ বলতে?'

'যেমন ধরুন পরিবারের কারুর মৃত্যু, গুরুতর অসুস্থতা, কিংবা ওই ধরনের কিছু।' তরুণ কেরানী প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলো। 'আপনি অবশ্য ইচ্ছে করলে গা-ঢাকা দিতে পারেন। ওরা যদি আপনাকে খুঁজেই না পায়, ফিরোত আর পাঠাবে কি করে? তাঁবুতে একদম যাবেন না। ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও কাটিয়ে দিন। কি করবে? ওরা আপনার কিংসু করতে পারবে না। বড়জোর নতুন ঠিকানা জানাতে না পারার জন্যে কৈফিয়ত তলব করতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।'

'বিয়ে করছি, সেটা কি কোন কারণ হতে পারে না?'

'বিয়ে করছেন?'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তা আমি এখানে এসেছি।'

'হুঁ, নিশ্চয়ই। বিয়েটাও একটা কারণ হতে পারে।'

গ্রেবার ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো। 'আমি জানতে চাই পরিচয়পত্র ছাড়া আমার আর অন্য কাগজপত্তর কিছু লাগবে কিনা?'

'না না,' তরুণ চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে পর পর কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ছুঁড়ে দিলো। 'আপনারা মশাই খাস সীমান্তের সৈনিক, আপনাদের আর অন্য কিছু লাগবে না। আর যদি কিছু একান্ত দরকার হয়েই পড়ে, সোজা আমার কাছে চলে আসবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।'

'ধন্যবাদ!'

তরুণ ঠোঁটের কোণে হাসলো। 'তা বলে আবার এই পোশাকে যেন বিয়ে করতে যাবেন না। আমাদের পোশাক বিভাগে গিয়ে এটা পালটে নিন।'

'দেখি।'

'দেখি নয়, একখুনি যান। বুঝিয়ে বলুন যে আপনি বিয়ে করছেন, ভালো দেখে নতুন একটা ইউনিফর্ম দিতে। বলবেন আমি পাঠিয়েছি। আর কোন ভালো সিগারেট আছে?'

'হ্যাঁ, আর এক প্যাকেট আছে।'

'আমার জন্যে নয়, পোশাক বিভাগের সার্জেণ্ট মেজরের জন্যে বলছিলুম।'

'ও, আচ্ছা।'

'সোজা পেছন দিকে চলে যান,' তরুণ ঘড়ি দেখলো। 'হ্যাঁ, ওঁকে এখন পাবেন।'

'আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।'

'বলুন?'

'এই ধরনের বিয়েতে মেয়ের তরফ থেকে বিশেষ কোন কাগজপত্তর কিছু লাগবে কি না বলতে পারেন?'

'জোর করে বলতে পারবো না, তবে···আচ্ছা, উনি কি ইহুদি?'

'না।'

'তাহলে আমার যতটা মনে হয় লাগবে না।'

পোশাক বিভাগের সার্জেণ্ট মেজরকে খুঁজে পেতে ওর কোন অসুবিধে হলো না। বেশ লম্বা চওড়া ভারিক্কি চেহারার মানুষ। দু চোখের রঙ সম্পূর্ণ আলাদা। একটা চোখের মণি হালকা বাদামী, অন্যটা গাঢ় নীল রঙের।

'অমন হাঁ করে তাকাবার কি আছে?' সার্জেণ্ট মেজর খেঁকিয়ে উঠলেন। 'কেন, পাথরের চোখ কি এর আগে কখনও দেখেননি?'

'দেখেছি। তবে রঙের এত তফাত…'

'নীলটা আমার নয়। এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। আমারটা কাল মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেলো।'

গ্রেবার মুখে চুকচুক শব্দ করে দুঃখ প্রকাশ করলো। তারপর বললো, 'আজকালকার সব জিনিসই রদ্দি হয়ে গ্যাছে।'

'তা অবশ্য ঠিক,' মেজর গ্রেবারের সর্বাঙ্গে একবার মরা-চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। 'আপনি যা পরে রয়েছেন, এর চাইতে ভালো পোশাক কিন্তু আমাদের আর একটাও নেই।'

গ্রেবার আড় চোখে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। প্রথমেই ওর চোখ পড়লো ওঁর উজ্জ্বল নীল চোখটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ও দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। বিনডিং-এর দেওয়া সিগারেটের প্যাকেটটা রাখলো টেবিলের ওপর।

বাদামী চোখে একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উনি তাক থেকে একটা সার্ট নিয়ে এলেন। 'দেখুন তো এটা চলবে কি না?'

গ্রেবার সার্টটা ছুঁলোও না। পকেট থেকে খুব সন্তর্পণে কনিয়াকের চ্যাপ্টা একটা বোতল টেনে বার করলো। তারপর রেখে দিলো সিগারেটের প্যাকেটের পাশে। মেজরের মরা-চোখের দৃষ্টি এবার যেন জ্বলে উঠলো। দ্রুত পায়ে উনি ভেতরে চলে গেলেন। গ্রেবার মনে মনে হাসলো। নতুন একজোড়া সার্ট প্যান্ট নিয়ে মেজর ফিরে এলেন। গ্রেবার প্রথমেই প্যান্টটা তুলে নিলো। কেননা ওর প্যান্টের অবস্থাই সবচেয়ে কাহিল। পোশাকটা নতুনের মতো মনে হলেও, নতুন নয়। প্যান্টের এক জায়গায় বেশ খানিকটা লালচে দাগ রয়েছে।

মেজর বললেন, 'এইটেই আমাদের সবচেয়ে ভালো পোশাক।'

'হ্যাঁ। কিন্তু এই দাগটা…'

'ও কিছু নয়।'

'রক্তের বলে মনে হচ্ছে।'

'না না, রক্ত নয়। জলপাইয়ের তেলের দাগ। একটু বেঞ্জিন দিলেই উঠে যাবে।'

গ্রেবার ওঁর কথায় বিশ্বাস করলো না। কিন্তু বিশ্বাস না করা ছাড়া এখন আর কোন উপায়ও নেই।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মেজর বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি এটাও নিন আর পুরনো পোশাকটাও আপনাকে ফিরেত দিতে হবে না। কেমন রাজি তো?'

'ঠিক আছে।'

'আরে, তুমি!' মুটসিগ দস্তুরমতো অবাক হলো। 'তুমি আসবে আমি ভাবতেই পারিনি, এর্নস্ট।'

'ঠিক সুযোগ করে উঠতে পারবো আমিও কখনও ভাবিনি, কার্ল।' গ্রেবার আন্তরিক ভঙ্গিতে ওর হাতে চাপ দিলো। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।'

'খুব ভালো করেছো। স্টকমানও এখানে রয়েছে। ও তো তোমার সঙ্গে আফ্রিকায় ছিলো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

স্টকমানের ডান হাতটা নেই। অন্য দুজন পঙ্গুর সঙ্গে ও স্কাট্ খেলছিলো। মুটসিগের কথায় ও গ্রেবারের দিকে চোখ তুলে তাকালো। 'কি ব্যাপার, গ্রেবার! কেমন আছো?'

'ভালো।'

'তারপর? এখন ছুটিতে?'

'হ্যাঁ।'

অন্য দুজন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে গ্রেবারের দিকে তাকালো। অসহায় অথচ নির্লিপ্ত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে গ্রেবারের নিজেকে কেমন যেন অপরাধী অপরাধী মনে হলো।

'সেই আফ্রিকার পর থেকে তোমার সঙ্গে আর দেখাই হয়নি।'

'ওরা ওখান থেকে আমাকে সোজা রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেয়।'

স্টকমান ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'তোমার ভাগ্য ভালো, গ্রেবার। আমি ছাড়া আর কেউ পালাতে পারেনি। সবাই যুদ্ধে বন্দী হয়।'

'আমরা খেলছি, না ইয়ার্কি মারছি—' মাঝের খেলুড়েটি রেগেমেগে তাস ফেলে দিলো।

গ্রেবার দেখলো ওর দুটো পা-ই ঊরুর ওপর থেকে কাটা। ভ্রূ নেই। চোখের পাতা দুটো সবে নতুন উঠেছে। দগদগে লাল। দেখলে মনে হবে যেন জ্বলছে।

গ্রেবার অস্বস্তি বোধ করলো। 'খেলে নাও, আমি বরং একটু বসছি।'

স্টকমান বললো, 'শুধু এক দান।'

গ্রেবার জানলায় মুটসিগের পাশে এসে বসলো।

'আর্নল্ডের কথায় তুমি রাগ কোরো না, এর্নস্ট।' মুটসিগ ফিসফিস করে বললো, 'বেচারার কপালটাই খারাপ।'

'কি ব্যাপার ?'

'কয়েকদিন আগে ওর মা এসেছিলেন। ওঁর কাছেই শুনলো বউটা নাকি নোংরামি করছে। রোজ রাত্তিরে কোথায় যেন বেরিয়ে যায়।'

'ধুত্তোর, এরকম তাস পেলে কি খেলা যায়!' স্টকমান তাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। আর্নল্ড মুচকি হেসে ওর তাস দেখালো। স্টকমান চটে উঠলো, 'কি করে জানবো শালার তিনটে গোলামই তোমার হাতে ঠেলে উঠবে!'

'বউ-ভাগ্য খারাপ হলে কি হবে, তাসের ভাগ্য কিন্তু আমার খারাপ নয়।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

গ্রেবারের দূরায়ত চোখের দিকে তাকিয়ে মুটসিগ জিজ্ঞেস করলো, 'কি ভাবছো, এর্নস্ট ?'

'কই, কিছু না তো!'

'জানো, একটা মেয়ে আমাকে ভালবাসতো। মুয়েনস্টার থেকে এখনও আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। আমার পায়ের খবর ও কিছু জানে না।'

'জানিয়ে দাও ভায়া, জানিয়ে দাও। গোপন করে কোন লাভ নেই।' স্টকমান কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা কেউ টের পায়নি। 'মেয়েরা আবার কানা-খোঁড়াদের ঠিক সহ্য করতে পারে না।'

মুটসিগ করুণ চোখে তাকালো। 'সেটা কোন বড় কথা নয়। আমরা এখনও বেঁচে আছি এইটেই একমাত্র ঘটনা।'

'বোধের দিক থেকে কথাটা সত্যি হলেও বাস্তব দিক থেকে নয়। সারা জীবন তুমি এই ধারণাকে আঁকড়ে ধরতে পার না। যুদ্ধ শেষ হলেই দেখবো তুমি তখন আর বীর নায়ক নও, নিতান্তই একজন পঙ্গু। তখন তোমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' আর্নল্ড ওখানে বসে বসেই ওদের কথায় নাক গলালো। 'দেখো, যুদ্ধে আমরা জয়ী হবোই। তাছাড়া বুকে বুক দিয়ে লড়াই করে আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। ব্যাস, ফুরিয়ে গেলো।' আর্নল্ড লাল চোখের পাতা নাচিয়ে হাসলো।

গ্রেবার ওর দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

'না, ফুরিয়ে গেলো না,' স্টকমান ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। 'যুদ্ধে

যদি আমরা জয়ী হইও—তোমার এই হতাশা এই নিঃসঙ্গতা এই যৌবন, তাকে তুমি কোথায় রাখবে? মনে করো তোমার দুটো হাত যদি নাই থাকে, তাহলে তুমি কেমন করে তোমার শয্যাসঙ্গিনীকে আদর করবে, আলিঙ্গন করবে, আর্নল্ড? তাছাড়া যুদ্ধজয়ের কোন প্রশ্নই আসে না।'

'নিশ্চয়ই না,' আর্নল্ড দু চোখের সমস্ত ঘৃণা, নিঃশব্দ ভৎসনা ঢেলে গ্রেবারের দিকে তাকালো। 'যারা শক্তসমর্থ জোয়ান, তারা যদি ফুল-বাবুটি সেজে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ছুটি উপভোগ করে, কস্মিনকালেও আমরা এ লড়ায়ে জিততে পারবো না।'

আক্রমণের কেন্দ্রস্থলটা কোথায় গ্রেবারের বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না। আর সেই জন্যেই হয়তো ও এতক্ষণ মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিলো। তবু কোন উত্তর দিলো না। ও জানে কানা-খোঁড়ার সঙ্গে কখনও ঝগড়া করতে নেই। প্রয়োজন হলে বুকে গুলি-বেঁধা কোন মুমূর্ষু কিংবা তার চেয়েও মারাত্মক অবস্থার কোন মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়, কিন্তু খঞ্জ কিংবা পঙ্গুর সঙ্গে নৈবচ নৈবচ।

গ্রেবার উঠে পড়লো। 'আজ আমি চলি, কার্ল।'

মুটসিগের করুণ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। 'আর একটু বসবে না?'

'আমাকে আরও দু-এক জায়গায় যেতে হবে···সত্যি, বিশ্বাস করো।'

গ্রেবার রাস্তায় নেমে এলো। বিকেলের রোদ এখন নরম হয়ে এসেছে। হঠাৎ ওর এলিজাবেথের জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

পোলমানের সঙ্গেও দেখা করলো। বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন। 'এর্নস্ট, তুমি!' এমনভাবে কথাটা বললেন যেন উনি অন্য কাউকে আশা করছিলেন।

'আমি আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করবো না, মাস্টারমশাই। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।'

'বাইরে না দাঁড়ানোই ভালো। এসো, ভেতরে এসো।'

ওরা ভেতরে এলো। সেই সবুজ বাতিটা জ্বলছে। ভেতরের বদ্ধ বাতাসে গ্রেবার সদ্য-খাওয়া সিগারেটের গন্ধ পেলো। অথচ পোলমান সিগারেট খান না বা ওঁর হাতেও কোন সিগারেট নেই। তাছাড়া প্রথম দিনের মতো আজও ও পরিবারের অন্য কাউকে দেখতে পেলো না। তাহলে সেদিন জোরে কথা বলে উনি কাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন! গ্রেবার এ ধাঁধার

মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারলো না।

'হ্যাঁ এর্নস্ট, তুমি কি যেন বলবে বলছিলে ?'

গ্রেবার এদিক-ওদিক তাকালো। 'আপনার কি এই একটাই ঘর ?'

'কেন বলো তো ?'

'আমি একজনকে কয়েকদিনের জন্যে এখানে লুকিয়ে রাখতে চাই। অবশ্য জানি না সেটা সম্ভব কি না।'

পোলমান গুম হয়ে কি যেন ভাবলেন।

গ্রেবার বললো, 'পুলিসের খাতায় নাম লেখানো কেউ নয়। আমি শুধু সতর্কতার জন্যেই এটা করতে চাই। হয়তো তার দরকার হবে না···হয়তো সবটাই আমার মনগড়া কল্পনা।'

'কিন্তু তুমি আমার কাছে এলে কেন ?'

'যেহেতু আমি আর অন্য কাউকে চিনি না।'

গ্রেবার নিজেই জানে না ও কেন এখানে এলো। শুধু ভেবেছিলো যদি কখনও তেমন করে প্রয়োজন হয়, একটা গোপন আস্তানা আগে থেকে খুঁজে রাখা ভালো।

'কার জন্যে ?'

'এক ভদ্রমহিলা, যাকে আমি বিয়ে করতে চাই। ওর বাবা এখন বন্দী-শিবিরে রয়েছেন। আমার ভয় হচ্ছে, ওকেও ওরা গ্রেপ্তার করতে পারে। যদিও ও কিছু করেনি···'

'এ সময়ে অসম্ভব বলে কিছুই নেই, এর্নস্ট। এবং পরে অনুশোচনা করার চাইতে সতর্ক হওয়া অনেক ভালো। তুমি ইচ্ছে করলে এই ঘরটাই ব্যবহার করতে পারো।'

গ্রেবারের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মাস্টারমশাই।'

পোলমান মৃদু হাসলেন। আগে ওঁকে যতটা অসহায় মনে হয়েছিলো এখন আর ততটা মনে হচ্ছে না। গ্রেবার ইতস্তত করলো। 'আমার হয়তো আদৌ লাগবে না, তবু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ওরা দুজনে দাঁড়িয়েছিলো বইয়ের তাকগুলোর সামনে। পোলমান যেন অপার স্নেহে বইগুলোর দিকে তাকালেন। 'তুমি ইচ্ছে করলে দু-একটা বই সঙ্গে রাখতে পারো। সন্ধ্যেগুলো হয়তো খারাপ লাগবে না।'

গ্রেবার মাথা নাড়লো। 'না, বই এখন আর আমাকে আনন্দ দিতে পারবে না। এস এস-দের অমানবিকতা, বন্দীশিবিরের নিপীড়ন, সাধারণ

মানুষের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এগুলো আমার কাছে কেমন যেন বেমানান বলে মনে হচ্ছে।'

'তুমি ঠিক বলেছো, এর্নস্ট। ওগুলোর সঙ্গে এগুলো মানানো যায় না। তাছাড়া যখন ভাবি অধিকাংশই কবি শিল্পী সাহিত্যিক স্রষ্টারা এখন দিন যাপন করছেন বন্দীশিবিরে, তখন নিজেকে সত্যিই অপরাধী বলে মনে হয়।'

'আমারও।'

পোলমান স্নেহের চোখে গ্রেবারের দিকে তাকালেন। 'তুমি বিয়ে করছো, এর্নস্ট ?'

'হ্যাঁ।'

পোলমান তাক থেকে একটা বই নামিয়ে নিলেন। 'আমি তোমাকে আর কিছুই দিতে পারবো না, এই বইটা তুমি রেখে দাও। এতে পড়ার কিছু নেই, শুধু ছবি। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির বই। যখন কিছু পড়তে ভালো লাগে না, তখন আমি এই বইটা দেখি। যতক্ষণ বাতিটায় তেল থাকে, ছবি আর কবিতাতে সময়টা কাটিয়ে দিই। এটা তুমি রেখে দাও।'

'ধন্যবাদ। আজ তাহলে চলি মাস্টারমশাই।'

'এসো।'

গ্রেবার যখন কারখানার সামনে এসে পৌঁছলো, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো অনেক নিচু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। আধো আলোছায়ায় একদল নবাগত সৈনিক কুচকাওয়াজ করতে করতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ও-ও তো ওদের একজন হতে পারতো! হঠাৎ ওর নজর পড়লো দড়ি-পাকানো শীর্ণ একটা গাছের ওপর ফুলে ফুলে সারা গাছ ছেয়ে গেছে। আশ্চর্য! ও যখনই কোন রিক্ত গাছ দেখে, ওর টানটান শক্ত পেশীতে কিসের যেন জোয়ার লাগে। এই মুহূর্তে ওর পোলমানের মুখটা মনে পড়লো। বৃদ্ধ আমাকে কোন সাহায্যই করতে পারলেন না, অথচ যখনই ওঁকে দেখি আমি যেন জীবনের আরও কাছে আরও গভীরে প্রবেশ করি।

উনিশ

'এক মিনিট। দেখছি আপনার কাগজপত্তর কোথায় আছে।'

বয়স্ক কেরানী টেবিল থেকে তাঁর চশমাটা তুলে নিলেন। তারপর ত্রস্ত পায়ে কাঠের দেওয়াল দিয়ে ভাগ কর্রা ওপাশের ঘরে চলে গেলেন।

গ্রেবার রুদ্ধশ্বাসে ওঁর মুখের প্রতিটি রেখা লক্ষ্য করছিলো। এবার ওর গমনপথের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে এলিজাবেথের দিকে তাকালো। তারপর ওর কানে কানে বললো, 'দরজার বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমাকে মাথা থেকে টুপি খুলতে দেখলেই একছুটে পোলমানের ওখানে চলে যাবে। কোনরকম দ্বিধা করবে না। যাও। আমি একটু পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করছি।'

এলিজাবেথ ইতস্তত করলো।

'একি, যাও!' গ্রেবার আস্তে করে ওকে ঠেললো। 'বলা যায় না, বুড়ো ছাগলটা হয়তো কাউকে খবর দিতে গেলো! আমাদের সতর্ক থাকা ভালো। যাও এলিজাবেথ, বাইরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

'কিন্তু আমাকে যদি কোন প্রশ্ন করেন?'

'আমি তোমাকে খবর দেবো। বলবো তুমি অসুস্থ বোধ করছো, তাই খোলা হাওয়ার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছো। আর দেরি কোরো না লক্ষ্মীটি, যাও।'

এলিজাবেথ চলে গেলো।

গ্রেবার কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো।

'ফ্রয়লাইন ক্রুজে কোথায়?'

গ্রেবার চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো। 'ও একখুনি আসছে। আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন হবে?'

'না। কবে আপনারা বিয়ে করতে চান?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।'

'আপনারা ইচ্ছে করলে এখনই বিয়ে করতে পারেন। কাগজপত্তর সব ঠিক আছে।' কেরানীবাবু অদ্ভুত ভাসা-ভাসা চোখে হাসলেন। 'আপাতকালীন অবস্থায় সৈনিকের সঙ্গে বিয়েতে আমরা কোনরকম গড়িমসি করি না।'

গ্রেবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো ওঁর হাতে ওদের কাগজপত্তর।

'তাহলে সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ফ্রয়লাইন ক্রুজে কোথায়?'

'হয়তো বাইরে আছে, আমি একখুনি ডেকে নিয়ে আসছি।'

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গ্রেবার দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো। বাইরে বেরিয়েও কোথাও এলিজাবেথকে দেখতে পেলো না। তাহলে ও কি পোলমানের ওখানে চলে গেছে! হঠাৎ চোখে পড়লো টানা বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে একটা থামের আড়ালে ও চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। 'ওমা, তুমি এখানে! আর আমি চারদিকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি। চলো, সব ঠিক আছে।'

ওরা ফিরে এলো।

কেরানীবাবু এলিজাবেথকে ওর কাগজগুলো ফিরিয়ে দিলেন। 'আপনি স্বাস্থ্য-উপদেষ্টা ডাক্তার ক্রুজের মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক ম্লান হাসলেন। 'আমি কিন্তু আপনার বাবাকে চিনতাম।'

একটু নীরবতার পর এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি ওঁর কোন খবর জানেন নাকি?'

'না। কেন, আপনি ওঁর কোন খবর পান না?'

এলিজাবেথের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। ও কোন উত্তর দিলো না, কেবল নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়লো।

উনি চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। হালকা নীল রঙের ঝাপসা দুটো চোখ। সম্ভবত চোখে খুব ভালো দেখতে পান না। 'তুমি মন খারাপ কোরো না, মা—বরং এই ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। ইচ্ছে করলে তোমরা আজই বিয়ে করতে পারো।'

'ভালোই তো!' গ্রেবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

এলিজাবেথ গ্রেবারের দিকে তাকালো, 'আজ দুপুরে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওই কথাই রইলো? দুপুরে দুটোর সময় তোমরা বড় স্কুল-বাড়িটায় চলে যেও। ওইটেই এখন রেজিস্ট্রি অফিস। ইতিমধ্যে যা-কিছু করার আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখবো, কেমন?'

'ধন্যবাদ।'

হালকা পায়ে দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলো।

'এখন কি করবে বলো তো?' গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো।

এলিজাবেথ হাসলো, 'বারে, আমার বুঝি আর কোন কাজ নেই?'

'তোমার আবার কি কাজ!' গ্রেবার অবাক হলো।

এলিজাবেথ বাতাসে ঢেউ তুলে খিলখিল করে হাসলো। 'মেয়েদের এ সময়ে নানান ধরনের টুকিটাকি কাজ থাকে। ওসব তুমি বুঝবে না।'

গ্রেবার দুষ্টুমির চোখে তাকালো। 'তাই নাকি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মশাই!'

কয়েকটা বাড়ির পরেই দর্জির দোকানটা খুঁজে পাওয়া গেলো। ক্যাঙ্গারুর মতো দেখতে একজন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সেলাই করছে।

'দেখুন, এই প্যান্টটা একটু পরিষ্কার করে দেবেন?'

দর্জি চোখ তুললো। 'দেখতেই তো পাচ্ছেন এটা দর্জির দোকান, ধোপার বাড়ি নয়।'

'জানি।' গ্রেবার ইতস্তত করলো। 'শুধু এটার ওপর একটু ইস্ত্রি চাপিয়ে দেবেন।'

'ব্যাস?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, দিন।' দর্জি গজগজ করতে করতে প্যান্টটা হাত বাড়িয়ে নিলো। দাগটা আঙুলে পরীক্ষা করে দেখলো।

গ্রেবার বললো, 'এটা রক্তের দাগ নয়, জলপাইয়ের তেলের। একটু বেঞ্জিন দিলেই উঠে যাবে।'

'আপনি তো সবজান্তা দেখছি, নিজে করলেই পারতেন। বেঞ্জিনে এ দাগ উঠবে না।'

'সেটা অবশ্য আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো বুঝবেন।' কণ্ঠস্বরে গ্রেবার ওকে খুশি করার চেষ্টা করলো। 'আসলে বিয়ের জন্যে আমার এই প্যান্টটা দরকার।'

'ঠিক আছে, আধ ঘন্টা পরে আসবেন।'

'আসুন!' কঙ্কালসার এক মহিলা চেয়ারটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দিলো। 'দাড়ি কামাবেন তো?'

'চুল কাটবো।'

'বস্থন।'

'পারবেন তো ?'

মহিলা সাদা চাদরে গ্রেবারের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে দিলো। 'আমার স্বামী যুদ্ধে যাবার পর থেকে আমি এই কাজ করছি।' মহিলা হাসলো। 'আমাকে দেখতে বিচ্ছিরি বলে ভাববেন না যে আমি চুল খারাপ কাটি।'

গ্রেবার ঝাপসা আয়নার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলো। কিন্তু এ ব্যাপারে ও যে নিপুণ সেটা বুঝতে গ্রেবারের বেশি সময় লাগে না। চিরুনি কাঁচি ক্লিপের দৌরাত্ম্যে দেখতে দেখতে ওর মুখের চেহারাই পালটে গেলো। কানের পাশ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

'স্যাম্পু দিই ? খুব ভালো ফ্রান্সের স্যাম্পু আছে।'

'দিন।'

শেষের দিকে দলাইমলাইয়ে ওর ঘুম পেয়ে গেলো। আরামে চোখ বুজে ও চুপচাপ বসে রইলো। এখন মনে হচ্ছে যুদ্ধের ছায়াগুলো যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

পয়সা মিটিয়ে গ্রেবার আবার দর্জির দোকানে ফিরে এলো।

'হয়নি ?'

ক্যাঙ্গারুর মতো দেখতে লোকটা গ্রেবারের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসলো। 'কে চুল কেটে দিলো ? দেখে মনে হচ্ছে নিজেই কেটেছেন ?'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না। কেননা চুল কাটাটা ওর নিজের খুব একটা অপছন্দ হয়নি।

দর্জি পর্দার ওপার থেকে ইস্ত্রি-করা প্যান্টটা এনে দিলো। 'এবার পরে দেখুন।'

গ্রেবার হাতে নিয়ে দেখলো দাগটা প্রায় সম্পূর্ণই উঠে গেছে। প্যান্টটা নিয়ে ও পর্দার আড়ালে চলে গেলো। কি ভেবে নাকের কাছে তুলে শুঁকতেই ও বেঞ্জিনের গন্ধ পেলো।

মেয়েটার মুখের আদলটি ভারি সুন্দর। ঠিক যেন সাজানো পুতুল। দু গালে টোল ফেলে উজ্জ্বল চোখে তরুণী হাসলো। 'কি দেবো বলুন ?'

গ্রেবারকে কিছু বলতে না দেখে ও অপেক্ষা করলো। তারপর মিষ্টি গলায় আস্তে আস্তে বললো, 'আমাদের সংগ্রহ হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু

ফ্কারের পাতা দিয়ে সুন্দর করে গাঁথা মালা বা কফিন সাজানোর সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা আছে।'

'না না, আমার ওসব কিছু চাই না।'

তরুণীর কালো চোখের মণি দুটো তিরতির করে কাঁপলো। 'তাহলে ?'

'কিছু ফুল কিনবো।'

'ফুল ? খুব ভালো পদ্ম আছে···'

'পদ্ম চলবে না। বিয়ের জন্যে কিছু ফুল চাই।'

'বিয়ের জন্যে পদ্মই তো সবচেয়ে ভালো—নিষ্পাপ কুমারীর প্রতীক।'

'তা ঠিক। আচ্ছা, আপনাদের গোলাপ নেই ?'

'গোলাপ! বছরের এই সময়ে আপনি গোলাপ কোথায় পাবেন ? তাছাড়া সব মালঞ্চেই এখন সবজির চাষ হচ্ছে। গোলাপ আপনি এখন কোথাও খুঁজে পাবেন না।'

স্টলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত গ্রেবার চোখ বুলিয়ে গেলো। স্বস্তিকার আকারে গাঁথা মালার পেছনে দেখলো একগুচ্ছ জংক্যুইল।

'আমাকে বরং ওইটা দিন।'

'এটাও ভালো।'

তোড়াটা পেড়ে তরুণী সন্তর্পণে জল ঝরালো। তারপর খবরের কাগজে মুড়ে দিলো। 'আমাদের কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোন কাগজ নেই।'

'দরকার নেই, এতেই হবে।'

গ্রেবার পয়সা মিটিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। কিন্তু পরক্ষণেই ও অস্বস্তি বোধ করলো। মনে হলো সবাই যেন ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। প্রথমে ও ফুলের তোড়াটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু কাগজটা বার বার খুলে আসতে দেখে তোড়াটা ও উঁচু করে ধরলো, আর তখনই ওর চোখে পড়লো একটা ছবি—কুপিয়ে কাটা চারটে মানুষের মাথা। নিচে লেখা 'জার্মান যুদ্ধ-জয়ে অবিশ্বাসীর একমাত্র শাস্তি।' গ্রেবারের মনে পড়লো তৃতীয় রাইখে গিলোটিন নিষিদ্ধ। নিশ্চয়, তার চেয়ে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কাটা অনেক মানবিক! গ্রেবার কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে।

গ্রেবারের কল্পনায়-ভাবা ছবির চেয়ে নিবন্ধক অফিসটা বরং অনেক ফাঁকা। একটু উঁচুতে চেয়ার টেবিল পাতা, নিচে একটা কালো পর্দা

টাঙানো। পেছনের দেওয়ালে ঝুলছে হিটলারের বড় একটা ছবি। তার নিচে জার্মান ঈগল সমেত একটা স্বস্তিকা।

মাঝামাঝি বয়েসের একজন সৈনিক এবং তার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রলোককে দেখে বেশ উত্তেজিত মনে হলো। অথচ ভদ্রমহিলা শান্ত স্থির। এলিজাবেথের সঙ্গে হেসে হেসে কি যেন গল্প করছেন।

নিয়ামক ভদ্রলোক চড়া গলায় বললেন, 'আপনি কী করে ভাবলেন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হতে পারে?'

সৈনিকের মুখ শুকিয়ে গেলো। 'আমি ভেবেছিলাম জরুরীকালীন বিয়েতে বোধহয় সাক্ষী লাগবে না।'

'যতই জরুরীকালীন হোক। সাক্ষী ছাড়া বিয়ে কস্মিনকালে হয়নি, হতে পারে না।'

বয়স্ক সৈনিক করুণ চোখে গ্রেবারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। 'আপনি হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারেন, কমরেড। আপনি আর আপনার বান্ধবী।'

'অবশ্যই। আপনারাও আমাদের বেলায় সাক্ষী হতে পারবেন। জানেন, সাক্ষীর কথা কিন্তু আমারও মনে ছিলো না।'

'বিয়ে করতে এসে সাক্ষীর কথা কারুরই মনে থাকে না, আশ্চর্য!' নিয়ামক নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন, না সাক্ষীর সমস্যাটা এত সহজে মিটে যেতে দেখে উনি অখুশি হলেন, ঠিক বোঝা গেলো না। 'আপনারা সৈনিক, অথচ রাইফেলটাই কাঁধে তুলে নিতে ভুলে গেলেন...'

'সাক্ষী আর রাইফেল এক জিনিস নয়।' সৈনিক এবার ঝাঁঝালো স্বরে প্রতিবাদ করলেন।

'এক, এ কথা তো আমি বলিনি। ওটা উদাহরণ। যাক...' উনি এবার গ্রেবারের দিকে চোখ ফেরালেন। 'আপনার পরিচয়পত্র কি আছে দেখি?'

গ্রেবার নিঃশব্দে ওদের কাগজপত্তর তুলে দিলো। উনি পড়ে দেখলেন। তারপর থমথমে গলায় বললেন, 'এখানে সই করুন। আপনারা চারজনেই।'

সবাই সই করলো।

নিয়ামক বয়স্ক সৈনিক এবং তাঁর স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'মহান ফুয়ারের নামে আপনাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু...' উনি এবার গ্রেবারের দিকে ফিরে তাকালেন। 'আপনাদের সাক্ষী?'

গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো, 'কেন, এই তো এঁরা রয়েছেন !'

'উঁহু, ওদের থেকে মাত্র একজনকে নেওয়া যেতে পারে। আপনার আর একজন সাক্ষী চাই।'

'কেন ?'

'আমরা দুজনেই সই করতে রাজি আছি।'

গ্রেবারের চেয়ে সৈনিকও অবাক কম হননি।

'আপনারা এখন দুজনে এক। সাক্ষী হিসেবে স্বনির্ভর দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তির সই দরকার।'

'কিন্তু···'

গ্রেবার এদিক-ওদিক তাকালো। দেখলো আশ্চর্য সুন্দর দেখতে একজন তরুণ ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। তরুণ এগিয়ে এলো। 'সাক্ষী হিসেবে আমাকে গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই আপনার কোন আপত্তি নেই ?'

বিরক্তিতে নিয়ামকের ভ্রূ দুটো আপনা থেকেই কুঁচকে উঠলো। 'সাক্ষী যে দেবেন, আপনার কাগজপত্তর কিছু আছে ?'

'নিশ্চয়ই।' তরুণ অবজ্ঞার ভঙ্গিতে পরিচয়পত্রটা ছুঁড়ে দিলো টেবিলের ওপর।

উনি গম্ভীর মুখে ওটা তুলে নিয়ে চোখ বোলালেন। তারপর সাপ দেখার মতো চমকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। 'হাইল হিটলার, হের !'

'হাইল হিটলার। কিন্তু কোথায় সই করতে হবে ?'

নিয়ামক প্রকম্পিত হাতে কাগজটা এগিয়ে দিলেন। তরুণ সই করলো। তারপর দ্রুত স্বরে বললো, 'এভাবে আর কখনও সৈনিকদের অসুবিধের মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করবেন না।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন, হের লিডার।'

তরুণ নিঃশব্দে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো। নিয়ামক গ্রেবারের কাগজগুলো ফিরিয়ে দিলেন।

গ্রেবার এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলো। এবার দেখলো ওর দ্বিতীয় সাক্ষী এস এস গ্রুপ লিডার, হিলডেবর‍্যাণ্ট। প্রথম সাক্ষী ইঞ্জিনিয়ার ক্লোটস্। নিয়ামক দুজনকে দুখানা হিটলারের 'আমার সংগ্রাম' গ্রন্থ উপহার দিলেন। ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো।

গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার আর কতদিন ছুটি আছে ?'

'কালই ফিরে যাচ্ছি।'

'কাল !'

ক্লোটস্ হাসলেন। 'বলা যায় না, যদি মারা যাই মারীয়ের অন্তত একটা হিল্লে হবে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আপনি আমার অনেক সাহায্য করেছেন,' ক্লোটস্ নিচু হয়ে ব্যাগ হাতড়ালেন। 'এই সসেজ দুটো আপনি রেখে দিন। উঁহু, কোন কথা শুনছি না। এ আমাদের ঘরের তৈরি। ভেবেছিলাম রেজিস্ট্রারকে দেবো, কিন্তু ও ব্যাটা হাড়বজ্জাত।'

গ্রেবার হাসলো। 'সসেজ নেবার জন্যে ওঁর চাইতে আমি অনেক যোগ্য ব্যক্তি। দিন, আর এই বইটা আপনি রাখুন।'

'আমি তো পেলাম একটা।'

'তাতে কি হয়েছে, না হয় আর একটা বেশিই হবে।'

'বইটার বাঁধাই কিন্তু খারাপ নয়। আপনি ইচ্ছে করলে রাখতে পারতেন।'

'আমাদের বাড়িতে রূপোয় ধার-মোড়া চামড়া-বাঁধানো বই রয়েছে।'

'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।' ক্লোটস্ এক হাতে বই নিয়ে অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, 'ধন্যবাদ, কমরেড।'

ওঁরা চলে যেতে গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি করে হাসলো। 'কি, বইটা দিয়ে দিলাম বলে মন খারাপ হয়ে গ্যালো তো?'

'হ্যাঁ, খুব।'

'জানো, আজকের দিনের কথা আমি বিনডিংকে কিছু বলিনি—আমি চাইনি আমাদের বিয়েতে ও সাক্ষী দিক। অথচ দুর্ভাগ্য, সারাজীবন আমাদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রইলো একজন এস এস গ্রুপ লিডারের নাম।'

এলিজাবেথ করুণ চোখে ওর দিকে তাকালো, কোন কথা বললো না। দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে মার্কটপ্লাটস্ পেরিয়ে এলো। মারীনকির্খের ভাঙা চূড়ার চারপাশে ডানা ঝাপটে উড়ছে একঝাঁক সাদা পায়রা। গ্রেবারের মনে হলো আজকের দিনে অন্তত আমার সুখী হওয়া উচিত ছিলো, অথচ কেন যে পারছি না আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।

ওরা দুজন তখন পাশাপাশি শুয়েছিলো শহর থেকে দূরে বনের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গায়। অদূরে ফুটে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রিমরোজ আর

ভায়োলেট। ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বইছে। এলিজাবেথ হঠাৎ উঠে বসলো। 'এই ছাখো, সারা অরণ্যটা কেমন যেন রূপকথার মতো মনে হচ্ছে! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? ছাখো, গাছের পাতাগুলো কেমন চিক-চিক করছে—যেন জ্বলছে! কেন এমন হচ্ছে বলো তো?'

'সূর্যের আলোর জন্যে।'

'পাতায় সূর্যের আলো পড়লে এমন চিকচিক করে বুঝি?'

'চিকচিক করছে যেগুলো ওগুলো পাতা নয়, রাংতা।'

'রাংতা!' এলিজাবেথের আয়ত চোখের পাতায় এসে জমলো যত রাজ্যের বিস্ময়। 'সারা অরণ্য জুড়ে এত রাংতা এলো কোত্থেকে?'

'ওগুলো উড়োজাহাজ থেকে ফ্যালা হয়েছে। নিশানার জন্যে সরু সরু ফিতের মতো এই রাংতাগুলো সাধারণত অরণ্যেই ফ্যালা হয়। হাওয়ায় সারা অরণ্যে ওগুলো ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সূর্যের আলো পড়ে যখন জ্বলে, ওপর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। আবার রাত্তিরে রাংতাগুলো যখন বাতাসে পতপত করে ওড়ে, বেতার-তরঙ্গে সেই শব্দ ধরা পড়ে। ফলে বোমারু-বিমানের পক্ষে শহরের অবস্থান বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না।'

'উঃ, আবার সেই যুদ্ধ! ভেবেছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে বুঝি এই কথাটাকে ভুলে থাকতে পারবো।' এলিজাবেথ হাঁটু দুটো দু হাতে জড়িয়ে ধরে তার ওপর চিবুক রাখলো। চূর্ণ কুন্তলটা কাঁধের একপাশ থেকে ভেঙে নেমে এলো বুকের কাছে।

গ্রেবার দু হাতের নিচে মাথা রেখে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়েছিলো অরণ্যচূড়ায়। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। দূরে কোথাও শোনা যাচ্ছে পাখি-পাখালির গান। বসন্তে পল্লবিত টিয়া-রঙ সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের রূপোলী ঝালর। ওর মনে পড়লো ছেলেবেলার নানান স্মৃতি আর উৎসবের দিনগুলোর কথা।

'এসো এলিজাবেথ, আমরা ~~বরং~~ অন্য কথা বলি।'

'যুদ্ধ থেমে গেলে আমরা কোথায় যাবো বলো তো?'

'তুমি বলো।'

'সুইজারল্যাণ্ডে?'

'না।'

'পোর্টোরিকোয়?'

'না।'

'তাহলে?'

'ইতালিয়ান সুইজারল্যাণ্ডে।'

'সেটা আবার কোথায় ?'

'লোকারনো। এই কিছুদিন আগেও যেখানে বিরাট শান্তি-সম্মেলন হয়ে গেলো, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজন নেই...'

'যুদ্ধের কোন প্রয়োজনই কি কোনদিন ছিলো ?'

ঘুরেফিরে একই কেন্দ্রে ফিরে আসতে দেখে গ্রেবার মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। তাই আর কোন কথা না বলে, এলিজাবেথকে দু হাতে জড়িয়ে নিবিড় করে টেনে নিলো বুকের মধ্যে। আর তখনই দেখলো গাছের পাতাগুলো বড় হতে হতে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেলো আকাশের গায়ে। বন্ধ হয়ে এলো ওর দু চোখের পাতা।

বাতাস পড়ে গেছে। বেলাশেষের গাঢ় রোদ মিলিয়ে গেছে দিগন্তের গায়ে। দ্রুত আঁধার ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ দূর থেকে গুমগুম চাপা আওয়াজে গ্রেবার চমকে উঠলো। ও এখন কোথায়! সীমান্তে! এলিজাবেথের নরম চুলে হাত পড়তেই ও বাস্তবে ফিরে এলো। তাহলে!

আবার আকাশের বুক কাঁপিয়ে গুরুগুরু শব্দ হলো।

এবার এলিজাবেথ উঠে বসলো।

'ওরা আসছে! চলো আমরা পালাই, এর্নস্ট।'

'ওটা বোমারু-বিমানের শব্দ নয়।'

বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠলো এলিজাবেথের আয়ত চোখের মণি দুটো। 'তাহলে ?'

'মেঘ ডাকছে।'

'এখন ?'

'মেঘ ডাকার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই, এলিজাবেথ।'

বিদ্যুৎ চমকালো। মেঘে মেঘে আকাশ কালো করে ঝড় উঠলো। ওরা দুজনে ছুটলো। দেখতে দেখতে বেড়ালের থাবার মতো বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। পাতায় পাতায় বৃষ্টির বিচিত্র শব্দ। ছুটতে ছুটতে অরণ্য ছেড়ে ওরা গাড়ি দাঁড়ানোর একটা টিনের চালার নিচে আশ্রয় নিলো।

আধ ঘণ্টা পরে বৃষ্টি ধরলো। আকাশে এখন কনে-দেখা আলো। ওরা দুজনে আবার পাশাপাশি হেঁটে চললো। দু-মুখো একটা রাস্তার মোড়

পেরিয়ে পার্কের কাছাকাছি আসতে এলিজাবেথ দেখলো—ডুরে-কাটা বন্দীর পোশাক পরা একসারি লোক জলের পাইপ বসানোর কাজে ব্যস্ত। ও চমকে উঠলো। তারপর হঠাৎ ওদের খুব কাছ ঘেঁষে মন্থর পায়ে হেঁটে চললো। যেন ওদের মধ্যে ও কাউকে খুঁজছে। পোশাকে নম্বর দেখে গ্রেবার বুঝলো ওদের বন্দীশিবির থেকে আনা হয়েছে। ওদের প্রত্যেকের মাথা কামানো। শীর্ণ শরীরে পোশাকগুলো ঢলঢল করছে। ওরা মুখ নিচু করে নিঃশব্দে কাজ করছে।

'এই যে! এই! ওদিকে কোথায় যাচ্ছো?' একজন সশস্ত্র এস এস প্রহরী এলিজাবেথকে এগিয়ে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠলো।

এলিজাবেথ না শোনার ভান করলো। এবার অনেকটা দ্রুত পা চালিয়ে ও মুখগুলো দেখে নেবার চেষ্টা করলো।

'কি ব্যাপার, কথা কানে ঢুকছে না নাকি?'

প্রহরীর চিৎকারে অন্য আর একজন পাণ্ডাগোছের এস এস অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখে গ্রেবার মনে মনে প্রমাদ গুনলো। তবু এলিজাবেথকে ডাকতে সাহস পেলো না। ও জানতো, ডাকলেও শেষ পর্যন্ত না দেখে এলিজাবেথ কিছুতেই ফিরবে না। তাই গ্রেবার দ্বিতীয় এস এস-এর প্রায় পথ আটকে দাঁড়ালো।

'আমরা একটা জিনিস খুঁজছি।'

'কি?'

'গতকাল আমরা মুক্তো-বসানো একটা ব্রোচ হারিয়ে ফেলেছি। এখানেই কোথাও পড়েছে। আপনি দেখেছেন নাকি?'

চোখ পাকিয়ে অফিসার প্রায় গিলতে এলেন। 'আপনার সাহস তো কম নয়!'

'না, মানে···' গ্রেবার ঢোক গিললো। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো এলিজাবেথ প্রায় শেষ প্রান্তে চলে গেছে। 'যদি হঠাৎ আপনাদের কারুর চোখে পড়ে থাকে—'

তরুণ প্রহরী গম্ভীর গলায় বললো, 'না, ও-রকম কিছু আমাদের চোখে পড়েনি।'

গ্রেবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখলো—বছর কুড়ি বয়েস, চোখ দুটো স্টেইনব্রেনার কিংবা হাইনির চোখের মতো একই ভাষায় কথা বলছে। 'দেখি, আপনার কাগজপত্তর কি আছে?'

'এস এস গ্রুপ লিডার হিলডেবরান্ট আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

তরুণ অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো। 'তার চেয়ে বলুন না কেন স্বয়ং ফুরার আপনার আত্মীয় ?'

'না, ফুরার নিশ্চয়ই নন।' গ্রেবার পকেট থেকে বিয়ের সার্টিফিকেটটা বার করলো। আর একবার চোরা চোখে তাকিয়ে দেখলো এলিজাবেথ এবার ফিরে আসছে। 'সত্যি কিনা দেখুন। আজই উনি আমাদের বিয়েতে সাক্ষী দিয়েছেন।'

অফিসার এবার অসীম কৌতূহলে তরুণের কাঁধের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বোলালেন। 'হ্যাঁ, এটা হিলডেবর‍্যাণ্টেরই সই। আমি চিনি। তবু এখানে আপনি ঘুরে বেড়াতে পারেন না। এটা নিষিদ্ধ এলাকা। আপনাদের হারানো ব্রোচটার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

এলিজাবেথ ফিরে এলো।

তরুণ বললো, 'ঠিকানাটা দিন, যদি খুঁজে পাই আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।'

'হিলডেবর‍্যাণ্টকে দিলেই আমরা পেয়ে যাবো।'

অফিসার এলিজাবেথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, খুঁজে পেলেন ?'

এলিজাবেথকে চোখ বড় বড় করে তাকাতে দেখে গ্রেবারের আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হলো। কিন্তু এলিজাবেথকে ও মুখ খোলার কোনরকম সুযোগই দিলো না। 'গতকাল হারানো ব্রোচটার কথা আমি এঁদের খুলেই বলেছি, এলিজাবেথ। এবং খুঁজে পেলে ওঁরা ওটা হিলডেবর‍্যাণ্টের কাছেই পাঠিয়ে দেবেন।'

'ধন্যবাদ।'

কথাটা মুখে বললেও এলিজাবেথের চোখ ছিলো বন্দীদের দিকে। ওর সে বিষণ্ণ চোখের ভাষা অফিসারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না। উনি বললেন, 'আপনার কোন ভয় নেই। শুয়োরগুলোর মধ্যে কেউ যদি নিয়েও থাকে, আমাদের খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হবে না। আমরা প্রত্যেককে তন্ন-তন্ন করে খুঁজবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'না, এমনও হতে পারে ওটা এখানে নেই, হয়তো বনের পথে কোথাও হারিয়ে গেছে।'

'তাহলে অবশ্য আমাদের কিছু করার নেই।'

এলিজাবেথ হাসলো। 'নিশ্চয়ই না।'

যাক, আপদ গেল! এলিজাবেথের সাবলীল কণ্ঠস্বরে গ্রেবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ও এতক্ষণ চুপচাপ লক্ষ্য করছিলো। এবার দেখলো একজন বন্দী ঠিক ওর পেছনেই কি যেন করছে। গ্রেবার পকেটে হাত ঢোকালো।

রুমাল বার করতে গিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট ফেলে দিলো বন্দীর কাছে।

অফিসার তরুণ প্রহরীকে বললেন, 'না কার্ল, কাল ভোরে তুমি সামনের জঙ্গলটা একবার খুঁজে দেখো।'

'দেখবো স্যর।'

গ্রেবার এবার সামনে এগিয়ে এলো। 'সত্যি, আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'শুভপরিণয়ের জন্যে আপনাদেরও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। হাইল হিটলার!'

গ্রেবার সামরিক কায়দায় প্রত্যভিবাদন জানালো, 'হাইল হিটলার!'

মাথার ওপরে ভেসে চলেছে স্বচ্ছ মেঘমালা। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় এলিজাবেথ হাসলো। 'আচ্ছা মিথ্যুক, বাবা!'

গ্রেবার ওর কাঁধে হাত রাখলো। 'দশ বছরের নিপুণ অভিজ্ঞতায় আয়ত্ত করতে হয়েছে। ছেড়ে দাও ওসব কথা। চলো ঘরে ফিরি। আজ থেকে আমি আবার তাঁবুতে থাকার অধিকার হারিয়েছি। হয়তো বিনডিং-এর বাড়িতে যাওয়া যায়…'

'কোন দরকার নেই। এ কটা দিন আমার ওখানে তুমি স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

'নিশ্চয়ই, আর কাল সকালে তুমি কারখানায় বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি বেশ তোমার বিছনায় মটকা মেরে পড়ে থাকবো।'

এলিজাবেথ হাসলো। 'কাল আমি কাজেই যাবো না। দুদিন ছুটি নিয়েছি।'

'আর এতক্ষণ তুমি আমাকে এ কথাটা বলোনি?'

'ভেবেছিলাম ভোরের আগে তোমাকে কিছু বলবো না।'

'দোহাই এলিজাবেথ, দুষ্টুমি কোরো না—এখন আমাদের সে-সময়ও নেই। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের রক্তের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করতে হবে, আর সে-অধিকার আমাদের আছে।'

'না এর্নস্ট,' গাঢ় হয়ে এলো এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর। 'আমি আর দুষ্টুমি করবো না।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। ঘরে আমাদের খাবারদাবার কিছু আছে তো, না প্রাতরাশের জন্যে বিনডিং-এর বাড়িতে আর একবার হানা দিতে হবে?'

'না না এর্নস্ট, কোন দরকার নেই। সত্যি বলতে গেলে সবই তো ধরো পড়ে রয়েছে।'

'তাহলে কাল আমরা দুজনে সুন্দর করে প্রাতরাশ করবো।'

'আর আমি বেশ "এগিয়ে চলেছে সৈনিক বীর" গানের রেকর্ডটা চালিয়ে দেবো।'

'ফের দুষ্টুমি? কাল আমরা দুজনে খুব হাসবো। তোমার ডাইনি লিজার যদি কিছু বলতে আসে, ওর মুখের ওপর বিয়ের সার্টিফিকেটটা সোজা ছুঁড়ে দেবো। চোখ ড্যাবড্যাব করে শুধু দেখবে এস এস-এর সইটা। তখন ওর মুখের অবস্থা কি হবে ভাবতেই আমার হাসি পাচ্ছে।'

এলিজাবেথ হাসলো। 'উনি কিন্তু আর কিছু বলবেন না, তুমি দেখো।'

'কেন?'

'কি জানি, পরশুদিন চিনি দিতে এসে হঠাৎ উনি তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।'

'তাই নাকি!'

চিনির কথা গ্রেবার একদম ভুলেই গিয়েছিলো। এখন মনে হলো, এ-ও গত দশ বছরের নিপুণ ছলনার ফলশ্রুতি।

কুড়ি

ঠিক দুপুর থেকে শুরু হলো বিমান আক্রমণ। সারাদিন আকাশ মেঘলা করে ছিলো। নিচু দিয়ে ভেসে যাওয়া মেঘের আড়ালে শত্রু-বিমান কখন এগিয়ে এসেছিলো কেউ টেরও পাইনি। গ্রেবার প্রথমে ভেবেছিলো এটা বোধহয় প্রথম সংকেত। কিন্তু বোমা বর্ষণ শুরু হতেই ও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো। রাস্তায় এখন রীতিমতো ভিড়।

একজন এয়ার রেড ওয়ার্ডেন গ্রেবারের পথ আটকে দাঁড়ালো। 'রাস্তায় এভাবে ছুটবেন না, চোরাকুঠরীতে চলে যান।'

'আমি একজন এয়ার-রেড ওয়ার্ডেন।'

গ্রেবার কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা কারখানার দিকে ছুটলো। এলিজাবেথের জন্যে ও উদ্বিগ্ন—যদি কোনরকমে ওকে বাইরে বার করে আনা যায়। কেননা ও জানে কারখানাগুলোই বোমারু বিমানের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে আসতে ও দেখলো বড় একটা বাড়ি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাতাসে ছিটকে উঠে মাটিতে আছড়ে পড়লো। গ্রেবার দু হাতে কান চেপে ধরলো। ঘামের একটা ধারা শিরদাঁড়া বেয়ে সোজা নেমে গেলো নিচের দিকে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ দৈত্যের বিশাল থাবায় গ্রেবারকে তুলে ছুঁড়ে দিলো দশ হাত দূরে। ফিনকি দিয়ে লাফিয়ে উঠলো বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো। তারপরে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেলো। গ্রেবার দুবার মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তখন সবকিছু ওর চারপাশে যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। সামনে তাকিয়ে দেখলো দাউদাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহ শিখা। ওদিকে এগুনো অসম্ভব দেখে গ্রেবার ঘুরে চললো।

পথে তখনও দু-একজন যারা ছিলো, আতঙ্কবিহ্বল চোখে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। লোকটা পাগল নাকি! ওরা চিৎকার করলো, গ্রেবার শুনতে পেলো না। ও প্রাণপণে ছুটলো। দেখলো একজন বৃদ্ধ বড় একটা দেওয়াল-ঘড়ি বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর পেছনে একটা শিকারী কুকুর। কোণের বাড়িটার সামনে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচ বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে। বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা একটা পুতুল। গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। 'ভেতরে যাও খুকু, ভেতরে যাও। তোমার বাবা মা কোথায়?'

মেয়েটি কোন কথা বললো না। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। গ্রেবার ডাইনে বাঁয়ে তাকালো। দেখলো একজন এয়ার রেড ওয়ার্ডেন ওদের দিকে ছুটে আসছে। গ্রেবার চিৎকার করে মেয়েটিকে সরিয়ে নেওয়ার কথা বললো। কিন্তু নিজের শব্দ ও নিজেই শুনতে পেলো না। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে হঠাৎ কেমন যেন ভুতুড়ে-কাণ্ড বলে মনে হলো। ওয়ার্ডেন কাছে আসতে গ্রেবার নিঃশব্দে মেয়েটিকে দেখিয়ে দিয়ে আবার ছুটলো। এখন পা দুটো মনে হচ্ছে সীসের মতো ভারি।

গ্রেবারের এতক্ষণ কোন খেয়ালই ছিলো না। হঠাৎ ফুসফুসে আগুনের হলকা যেতে ও দু পা পেছিয়ে এলো। সামনের খোলা দরজা দিয়ে দমকে দমকে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহ শিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। স্বপ্ন নয় তো! রুদ্ধশ্বাসে ও কান চেপে মাথা ঝাঁকালো। তখনই ঝাপসা চোখের

সামনে যে দৃশ্য ফুটে উঠলো, তাতে গায়ের লোম ওর খাড়া হয়ে গেলো। পাখি সমেত একটা খাঁচা ছিটকে এসে পড়েছে রাস্তায়। ডানা ঝাপটে পাখিটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখলো ভেতরে, সিঁড়ির নিচে একটি তরুণীর মৃতদেহ। অসামান্যা রূপসী। ঘাঘরাটা উঠে গেছে, নগ্ন নিটোল উরু দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা হাত পেছন দিকে মোচড়ানো, অন্য হাতে একগোছা চাবি। থমকানো দুটো স্তন। গলার নিচে থেকে গড়িয়ে এসেছে গাঢ় রক্তের ধারা। গ্রেবার সহ্য করতে পারলো না। কান্নার মতো কি যেন ওর বুকের ভেতর থেকে দলে মুচড়ে ঠেলে বেরিয়ে এলো। খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে ও আবার ছুটলো।

গ্রেবার ভাবতেই পারেনি সত্যিই ও কখনও কারখানার সামনে এসে পৌঁছতে পারবে।

'ভেতরে যাবো।'

'ভেতরে ঢোকা বারণ। এটা নিষিদ্ধ এলাকা।'

'সারা শহরটাই তো দেখছি নিষিদ্ধ এলাকা।'

'যান যান, এখানে আর দাঁড়াবেন না। অনেকেই আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কাছের চোরাকুঠরি ওই পার্কের পেছনে।'

গ্রেবার পেছনে তাকিয়ে দেখলো পার্কটা বোমায় ক্ষতবিক্ষত। ও প্রথমে কারখানাটাকে অক্ষত দেখে ভেবেছিলো এদিকটায় বোধহয় তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ওর ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। আকাশে আবার নতুন করে শোনা গেলো বুক-কাঁপানো গুরুগুরু আওয়াজ। থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে শিকারী গড়ুর। বিরামবিহীন একটানা শোনা যাচ্ছে বিমান-বিধ্বংসী কামানের তীব্র গর্জন। তারপরেই শুরু হয়ে গেলো বোমা বর্ষণ। বৃষ্টির বড় বড় রূপোলী ফোঁটার মতন ওগুলো নেমে এলো আকাশ থেকে।

'যান যান, এখানে আর মিছিমিছি দাঁড়াবেন না, পালান।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই গ্রেবারের বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেলো। দেখলো কারখানার পেছনের একটা অংশ হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। প্রথমে ঠিকরে উঠলো সাদা, হলদে, হালকা-সবুজ আগুনের শিখা-গুলো, তারপরেই একরাশ জমাট অন্ধকার।

ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। শুধু পরস্পরের দিকে অদ্ভুত এক যান্ত্রিক চোখে তাকিয়ে রইলো। সামলে নিতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো।

'এখন বুঝতে পারলেন তো, এরকম খোলা জায়গায় দাঁড়ানোটা কত

বিপজ্জনক ?' দরোয়ান রাইফেলটা হাত বদল করে নিলো। হাতের তালু ওর ঘামে ভিজে উঠেছিলো।

এতক্ষণ পরে গ্রেবারের মনে হলো ওর সার্টের ভেতরটাও ঘামে জবজব করছে। গ্রেবার ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'আমি সীমান্ত থেকে ফেরা সৈনিক, এসব ব্যাপার অনেকের চাইতে ভালোই বুঝি। কিন্তু কারখানার পেছনের দিকটা উড়ে গ্যাছে বলে মনে হচ্ছে ?'

'সে তো নিজে চোখেই দেখলেন।'

'ওভারকোট বিভাগটা কি কারখানার পেছন দিকে ?'

'না, ডানদিকে। কেন বলুন তো ?'

'আমার স্ত্রী···'

'ওরা সব এখন মাটির নিচের কুঠরিতে।'

'আপনি ঠিক জানেন ?'

'নিশ্চয়ই। ওদের কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি যা হয়েছে অন্যদের।'

'ঠিক বুঝলাম না। সবাই যদি চোরা-কুঠরিতে থাকে···'

'যারা বন্দীশিবির থেকে এখানে কাজ করতে আসে, তাদের চোরা-কুঠরিতে ঢুকতে দেওয়া হয় না।'

গ্রেবার স্তম্ভিত হয়ে গেলো। দূরে শুনলো বিমান-বিধ্বংসী কামানের একটানা আওয়াজ। 'দেখুন, আমি শুধু একটা খবরই জানতে চাই, ওভারকোট বিভাগের কোন ক্ষতি হয়েছে কি না।'

'বললাম তো কোন ক্ষতি হয়নি।'

'দোহাই আপনার, হয় আমাকে যেতে দিন, না হয় আপনি নিজে গিয়ে একবার দেখে আসুন।'

দরোয়ান ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। 'কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?'

'পাঁচদিন।'

'আগে বলবেন তো,' দ্রুত পায়ে ও ভেতরে চলে গেলো। এবং মিনিট তিনেকের মধ্যে ও আবার ফিরে এলো। 'না, এখনও পর্যন্ত চোরা-কুঠরির কোন ক্ষতি হয়নি।'

গ্রেবার ফিরে চললো। এবার ধ্বংসে প্রতিটি নগ্নতা ওর দু চোখে কাঁটার মতো বিঁধলো। বড় বড় বাড়িগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে।

আসবাবপত্তর দরজা দেওয়াল পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কোন কোন বাড়ি তখনও দাউদাউ করে জ্বলছে। কাপড় আর ইলেকট্রিক তারের বিশ্রী পোড়া গন্ধ।

গ্রেবার দ্রুত পায়ে রাস্তাটা পেরিয়ে এলো।

'গুস্তভ, স্ট্রেচার দুটো আর একবার নিয়ে এসো,' ভেতর থেকে কে যেন হাঁকলো।

গ্রেবার দেখলো ঘোড়ায়-টানা একটা খোলা গাড়ি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটা মৃতদেহে বোঝাই হয়ে উঠেছে। ও থমকে দাঁড়ালো। ঘরের ভেতরটা তাকিয়ে দেখলো, ঠিক যেন কসাইখানা। কসাইখানা তবু এর চেয়ে ভালো, অনেক বেশি সাজানো গোছানো। সারা ঘরে চাপ চাপ রক্ত। পশমের সোয়েটার-ওয়ালা ছোট বাচ্চার একটা হাত, বড়দের শুধু একটা ঠ্যাং, তালগোল পাকানো শিশু, রক্তে ভেজা ছেঁড়া সার্ট। এলোমেলো রক্তের দাগ দেখে গ্রেবার বুঝলো অনেক মৃতদেহ আগেই সরানো হয়ে গেছে। এবার দেখা গেলো একজন বৃদ্ধ ভারি একটা মৃতদেহ টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। গ্রেবার ছুটে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং কোন কথা না বলে মৃতের পা দুটো ধরলো। বৃদ্ধ শুধু একবার চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো। তারপর দুজনে ধরাধরি করে গুস্তভের আনা স্ট্রেচারে তুলে দিলো। মৃতদেহটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে, নারী না পুরুষ বোঝবার কোন উপায় নেই। তবু স্ট্রেচার থেকে গাড়িতে নামানোর সময় গ্রেবার দেখলো এক কানে সোনার একটা মাকড়ি চিকচিক করছে। গ্রেবার স্ট্রেচার নিয়ে ফিরে এলো। দেখলো বুড়ো এবার অন্য দুটো মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছচে। স্কুলের ব্যাগ কাঁধে ছোট একটা বাচ্চা, যার পশমের সোয়েটার-ওয়ালা বিচ্ছিন্ন হাতটা পড়ে রয়েছে দূরে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বাচ্চাটা যেন ঘুমচ্ছে। অন্য দেহটা তরুণীর। একরাশ সোনালী চুল-ওয়ালা মাথাটা থেঁতলে গেছে। অন্তর্বাসের আড়ালে নিটোল রক্তাক্ত দুটো স্তন। ওর পাশেই মৃত একটা বেড়ালছানা।

বৃদ্ধ করুণ চোখে তাকালো। 'উঃ, এ দৃশ্য জীবনে কোনদিন ভোলা যাবে না!'

গ্রেবার হাঁটতে হাঁটতে ভাবলো শুধু জার্মানিতে নয়, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, আফ্রিকা, রাশিয়ার সর্বত্রই এই একই দৃশ্য,

এই একই কান্নার উত্তাল সমুদ্র। যুদ্ধ থেমে গেলেও, মানুষের জীবনে এ কান্না দীর্ঘদিন থামবে না। ঘুম ভেঙে জেগে উঠে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে সে ডুকরে ডুকরে ককিয়ে উঠবে। আশ্চর্য, এ ক্ষত সামলে উঠতে মানুষের কত যুগ সময় লাগবে কে জানে !

পাশাপাশি তিনটে বাড়ির তুলনায় এলিজাবেথদের বাড়িটার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। কেবল ছাদটা তখনও জ্বলছে। ওপরতলার দরজা-জানলাগুলো পুড়ে গেছে। ছোকরা দরোয়ানকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গ্রেবার দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে এলো। 'কি ব্যাপার, এখনও আগুন নেভানো হয়নি ?'

'না, স্যর।'

'কেন ?'

'জল নেই। দমকলে খবর দিয়েছি, ওরা এখনও এসে পৌঁছয়নি।'

'তাহলে তো মুসকিল !'

'মুসকিল মানে, ছাদটা যে-কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে।'

রাস্তায় স্তূপাকৃত চেয়ার টেবিল সুটকেশ ছবি পাখির খাঁচা কাগজের বাণ্ডিল। নিচের তলায় ঘামে-ভেজা ব্যস্ত মুখগুলো দেখা যাচ্ছে। জানলা দিয়ে ওরা জামা কাপড় জিনিসপত্তর সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলছে। ওপরতলা থেকে কারা হুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো।

গ্রেবার দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি তাই মনে হয়, এভাবে জ্বলতে জ্বলতে বাড়িটা একসময়ে ভেঙে পড়বে ?'

'নিশ্চয়ই। দমকলবাহিনীর লোকেরা যদি তাড়াতাড়ি না এসে পড়ে, তাহলে দু-এক ঘণ্টাও সময় লাগবে না। তবে হাওয়া নেই এই যা বাঁচোয়া। ও হ্যাঁ, ভালো কথা—আমার সিগারেটের কি হলো ?'

'একদম সময় করে উঠতে পারিনি—কাল ঠিক নিয়ে আসবো।'

গ্রেবার ওপরে তাকিয়ে দেখলো এলিজাবেথের পাশের জানলায় ফ্রাউ লিজার জিনিসপত্তর সব গোছগাছ করছেন। ভেতরের স্বল্প আলোয় ওঁকে মনে হচ্ছে অশরীরী ছায়ার মতো।

গ্রেবার বললো, 'দেখি, ওপর থেকে দরকারী জিনিসপত্তর কিছু নামানো যায় কিনা।'

'হ্যাঁ, এই বেলা চলে যান।'

গ্রেবার ছুটো করে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে এলো। দেখলো সিঁড়ির দরজাটা হাট-হাট খোলা, ভেতরের বারান্দায় একগাদা পোঁটলাপুঁটলি।

এলিজাবেথের ঘরে প্রবেশ করে ও দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো।

জানলার ধারের চেয়ারটায় বসে ও চারদিকে তাকালো। এলিজাবেথের উপস্থিতিবিহীন নিরালা নির্জন ঘরটাকে হঠাৎ ওর কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো। গ্রেবার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। তারপর উঠে খাটের নিচে থেকে সুটকেসটা টেনে বার করলো। ভাবলো কি কি নেবে।

প্রথমে এলিজাবেথের জামা থেকে শুরু করলো। আলমারি খুলে দেখলো ওর সঞ্চয়ের পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। মোজা, অন্তর্বাস, কয়েকটা পুরনো চিঠি সুটকেসের তলায় গুঁজে দিলো। হঠাৎ নিচের রাস্তায় শুনতে পেলো চেঁচামেচির শব্দ। গ্রেবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো। না, দমকলবাহিনীর কেউ নয়। লোকজন তাদের জিনিসপত্তর সামলাচ্ছে। একজন মহিলা ছোট্ট একটা ভেলভেটের বাক্স বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। গ্রেবারের তখনই মনে হলো এলিজাবেথেরও গয়নাগাঁটি কিছু থাকতে পারে। ড্রয়ার কুলঙ্গী হাঁটকে একজোড়া সোনার বালা আর পুরনো আমলের ব্রোচ ছাড়া ও আর কিছুই পেলো না। আলনা থেকে ছাড়া পোশাক আর এলিজাবেথের বাবার ছবিটা ওপরে রেখে সুটকেসের ডালাটা বন্ধ করে দিলো। তারপর আবার তার চেয়ারে ফিরে এলো। আর তখনই ঘরের নিরালা নির্জনতা যেন তাকে গিলতে এলো। বুকের ভেতরটা কান্নায় টনটন করে উঠলো। একটু পরে ভাবলো বিছনাটাও সঙ্গে নিয়ে নেবে। ফ্রাউ লিজারের মতো কম্বলে বালিশ দুটো জড়িয়ে চাদর দিয়ে গাঁট বাঁধলো। দু-একটা প্রয়োজনীয় টুকিটাকিও গুঁজে দিলো বিছনার মধ্যে। বেরিয়ে আসার আগে সারা ঘরে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো, দেখলো টেবিলের নিচে ওর সামরিক ঝোলাটা রয়েছে। ওটার কথা ও একদম ভুলেই গিয়েছিলো। ঝোলাটা টানতেই ইস্পাতের ভারি শিরস্ত্রাণটা ঝনঝন শব্দে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো। গ্রেবার অপলক চোখে সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর এক লাথি মেরে ওটাকে আবার ঢুকিয়ে দিলো খাটের তলায়।

বাড়িটা ধিকধিক করে জ্বলছে। দমকলবাহিনী তখনও এসে পৌঁছয়নি। যে যতটা পেরেছে জিনিসপত্তর নামিয়ে এনেছে—সোফা চেয়ার, বিছনা মাদুর, রান্নাঘরের র‍্যাক, তিন চাকার সাইকেল, বাচ্চার দোলনা। না গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থা, না মাথা গোঁজার ঠাঁই—ওগুলো নিয়ে ওরা যে কি করবে

ভেবেই পাচ্ছে না। যে যার জিনিসপত্তর ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। একটি পরিবার তো রাস্তার ওপরেই চেয়ার টেবিল পেতে খেতে বসেছে। দরোয়ান ছেলেটি কাপড়ের পুঁটলির ওপর টার্কিস তোয়ালে পেতে ঘুমচ্ছে। ফ্রাউ লিজারের বাচ্ছাটা কাঁদতে কাঁদতে ওঁর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। উনিও ঢুলছেন। বিছনার গায়ে ঠেস দিয়ে সযত্নে দাঁড় করানো রয়েছে হিটলারের বড় ছবিটা। গ্রেবার ওর সামরিক ঝোলা, বিছনাপত্তর, খাবারের প্যাকেটটা একপাশে রেখে আবার ওপরে চলে গেলো। পরের বারে স্যুটকেসটা যখন নিয়ে ফিরে এলো, দেখলো খাবারের প্যাকেটটা নেই। গ্রেবার বিরক্ত হলো। ডাইনে বাঁয়ে তাকাতেই ওর নজর পড়লো টেবিলে সবাই মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে, কেউ চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। অথচ প্যাকেটের কাগজটা পড়ে রয়েছে ওদের টেবিলের নিচে।

হঠাৎ দূরে এলিজাবেথকে দেখে গ্রেবার চমকে উঠলো। চিৎকার করে ডাকলো, 'এই এলিজাবেথ, এই···এদিকে···এই···'

গ্রেবার ছুটে গেলো।

এলিজাবেথও ওকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলো।

'ওমাঃ এর্নস্ট, তুমি!'

গ্রেবার ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো বুকের মধ্যে। 'জানো, আমি তোমার কারখানায় গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি! আর আমি ওদিকে ভাবছি নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে।'

'কেন, আমার আবার কি হবে?'

এলিজাবেথ ম্লান হাসলো। তখনও ও রীতিমত হাঁপাচ্ছে। 'হতেও তো পারতো।'

'আমি শুধু তোমার কথা ভাবছিলাম, এলিজাবেথ।'

'তোমার জন্যে আমারও খুব খারাপ লাগছিলো, এর্নস্ট।'

'চলো, ওখানে একটু বসি।'

'কি হয়েছে এখানে?'

'বাড়ির ছাদটা জ্বলে গ্যাছে।'

'আমার কিন্তু ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে।'

'এই তো এখানে রয়েছে।' গ্রেবার কাউকে কিছু না বলে টেবিল থেকে ভর্তি জলের গ্লাসটা তুলে নিলো। তারপর এলিজাবেথের হাতে দিয়ে বললো, 'নাও।'

ভদ্রমহিলা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেননি। দশ-বারো বছরের একটা বিচ্ছুই প্রথম চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওটা নিচ্ছো কেন, ওটা তো আমাদের গ্লাস।'

গ্রেবার বললো, 'নিচ্ছি না। আবার ফিরিয়ে দেবো।'

ভদ্রমহিলা এবার মুখ খুললেন। 'নেবার আগে একবার বলে নেবেন তো ?'

গ্রেবার ধমক দিলো। 'চুপ করুন। কই, খাবারের প্যাকেটটা নেবার আগে তো আমাকে একবারও বলে নেননি ?'

এলিজাবেথ করুণ চোখে তাকালো। 'গ্লাসটা তুমি বরং ওঁদের ফিরিয়ে দাও, এর্নস্ট।'

গ্রেবার চাপা স্বরে গর্জে উঠলো, 'না।'

এলিজাবেথ নিঃশষে গ্লাসটা খালি করে ফেললো। 'আঃ !'

'আর খাবে ?'

'না।'

'নিশ্চয়ই খুব ছুটে এসেছো ?'

'হ্যাঁ, প্রায় সারাটা পথ।'

গ্রেবার গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিলো। 'চলো।'

পাশের বাড়ির ছাদটা ভেঙে পড়লো। ছোকরা দরোয়ান এবার আড়মোড়া ভেঙে হাই তুললো। কিন্তু উঠলো না, ঘাপটি মেরে পড়ে রইলো।

'যতটা সম্ভব তোমার জিনিসপত্তর সব নামিয়ে এনেছি। অবশ্য সব বলতে বিছনা আর তোমার জামা কাপড়ই বেশি। যদি বলো আসবাব-পত্তরও কিছু নামিয়ে আনতে পারি।'

'কোন দরকার নেই, এর্নস্ট।'

'এখনও অনেক সময় আছে।'

'যেখানে যা আছে থাক। জ্বলে পুড়ে সব শেষ হয়ে যাক, মুছে যাক—আমি আর কিচ্ছু চাই না।'

'কি চাও না, এলিজাবেথ ?'

'অতীত। কি হবে এই বোঝা বয়ে বেড়িয়ে ? আমাকে আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে, এর্নস্ট। আমাদের অতীত নিঃস্ব হয়ে গ্যাছে। আমরা আর পেছনে ফিরতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই না। কিন্তু ইচ্ছে করলে আসবাবগুলো আমরা বিক্রি করে দিতে পারি।'

'বিক্রি! তুমি পাগল হয়েছো? কে কিনবে? দেখছো না চারদিকের কি অবস্থা, ওগুলো রাখারই জায়গা নেই। দিনের পর দিন ওগুলো রাস্তায় একই ভাবে পড়ে থাকবে।'

হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। ফ্রাউ লিজার ছাতা খুললেন।

দরোয়ান এবার উঠে বসলো। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে হিটলারের ছবিটাকে দেখে মনে হলো উনি যেন কাঁদছেন। গ্রেবার তার ঝোলা থেকে ওভারকোটটা বার করে এলিজাবেথের গায়ে জড়িয়ে দিলো, ক্যানভাসটা বিছিয়ে দিলো বিছনার ওপর।

গ্রেবার বললো, 'আজ রাত্তিরে ঘুমোবার জন্যে একটা জায়গা খুঁজতে হবে।'

'অন্যেরা কোথায় ঘুমবে?'

'জানি না, এলিজাবেথ। অন্যের কথা আমি কিচ্ছু ভাবতে পারছি না।'

'আমরা এখানেও ঘুমতে পারি।'

'তুমি পারবে?'

এলিজাবেথ দুষ্টুমি করে হাসলো। 'যা ক্লান্ত লাগছে, প্রয়োজন হলে আমি ভাগাড়েও ঘুমতে পারি।'

'বিনডিং-এর বাড়িতে খালি ঘর আছে, নিশ্চয়ই তুমি ওখানে যেতে চাও না?'

'না।'

'হের পোলমানের বাড়িতে আমরা নিঃসংকোচে যেতে পারি। কয়েক-দিন আগে আমি ওঁকে বলেও রেখেছিলাম। অবশ্য বাড়িটা যদি এখনও টিঁকে থাকে।'

'আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি। আমাদের তলাটা তো এখনও জ্বলেনি।'

গ্রেবার কিছু বললো না। ঢলঢলে ওভারকোটটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে এলিজাবেথ বিছনার ওপর বসলো। 'জানো, আমার কিন্তু বেশ মজা লাগছে।'

গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো ওর দু চোখের নিচে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও সারা মুখে হতাশার কোথাও কোন চিহ্ন নেই।

'এর্নস্ট?'

'উঁ।'

'কি ভাবছো?'

'কই, কিছু না তো !'

'আমাদের পান করার মতো কিছু নেই ?'

'আছে। আসার সময় বইয়ের পেছনে এক বোতল ভদকা পেলাম। বোতলটার কথা আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি একটু ওঠো, আমি বার করছি।'

গ্রেবার বিছনার মধ্যে আন্দাজে হাত গলিয়ে বোতল আর একটা গ্লাস বার করে আনলো।

এলিজাবেথ হাসলো। 'তোমার এই দূরদর্শীতার জন্যে চুমু দিতে ইচ্ছে করছে।'

'পরে দিও। তার আগে এটা সাবধানে খেয়ে ফ্যালো, যাতে কেউ না জানতে পারে।'

'সাবধান করতে গেলেই বরং লোকে জানতে পারবে বেশি। দাও···' এলিজাবেথ গ্লাসটা নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিলো। 'আঃ, ঠিক এমনটাই খুঁজছিলাম। এখন এটা আমাদের মুক্তাঙ্গন-কাফে। ধরে নিচ্ছি তোমার কাছে নিশ্চয়ই সিগারেটও আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাস্, আমাদের আর কিচ্ছু চাই না। বসে পড়ো, এর্নস্ট।'

গ্রেবার এলিজাবেথের পাশে বসলো। দুজনে নিঃশব্দে পান করলো। একসময়ে হঠাৎ ওদের বাড়ির ছাদটা ধসে পড়লো। থরথর করে কেঁপে উঠলো দেওয়ালগুলো। রাস্তার বাসিন্দাদের কয়েকজন ডুকরে কেঁদে উঠলো। এবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেলো। দরজা-জানলার পর্দাগুলো দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো।

গ্রেবার বললো, 'আমাদের তলাটার এখনও কোন ক্ষতি হয়নি।'

'ওটাও আর বেশিক্ষণ টিঁকছে না,' পাশের এক ভদ্রলোক বললেন।

'কেন ?' গ্রেবার অবাক হলো।

'আমাদেরটা যখন ভাঙলো তোমাদেরটাই বা ভাঙবে না কেন ? ওপর-তলায় আজ আমরা তেইশ বচ্ছর ধরে বাস করছি। আগুন এখনও নেভেনি, দেখো, তোমাদের তলাটাও ভেঙে যাবে।'

গ্রেবার ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। প্রৌঢ়, কঙ্কালসার জীর্ণ চেহারা। সম্ভবত অসুস্থ। গ্রেবার মুচকি মুচকি হাসলো। 'ব্যাপারটা তাহলে হিংসের ?'

ভদ্রলোক চটে উঠলেন। 'না, হিংসের নয়। ব্যাপারটা ন্যায়বিচারের।'

'আপনি কিন্তু মিছিমিছি রাগ করছেন। নিন, এক গ্লাস ভদকা খান।'

'ধন্যবাদ। ওটা তুমিই রেখে দাও। তোমাদের ছাদটা ভেঙে পড়ার সময়ে কাজে লাগতে পারে।'

'আমি বাজি রাখতে রাজি আছি। এখনও বলুন, এক···দুই···'

গ্রেবারের পাগলামি আর ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে এলিজাবেথ হেসে ফেললো।

ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করলেন। 'কোথাকার একটা পুঁচকে ছোঁড়ার কথা শুনে আপনিও হাসছেন, ফ্রয়লাইন?'

'হাসবে না কি কাঁদবে?' গ্রেবার ওঁকে আর একটু উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করলো। 'কাঁদার চেয়ে হাসা ঢের ভালো। বিশেষ করে যখন কিছু করার নেই।'

'কিছু যদি করার না থাকে প্রার্থনা করো।'

এলিজাবেথ খিলখিল করে হেসে উঠলো। ভদ্রলোক রেগেমেগে কি যেন বললেন। কিন্তু ওঁর কথা কিচ্ছু শোনা গেলো না। তার আগেই এলিজাবেথদের ছাদটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। ছাতার নিচে ফ্রাউ লিজার চাপা স্বরে ফুঁপিয়ে উঠলেন। টেবিল ঘিরে যারা কফি খাচ্ছিলো, তাদের কার হাত থেকে একটা পেয়ালা ছিটকে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেলো। দোলনার কচি বাচ্চাটা ককিয়ে উঠলো।

গ্রেবার বললো, 'আমার দুদিনের আস্তানাটাও গেলো।'

'একেই বলে ন্যায়বিচার।' ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হলো উনি যেন খুব খুশি হয়েছেন।

'বাজি রাখলে আপনি কিন্তু জিততে পারতেন।'

ভদ্রলোক কটমট করে তাকালেন। 'ঘরের মর্ম তুমি কি বোঝো হে ছোকরা?'

'সত্যিই আমি ওর মর্ম কিছু বুঝি না।' ম্লান হলো গ্রেবারের কণ্ঠস্বর। 'জার্মান রাইখই আমাকে আকৈশোর পৃথিবীর পথে পথে মুসাফিরের মতো ঘুরিয়েছে।'

'তার জন্যে আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এবার ইচ্ছে করলে ভদকার গ্লাসটা দিতে পারেন।'

এলিজাবেথ গ্রেবারের কানে ফিসফিস করে বললো, 'এই, ছাখো, ফ্রাউ লিজারের ডেস্কটা কেমন দাউদাউ করে জ্বলছে। ওর মধ্যেই রয়েছে ওর গুপ্তচরবৃত্তির যা-কিছু সঞ্চয়।'

'তুমি জানো না এলিজাবেথ, আসার আগে তোমার রান্নাঘরের কেরোসিনের বোতলটা উপুড় করে দিয়ে এসেছিলাম ওর ডেস্কের ওপর।'

এলিজাবেথের চোখদুটো দীপ্ত জ্বলে উঠলো। 'সত্যি !'

'হ্যাঁ, তখন আমার মনে হয়েছিলো এতে হয়তো কেউ না কেউ বন্দী-শিবিরের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। কিন্তু এখন কি করা যায় বলো তো ?'

'চলো দেখি কোথাও কোন জায়গা পাই কিনা। না হলে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দেবো।'

গ্রেবার আকাশের দিকে তাকালো। 'বৃষ্টি এলে অবশ্য একটু অসুবিধে হবে।'

'সে তখন দেখা যাবে।'

গ্রেবার এক কাঁধে সামরিক ঝোলা, অন্য কাঁধে বিছনাটা ঝুলিয়ে নিলো। এলিজাবেথ সুটকেসটা তুলে নিলো। গ্রেবার হাত বাড়ালো, 'সুটকেসটা আমাকে দাও।'

'কেন ?'

'ওটা বেশ ভারি আছে, বইতে তোমার কষ্ট হবে।'

'আর এতগুলো বোঝা বইতে তোমার বুঝি কষ্ট হবে না ?'

'একটুও না।'

'থাক, আর ওস্তাদি করতে হবে না।'

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দুজনে সন্তর্পণে এগিয়ে চললো। গাছের ডালে ঝোলা বাদুড়ের মতো সবাই চুপচাপ। জ্বলন্ত আগুনের চাপা একটা দীপ্তি এসে পড়েছে এলিজাবেথের মুখে। দু চোখের পাতায় জড়ানো ওর ম্লান একটা যন্ত্রণার ছায়া।

'গতকালও কেউ ভাবেনি। অথচ আজ সব ছেড়ে দিয়ে কত অনায়াসে চলে যেতে হচ্ছে ভাবতেও অবাক লাগে, তাই না, বলো ?'

'হ্যাঁ এলিজাবেথ, আর এরই জন্যে আমরা জীবনের মূল্য দিয়ে চলেছি।'

গ্রেবার শেষবারের মতো চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। দেখলো টেবিলের সামনে বসা বিচ্ছুটা দুষ্টুমির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসছে।

প্রথমে অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর গ্রেবার দরজা ধাক্কাতে শুরু করলো। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। ও এলিজাবেথের কাছে ফিরে এলো।

'আমার মনে হয় পোলমান বাড়িতে নেই।'

'হয়তো উনি আর এখন এখানে থাকেন না।'

'কিন্তু এছাড়া আর কোথায় যাবেন ?'

'বলা যায় না, হয়তো গেস্টাপোর লোকেরা…'

'না না, গেস্টাপো এখনও এখানে হানা দেয়নি। দিলে এর চেহারাই পালটে যেতো।'

'তাহলে এখন কোথায় যাওয়া যায় ?'

'সেই তো ভাবছি।'

'আচ্ছা, এর কাছাকাছি কোথাও থাকা যায় না ?'

গ্রেবার ডাইনে বাঁয়ে তাকালো। বারুদগন্ধী পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে আছে সারা আকাশ। কোথাও কোন তারা নেই—নিস্পন্দ রাত। হঠাৎ ওর মনে পড়লো প্রথম দিনে দেখা ভাঙা বাড়িটার কথা। 'পেয়েছি এলিজাবেথ, এসো।'

পোলমানের বাড়ির প্রায় কাছেই, রাস্তার ওপারে ছাদওয়ালা একটা বারান্দা, বারান্দার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। গ্রেবার জানে বাড়ির পেছনটা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। বারান্দায় জিনিসপত্তর নামিয়ে, গ্রেবার আশপাশ খুঁজে একটা লোহার শিক যোগাড় করে আনলো। শিকটা মাটিতে পুঁতে ক্যানভাসটা কায়দা করে টাঙিয়ে ফেললো। তারপর দুষ্টুমির চোখে এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'এটা হলো আমাদের পর্দা। এবার ওভারকোটটা বারান্দার এপাশে টাঙিয়ে দিলেই দেখবে ঠিক তাঁবুর মতো দেখাচ্ছে। কি পছন্দ হয়েছে তো ?'

'খুব।'

গ্রেবার দ্রুত হাতে বারান্দাটা পরিষ্কার করে বিছনাপত্তর খুলে ফেললো। সামরিক ঝোলা আর সুটকেসটা রাখলো মাথার দিকে। 'এবার তাহলে মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাঁই হলো। আমি অবশ্য এর চেয়ে কুৎসিত পরিবেশে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়েছি। তোমার কিন্তু খুব অসুবিধে হবে।'

'একটুও না।'

গ্রেবার এবার এলিজাবেথের বর্ষাতি জড়ানো স্টোভটা বার করলো।

এলিজাবেথ বললো, 'আমি কি করবো বলো তো ?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি শুধু চুপচাপ বসে দেখবে।'

'বারে, তুমি সব করবে, আর আমি বুঝি বসে বসে দেখবো ?'

'তাহলে হাতে হাতে একটু সাহায্য করো। আগে একটু রান্নার ব্যবস্থা

করতে হবে। রুটির প্যাকেটটা চুরি গেলেও ঝোলায় এখন টিনের খাবার আছে।'

কথা বলতে বলতেই গ্রেবার জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিলো। ভদকার বোতলটা সাবধানে নামিয়ে রাখলো। সামরিক মগটা এলিজাবেথের হাতে দিয়ে বললো, 'ছাখো তো, রাস্তার ওই কোণের কলটায় জল পাও কিনা।'

এলিজাবেথ চলে যাওয়ার পর গ্রেবার স্টোভ ধরালো। হালকা লালচে আলোয় তাঁবুর ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠলো। মটরশুঁটি আর বিনের টিনছুটো গরম করে নিলো। তখনও একটা সসেজ রয়েছে।

এলিজাবেথ ফিরে এলো। 'পেয়েছি।'

'তাহলে একটু কফিও তৈরি করে নেওয়া যাক, কি বলো?'

এলিজাবেথ হাসলো। 'মন্দ কি!'

'হাসছো যে?'

'তোমার সংসার দেখে।'

'থাক, আর ছুষ্টুমি করতে হবে না। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও।'

খাওয়ার পর্ব মিটতে একটুও সময় লাগলো না। গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা এখন ঘুমবো, না পোলমানের জন্যে অপেক্ষা করবো?'

এলিজাবেথ হাই তুললো, 'আমার কিন্তু ভী-ষ-ণ ঘুম পাচ্ছে।'

'তাহলে শুয়ে পড়ো।'

এলিজাবেথ জুতোজোড়া খুলে রাখলো মাথার দিকে, মোজাছুটো গুঁজলো পকেটে। তারপর টান-টান করে নিজেকে মেলে দিলো। গ্রেবার ওর পাশে শুয়ে কম্বলটা এলিজাবেথের বুক পর্যন্ত টেনে দিলো।

'এই, কেমন লাগছে?'

'ঠিক সরাইখানার মতন।'

'ঘরের জন্যে তোমার মন কেমন করছে, তাই না।'

'না। আমি ভাবতেই পারিনি এত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবো।'

এবার গ্রেবারের বুকের অতল থেকে উঠে এলো প্রতীতির গাঢ় একটা উষ্ণতা। বাতাসের মতো ফিসফিস করে ও বললো, 'এলিজাবেথ!'

'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে, এর্নস্ট!'

পাশ ফিরে গ্রেবারের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে এলিজাবেথ ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো। আর গ্রেবার অপলক চোখে চুপচাপ ছাদের দিকে তাকিয়ে

রইলো। সারাদিনের প্রতিটি দৃশ্য ওর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো। মনে হলো ও যেন এখন শুয়ে রয়েছে কোন বিক্ষুব্ধ সীমান্তে আর শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে খোলা ছাদের নিচে রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভরা রহস্যময় কোন নারীর।

একুশ

গ্রেবারের ঘুম ভেঙে গেলো। ভগ্নস্তূপের ওপর কার যেন সতর্ক পায়ের শব্দ শুনলো। আস্তে আস্তে ও কম্বলের নিচে থেকে বেরিয়ে এলো। এলিজাবেথ ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুলো। গ্রেবার ক্যানভাসের নিচে দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। হয়তো পোলমান ফিরছেন। চোরও হতে পারে। গেস্টাপো হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। ওরা সাধারণত এই সময়েই আসে। যদি গেস্টাপো হয়, পোলমানকে ও সতর্ক করে দিতে পারবে।

হঠাৎ আবছা আঁধারে দেখলো দুটো ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি দুটো বারান্দা অতিক্রম করে যেতেই গ্রেবার লাফিয়ে উঠলো এবং যতটা সম্ভব নিঃশব্দে খালি পায়ে ও ওদের অনুসরণ করলো। কিন্তু কিছুটা যাবার পরেই গ্রেবার হোঁচট খেলো। চকিতে একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে দাঁড়ালো। 'কে, কে ওখানে?'

কণ্ঠস্বরে ও পোলমানকে চিনতে পারলো। 'আমি, হের পোলমান। 'আমি এর্নস্ট গ্রেবার।'

'তুমি! এত রাত্তিরে! কি ব্যাপার?'

'বিশেষ কিছু নয়,' গ্রেবার সঙ্কুচিত হলো। 'বোমায় বাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবার পর কোথায় যাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই ভাবলাম দু-এক রাত্তিরের জন্যে আপনি যদি আমাদের…'

'তুমি আর কে?'

'আমি আর আমার স্ত্রী। কয়েকদিন আগে আমি বিয়ে করেছি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' অন্ধকারে পোলমানের চোখদুটো স্পষ্ট দেখা গেলো। উনি কিন্তু আর কিছু বললেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর ধীরে ধীরে চুলের মধ্যে আঙুল চালালেন।

গ্রেবার অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'আপনি কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন।'

'না, আমি ওসব কিছু ভাবছি না।' পোলমান আবার চুপ করলেন। তারপর হঠাৎ যেন মনস্থির করে ফেললেন। 'ঠিক আছে, এসো।'

পোলমান চাবি খুলে গ্রেবার এবং তাঁর সঙ্গের ভদ্রলোককে ভেতরে প্রবেশ করতে বললেন। তারপর দরজাটা আবার ভেতর থেকে চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অন্ধকারে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বাতি ধরালেন। 'তোমার স্ত্রী এখন কোথায়?'

'বাইরে, রাস্তার ধারের বারান্দাটায় ঘুমচ্ছে। সঙ্গে বিছনা এনেছিলাম, কোনরকমে একটা তাঁবুর মতো ব্যবস্থা করে নিয়েছি।'

'সবার আগে তোমাকে কিছু বলা দরকার, এর্নস্ট।' পোলমান ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। 'এখানে তোমাদের খুঁজে পাওয়া গেলে বিপদ হতে পারে।'

'আমি জানি।'

পোলমান গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। 'বিপদ আমার জন্যে। সন্দেহের তালিকায় আমার নাম আছে।'

'জানি।'

'তোমার স্ত্রীও কি সে কথা জানে?'

গ্রেবার একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'হ্যাঁ।'

অন্য লোকটি এতক্ষণ ঘরের এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এবার যেন ওর নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো। পোলমান পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'এর্নস্ট গ্রেবার, আর এ জোসেফ। সম্পূর্ণ নাম আমি বলবো না, এবং তোমার না জানাই ভালো।'

গ্রেবার অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালো। বছর চল্লিশ বয়েস। ইহুদি। রোগা, পাকানো চেহারা। কোথায় যেন একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে জোসেফ মৃদু হাসলো।

পোলমান বললেন, 'তুমি বোধহয় জানো না এর্নস্ট, পুলিস এখন আমাকে খুঁজছে। এরকম অবস্থায় তোমাদের এখানে খুঁজে পেলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। অবশ্য আমি বলছি না আজই কিছু হবে। কিন্তু জোর করে কিচ্ছু বলা যায় না।'

গ্রেবার চুপ করে রইলো। পোলমান নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমি ভেবো না এর্নস্ট, আমি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি।'

'আমি জানি। আমি নিজের জন্যে ভাবছি না। কয়েকদিনের মধ্যেই

আমাকে সীমান্তে ফিরে যেতে হবে। আমি ভাবছি এলিজাবেথের জন্যে। ওকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে।'

'আমার মনে হয় বিপদের কোন ঝুঁকি না নিয়ে আজ রাতটা বাইরেই কাটিয়ে দিন।' জোসেফ বললো। আশ্চর্য ভারি ওর কণ্ঠস্বর। গ্রেবার ভাবতেই পারেনি এত ভরাট হতে পারে ওর গলার স্বর।

গ্রেবার বললো, 'আজকের রাত্তিরের জন্যে কোন অসুবিধে হবে না।'

'তাহলে ওখানেই কাটিয়ে দিন। কাল কাথেরীনেনকির্খে গিয়ে খোঁজ নেবেন। গির্জার কিছুটা ভেঙে গেলেও নিচের তলার ঘরগুলো এখনও অক্ষত আছে।'

'সেই ভালো, এর্নস্ট।' পোলমান যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। 'জোসেফ আবার আমার চেয়েও এসব খুব ভালো জানে।'

'ঠিক আছে, তাই করবো।' হঠাৎ বৃদ্ধের জন্যে গ্রেবারের মায়া হলো। 'এভাবে বিব্রত করার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, হের পোলমান।'

'যদি কিছু প্রয়োজন হয় ভোরবেলায় চলে এসো। প্রথমে দুটো আস্তে টোকা দেবে, তারপরে দুটো জোরে। আমি ঠিক শুনতে পাবো।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

গ্রেবার ফিরে এলো। এলিজাবেথ তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছে। গ্রেবার ওর গালে আলতো করে একটা চুমু দিলো।

ছটার সময় এলিজাবেথের ঘুম ভাঙলো। রাস্তা দিয়ে বিশ্রী শব্দ করতে করতে একটা দুধের গাড়ি চলে গেলো। এলিজাবেথ আড়মোড়া ভাঙলো। 'চমৎকার ঘুমিয়েছি···ওমাঃ, আমরা এখানে?'

'হ্যাঁ, ইয়ানপ্লাট্সে।'

এলিজাবেথ দুষ্টুমি করে হাসলো। 'এই, আজ রাত্তিরে আমরা কোথায় ঘুমবো?'

'সারাদিন সময় আছে, খুঁজেপেতে একটা জায়গা ঠিক বার করবো।'

এলিজাবেথ উপুড় হয়ে শুলো। মুখটা রাখলো দু'হাতের নিচে। ক্যানভাস আর কোটের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে এসেছে ভোরের স্নিগ্ধ আলো। বাইরে চড়ুইগুলো কিচিরমিচির করে ডাকছে। এলিজাবেথ ক্যানভাসের একটা কোণ একটু তুলে দেখলো। তারপর আবার দুষ্টুমি করে হাসলো। 'জিপসিদের মতন আমরাও আজ রোমাঞ্চের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছি।'

'ঠিক এমনি যদি চিরদিন থাকতে পারতাম !'

'খুব মজা হতো, তাই না ?'

'হ্যাঁ। জানো, কাল রাত্তিরে পোলমানের সঙ্গে দেখা-করেছিলাম। উনি বলেছেন, কিছু প্রয়োজন হলে জানাতে।'

'আমাদের কফি তো আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আর কিচ্ছু লাগবে না।' এলিজাবেথ এবার উঠে বসলো। ব্যাগ থেকে ছোট আয়না বার করে মুখ দেখলো, তারপর চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসলো। 'আমি এখুনি মুখ ধুয়ে আসছি।'

এলিজাবেথ চলে যেতেই গ্রেবার বিছনাটা গুটিয়ে ফেললো। স্টোভে কফির জল বসালো। হঠাৎ মনে হলো এলিজাবেথের রেশন-কুপনগুলো ও আনতে ভুলে গেছে। একটু পরেই এলিজাবেথ ফিরে এলো। ওর টলটলে মুখটা মনে হচ্ছে শিশির-ভেজা গোলাপের পাপড়ির মতো।

'এই, কুপনগুলো কি তোমার কাছে আছে ?'

'না তো ! ড্রেসিং টেবিলের নিচের খোপে ছিলো।'

'আমি ওগুলো আনতে ভুলে গেছি।'

গ্রেবারের মুখ দেখে এলিজাবেথ হেসে ফেললো। 'তাতে কি হয়েছে, টিফিনের সময়ে বেরিয়ে আবার কয়েকটা নতুন কুপন সংগ্রহ করে নেবো। ওজন্যে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

'তার মানে তুমি আজ কারখানায় যাবে নাকি ?'

'যাবো না ? বোমার জন্যে আমাদের কোন ছুটি নেই, ও তো প্রতিদিনই পড়ছে।'

'তোমার কারখানার কাঁথায় আমি আগুন ধরিয়ে দেবো।'.

'সে আমিও পারি। তার জন্যে কোন কৃতিত্বের দরকার হয় না।'

'না, তুমি আজ যাবে না। কাল বিমান আক্রমণের সময় তোমার কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে কিনা কে জানতে পারছে ?'

'আমাদের কারখানায় ডাক্তার পুলিস আছে। ওরা যদি কোন রকমে জানতে পারে আমি ওদের ঠকিয়েছি, শাস্তি পেতে হবে। বাড়তি কাজ করাবে, ছুটি দেবে না, জাতীয়তাবাদী রীতিনীতি শিক্ষার জন্যে চাই কি বন্দীশিবিরেও পাঠাতে পারে।' এলিজাবেথ মগে গরম জল ঢেলে কফি তৈরি করলো। 'যারা একবার এ শাস্তি ভোগ করছে, অকারণে তারা আর কোনদিন কাজ কামাই করে না।'

গ্রেবার মনে মনে ভাবলো, এ সবকিছুই ওর বাবার জন্যে। ও চায় না ওঁর কোন ক্ষতি হোক। গ্রেবার মুখে কিছু বললো না, কেবল কঠিন হয়ে উঠলো ওর শানিত চোখের দৃষ্টি।

'কফি নাও। এ কি, তুমি রাগ করেছো ?'

গ্রেবার ঘাড় নাড়লো।

'রাগ কোরো না, এর্নস্ট। আমি বুঝি, তোমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। এবং যতক্ষণ তুমি এখানে আছো, আমার উচিত তোমার কাছে থাকা। কিন্তু কারখানায় না-যাওয়ার সাহস আমার নেই, এর্নস্ট।'

'তোমার যথেষ্ট সাহস আছে, এলিজাবেথ। আর কোন কিছু না-অপেক্ষা করার চেয়ে কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকা অনেক ভালো।'

কথাটা খুব ভালো বুঝতে না পারলেও, গ্রেবারের চোখেমুখে ফুটে-ওঠা নিঃশব্দ যন্ত্রণা এলিজাবেথের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না। তাই ওর গলাটা নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে আদর করলো, চুমু দিলো। 'আমার সময় হয়ে গ্যাছে এর্নস্ট, আমি যাই।'

'এসো।'

এলিজাবেথ দ্রুত হাতে মোজা জুতো পরে নিলো। 'আজ সন্ধ্যেবেলায় আমরা কোথায় দেখা করবো ?'

'হুঁ, এটা একটা প্রশ্ন বটে!' গ্রেবার ভাবলো আবার আমাদের নতুন করে শুরু থেকে শুরু করতে হবে। 'আমি বরং কারখানার কাছে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'কিন্তু কোন কারণে তুমি যদি না আসতে পারো ?'

'তাহলে কাথেরীনেনকির্খে একবার খোঁজ নিও।'

'আমাদের আরও দু-একটা জায়গা ঠিক করে রাখা উচিত। বলা যায় না কখন কি হয়, অন্তত আমরা খবর রেখে যেতে পারবো।'

'পোলমানের বাড়িতে খবর রেখে যাওয়াটা সবচেয়ে সহজ হতো, কিন্তু নিরাপদ নয়। বিনডিং···হ্যাঁ, এদিক থেকে বরং বিনডিং-এর বাড়ি অনেক বেশি নিরাপদ। তুমি তো ওর বাড়িটা জানো, প্রয়োজন হলে···ঠিক আছে, আমি বরং আজকে ওর সঙ্গে একবার দেখাই করবো।'

এলিজাবেথ দুষ্টুমি করে হাসলো। 'বুঝেছি।'

গ্রেবারও হেসে ফেললো। 'বিশ্বাস করো, ওর কথা আমার মনেই ছিলো না। কিন্তু খাবার কিছু নিতান্ত না হলেই নয়।'

'এই, আমার কিন্তু দেরি হয়ে গ্যাছে—আমি চলি।'

'যাও। আর এদিকের জন্য কিছু ভেবো না।' এলিজাবেথ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর গ্রেবার চেঁচিয়ে বললো, 'কোথায় কোথায় দেখা করবে মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ। কারখানা, কাথেরীনেনকির্খে কিংবা বিনডিং-এর বাড়িতে।'

গ্রেবার হাত তুললো। 'ঠিক আছে।'

গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো এলিজাবেথ দ্রুত পায়ে রাস্তাটা পেরিয়ে যাচ্ছে। আফ্রিকার গ্রাম্য মেয়েদের মতো ওর হাঁটার ভঙ্গিটাও ভারি সুন্দর। কেমন যেন একটা ছন্দ আছে। নির্মেঘ নীলিম আকাশ। সকালের রোদে মিঠে একটা আমেজ। মাকড়সার জালের ওপর শিশিরবিন্দুগুলো টলটল করছে। রাস্তা পেরিয়ে এলিজাবেথ এবার ছুটতে শুরু করলো। তারপর পথের বাঁকে হারিয়ে গেলো। গ্রেবারের মনে হলো, ও যেন যুদ্ধ-সীমান্তে চলে গেলো। আবার কবে ফিরবে কেউ বলতে পারে না।

আটটার সময় পোলমান নিজেই এলেন। 'জানতে এলাম তোমাদের কিছু খাওয়া হয়েছে কিনা। সামান্য কিছু রুটি···'

'ধন্যবাদ, রুটি আমাদের অনেক রয়েছে। যদি কোন অসুবিধে না হয়, কাথেরীনেনকির্খে যাবার আগে এই জিনিসপত্তরগুলো আপনার ওখানে একটু রেখে যেতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে।'

গ্রেবার জিনিসপত্তর সব ভেতরে বয়ে নিয়ে এলো। পোলমান বললেন, 'সম্ভবত তুমি যখন ফিরবে, আমি হয়তো তখন থাকবো না। তবু দিনের বেলায় যখনই ফেরো না কেন, প্রথমে দুটো আস্তে পরে দুটো জোরে টোকা দিও। জোসেফ ঠিক শুনতে পাবে।'

'এখানে এসেও এভাবে পথে পথে ঘুরতে হবে আমি ঠিক ভাবতে পারিনি।'

পোলমান ম্লান হাসলেন। 'জোসেফ এমনিভাবে তিন বছর কাটাচ্ছে। মাসের পর মাস ও ইলেকট্রিক ট্রেনে রাত্রি কাটিয়েছে। সারাক্ষণই ওকে ঘুরে ঘুরে কাটাতে হয়েছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছে, পনরো-কুড়ি মিনিট করে ঘুমিয়ে নিয়েছে। বিমান-আক্রমণ শুরু হবার পর থেকে এখন আর তাও সম্ভব হচ্ছে না।'

গ্রেবার ঝোলা খুলে খাবারের একটা টিন বার করলো। 'এটা জোসেফকে দেবেন।'

'মাংস! কেন, তোমার লাগবে না?'

'না, এটা ওকেই দেবেন। ওর মতো মানুষদের সবার আগে বাঁচাতে হবে। নইলে যুদ্ধ যখন শেষ হবে, কারা আবার দেশকে নতুন করে গড়বে? তখন আমাদের অনেক কিছু আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে।'

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'শুধু জার্মানি নয়, পৃথিবীর অনেক দেশকেই আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে। আমরা ওদের শুধু টুকরোই করেছি, অধিকার করতে পারিনি। তুমি ঠিকই বলেছো এর্নস্ট, মানুষের ইতিহাস কোনদিন ছেড়ে কথা কইবে না।'

'নিশ্চয়ই, স্বেচ্ছাচারীর প্রতিটি রক্তের ঋণ তাকে শোধ করে দিয়ে যেতে হবে।'

'আশ্চর্য,' পোলমান উজ্জ্বল গর্বিত চোখে তাকালেন। 'এই তোমরাই এতদিন আমার চোখে ছিলে সেই ছোট্টটি, চিরতরুণ!'

এ অঞ্চলে একটা বাড়ি ছাড়া আর কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি। সকালের সোনালী রোদে সারা বাগান ঝলমল করছে। বার্চের শাখাগুলো দুলছে হাওয়ায়। জংকুইল ফুটেছে। কি একটা গাছ একঝাঁক সাদা প্রজাপতির মতো গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ছেয়ে আছে। খাঁচায় মুনিয়াগুলো ডাকছে। ফোয়ারার স্তব্ধ জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে ওপরের নীলিম আকাশ।

শুধু বিনডিং-এর বাড়ির একটা অংশই যা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এ বাড়িটার কোনদিন যে কোন ক্ষতি হতে পারে গ্রেবার যেন স্বপ্নেও ভাবেনি। পায়ে পায়ে ও এগিয়ে এলো, তারপর মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো। সামনের দরজাটা ভেঙে দুমড়ে গেছে। ঘাই হরিণের সশাখ শৃঙ্গটা ছিটকে এসে পড়েছে বাগানের সবুজ ঘাসে, যেন এইমাত্র ওটাকে কে কবর দিয়ে গেছে। বিজয়ী আদিবাসীর কারুকার্য-করা নিশানের মতো দরজার পর্দাটা উঁচু গাছের ডালে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

গ্রেবার পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এলো। দেখলো রান্নাঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে কে যেন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

'ফ্রাউ ক্লাইনার্ট?'

কেউ সাড়া দিলো না। কান্নার শব্দ আরও বেড়ে উঠলো।

'ফ্রাউ ক্লাইনার্ট ?'

পরিচারিকাকে এবার দেখা গেলো দরজার সামনে। এলোমেলো রুক্ষ চুল, চোখের পাতাদুটো কান্নায় ভেজা।

গ্রেবার বিস্মিত হলো। 'কি হয়েছে, ক্লাইনার্ট ?'

পরিচারিকা কোন জবাব দিলো না।

'আলফনসের কি কিছু হয়েছে ?'

'উনি মারা গ্যাছেন, হের গ্রেবার।'

গ্রেবারের গলার ভেতরটা যেন শুকিয়ে এলো। 'মারা গ্যাছে !'

'এমন হাসিখুশি, এমন উচ্ছল···আমি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কিন্তু কেমন করে হলো ?'

'উনি তখন ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন।'

'ভাঁড়ার ঘরটা তো ওপরে ?'

'হ্যাঁ।'

'ও সিডেলপ্লাটসের চোরাকুঠরিতে গেলো না কেন, ওটা তো খুব কাছেই ছিলো।'

'উনি বোধহয় ভেবেছিলেন কিছু হবে না। তাছাড়া···' ক্লাইনার্ট ইতস্তত করলো। 'সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন।'

'তখন তো দুপুর ?'

'হ্যাঁ। আগের দিন রাত্তির থেকেই উনি এখানে ছিলেন, দারুণ রূপসী। হের কম্যাণ্ডার আবার রূপসী মেয়েদের অত্যন্ত পছন্দ করতেন। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরেই বিমান-আক্রমণ হয়।'

'মহিলাটিও কি মারা গ্যাছেন ?'

'হ্যাঁ।' ক্লাইনার্ট করুণ চোখে তাকালো। 'দুজনের কারুর গায়েই তখন জামাকাপড় কিছু ছিলো না এবং ওইভাবেই ওঁদের উদ্ধার করা হয়। বিশ্বাস করুন, আমার তখন কিছুই করার ছিলো না। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে, হের কম্যাণ্ডার তাঁর সামরিক পোশাক পরারও সুযোগ পাননি !'

'তাতে কিছু এসে যায় না। যদি মরতেই হয়, এর চেয়ে ভালোভাবে মরা সম্ভব কি না আমি জানি না। ওর তো তখন খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো, তাই না ?'

'হ্যাঁ। উনি খুব তৃপ্তি করেই খেয়েছিলেন।'

'তাহলেই বুঝতে পারছেন, এর চাইতে ভালোভাবে মরা আর সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম এখন আর মিছিমিছি কেঁদে কোন লাভ নেই।'

'কিন্তু উনি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, হের গ্রেবার।'

'সব সময়ই তাই মনে হয়, এমনকি কারুর, নব্বুই বছর বয়েসেও একথা মনে হতে পারে। ওর মৃতদেহটা এখন কোথায়?'

'কফিনে। আপনি দেখবেন?'

'চলুন।'

রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে ওরা ভাঁড়ার ঘরে এসে প্রবেশ করলো। যত টুকরো কাচ ঝেঁটিয়ে জড়ো করা রয়েছে এক কোণে। তাকে এলোমেলো হয়ে রয়েছে টিনের খাবার, মদের বোতল। ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট হয়েছে তার চাইতে বেশি। ঘরের মাঝখানে রয়েছে আখরোট কাঠের তৈরি সুন্দর একটা কফিন। গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো, 'এত তাড়াতাড়ি কফিনটা যোগাড় করলেন কোত্থেকে?'

'পার্টির অফিসার বন্ধুরাই সংগ্রহ করে এনেছেন।'

'এখান থেকেই ওকে কবর দেওয়া হবে?'

'হ্যাঁ। পরশুদিন নটার সময়।'

'আমি তখন উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবো।'

ফ্রাউ ক্লাইনার্ট খুশির চোখে তাকালো। 'হের কম্যাণ্ডারের মৃত আত্মা তাতে শান্তি পাবেন। উনি আপনাকে খুবই পছন্দ করতেন।'

'অথচ কেন, আমি নিজেই জানি না।'

'উনি বলতেন আপনি নাকি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিজে থেকে কখনও ওঁর কাছে কিছু চাননি। তাছাড়া আপনি ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু, একজন প্রকৃত সৈনিক।'

গ্রেবার খানিকক্ষণ কফিনের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। খারাপ লাগলেও ও অনুতপ্ত হতে পারলো না।

'হের গ্রেবার?'

'বলুন?'

'এগুলো আমি আপনার জন্যে আলাদা করে রেখেছি।'

'ওরে বাব্বাঃ, এ তো অনেক কিছু দেখছি!'

'নিয়ে যান। নইলে হাতে হাতে সবাই নিয়ে চলে যাবে।'

'আপনি কিছু রাখতে পারতেন।'

'প্রচুর রয়েছে। তাছাড়া আমার নিজের বলতে কেউ নেই, আর মদ আমি খাই না।'

'কিন্তু…'

'উনি বেঁচে থাকলে এসব আপনাকেই দিতেন এবং দিয়ে খুশি হতেন। তাছাড়া আমি চাই না ওঁর অফিসার বন্ধুরা দেখুক এখানে এত টিনের খাবার বা মদের বোতল পাহাড় হয়ে জমে রয়েছে।'

'সে কথা যদি বলেন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এতো নিয়ে যাবো কি করে?'

'এক বারে না পারেন, দু-তিন বারে নিয়ে যাবেন। কোনরকম সংকোচ করবেন না। আপনি সৈনিক, এতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।'

'নিশ্চয়ই।' গ্রেবার ভাবলো। এলিজাবেথ, জোসেফ, পোলমানেরও এতে অধিকার আছে এবং না নেওয়াটাই হবে সবচেয়ে বোকামি। কিছুটা পথ অতিক্রম করে আসার পর হঠাৎ গ্রেবারের মনে হলো ভাগ্যিস ও বিনডিং-এর বাড়িতে আশ্রয় নেয়নি, নইলে আজ ওরও কবর খোঁড়া হতো বিনডিং-এর কবরের পাশে।

জোসেফ দরজা খুলে দিতেই গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। 'আপনি কি করে জানতে পারলেন?'

'দরজার এই ফুটোটায় আমি চোখ লাগিয়ে বসে ছিলাম। দূর থেকে আপনাকে আসতে দেখলাম।'

গ্রেবার তার হাতের জিনিসপত্তর টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। 'আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। আজ সকালে আমি কাথেরীনেনকির্খে গিয়েছিলাম। গির্জার ধর্মযাজক বলেছেন রাত্রে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'ধর্মযাজক বলতে, বেশ সুন্দর দেখতে একজন তরুণ?'

'না, বরং খুব বৃদ্ধ।'

'বেঁচে গেছেন। উনি ওই ছেলেটির বাবা। ছেলেটি মহা শয়তান, সম্ভবত গেস্টাপোর গুপ্তচর। অথচ ওর বাবা আমাকে সাতদিন গির্জার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

গ্রেবার কাগজের মোড়ক খুললো। সার্ডিন আর হেরিং মাছের কৌটোগুলো সাজিয়ে রাখলো টেবিলের ওপর। তারপর আড়চোখে

তাকিয়ে দেখলো, জোসেফের উদাস চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে গেছে।

'এগুলো আমরা ভাগাভাগি করে নিতে পারি। আমার এক এস এ কম্যাণ্ডার বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার।'

জোসেফ কোন উত্তর দিলো না।

গ্রেবার বললো, 'সম্প্রতি ও অবশ্য মারা গ্যাছে।'

জোসেফ চুপ করে রইলো।

'ও কিন্তু অন্য এস এ'দের মতো নয়।'

জোসেফ মুচকি হাসলো। 'অনেক সময় বন্দীশিবিরে এস এস প্রহরীরাও বন্দীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে এবং বীভৎস অত্যাচারের তুলনায় তখন ওদের অনেক সৎ মনে হয়।'

'আমি যে বন্ধুর কথা বলছি, ও কিন্তু জীবনে কখনও রাইফেলই ধরেনি।'

'তার কোন দরকারও হয় না,' এবার গমগম করে উঠলো জোসেফের সেই ভরাট কণ্ঠস্বর। 'হায়নারা চিরকাল হায়নাই থাকে।'

'মানুষ কিন্তু তার ব্যতিক্রম। যে মানুষ খুন করে, খুনী হয়ে সে জন্মায় না···অনেক সময় পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে সে খুন করতে বাধ্য হয়। আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি···' গ্রেবার জোসেফের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ওর চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। 'আমি জানি, আপনি আমাকে ঘৃণার চোখেই দেখবেন!'

'আপনি কিন্তু ভুল করছেন,' জোসেফ খুব শান্ত স্বরে বললো। 'কাউকে ঘৃণা করতে গেলে কোন কিছুকে প্রচণ্ড ভালবাসতে হয়, এবং ঘৃণা করার আগে সেই ভালবাসার যোগ্য হতে হয়।'

গ্রেবার প্রতিটি শব্দ একটু একটু করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো। তাই একটু নীরবতার পর ও বললো, 'আসলে আমি আপনার জন্যে সামান্য কিছু করতে চাই।'

'আমার জন্যে তেমন কিছু করার নেই। আমি একা। হয় ধরা পড়বো, নয়তো টিকে যাবো।' এমন নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে ও কথাটা বললো যেন অপরিচিত কেউ কিংবা কোন আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলছে।

'আপনার আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই?'

'ছিলো সবই। ভাই, দু বোন, বাবা, মা, স্ত্রী, ছোট একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাই শুধু মারা গ্যাছে স্বাভাবিকভাবে। দুজনকে পিটিয়ে মারা হয়েছে বন্দীশিবিরে, বাকি সবাইকে হত্যা করা হয়েছে গ্যাস চেম্বারে।'

গ্রেবার চককে উঠলো। 'গ্যাস চেম্বারে ?'

'গ্যাস চেম্বারে।' আগেরই মতো থমথমে স্বরে জোসেফ বললো। কণ্ঠস্বরে কোথাও কোন উত্তাপ নেই, না ম্লানিমা। একটু নিস্তব্ধতার পর ও দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'কেবল আমিই যা পালাতে পেরেছিলাম।'

এই মুহূর্তে গ্রেবারের মনে হলো ওর কিছু বলার নেই, সব কথা যেন শেষ হয়ে গেছে। অপলক চোখে সারি সারি বইগুলোর দিকে ও তাকিয়ে রইলো।

জোসেফ শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি যুদ্ধ-সীমান্তেই ফিরে যাবেন ?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধ-সীমান্তেই আমাকে ফিরে যেতে হবে—যাতে আপনার মতো মানুষদের শিকার-করে-ফেরা শয়তানগুলো আরও কিছুদিন ক্ষমতার আসনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে পারে।'

জোসেফ কোন জবাব দিলো না।

'এবং আমাকে যেতে হবে, যেহেতু আমি চাই না ওরা আমাকে গুলি করে মারুক। আমি যদি আত্মগোপনও করি, ওরা আমার বাবা মা আমার স্ত্রীকে গুলি করে মারবে কিংবা বন্দীশিবিরে নিয়ে যাবে।'

জোসেফ নিশ্চুপ।

'আমাকে যেতে হবে, যেহেতু আমার যুক্তি কোন যুক্তিই নয় আর ওদের চোখে মানবিকতার কোন মূল্য নেই। আপনি হয়তো আমাদের অবজ্ঞার চোখে দেখবেন...'

'আপনি এই ব্যাপারটাকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন ?' জোসেফ টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। 'তাছাড়া ঘৃণা বা অবজ্ঞার কোন প্রশ্নই আসে না। আমি কি পোলমানকে অবজ্ঞা করেছি? নিজের জীবন বিপন্ন করে যারা রাতের পর রাত আমাকে গোপনে আশ্রয় দিয়েছে, আমি কি তাদের ঘৃণা করেছি ? ওরা যদি আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো, এককভাবে আমি কি বাঁচতে পারতাম ?' হঠাৎ চুপ করে জোসেফ বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলো। সে হাসির গভীরতা স্পর্শ করে গেলো গ্রেবারের প্রতিটি রক্তস্রোত। 'আপনি কিন্তু এ প্রসঙ্গে বেশি আলোচনা করবেন না। এখনও সে সময় আসেনি। আর নিজেকে কখনও দুর্বল করবেন না। মনে রাখবেন, বিপদের দিনে নিজেকে বাঁচাতে হবে সবার আগে। ঠিক যেমন প্রয়োজন আজকের দিনে টিনের এই খাবারের।'

'আচ্ছা, আপনাকে যদি আমার একটা পুরনো পোশাক আর পরিচয়-পত্রটা দিই, কাজে লাগবে ? প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ। আপাতত আমার এসব কিছু লাগবে না।'

'আমার কিন্তু কোন অসুবিধে হবে না। কৈফিয়ত চাইলে বলবো, পুড়ে কিংবা হারিয়ে গ্যাছে।'

'না, সেজন্যে নয়। আয়রণ ফ্রন্টের একজন রুমানিয়ান সভ্য হিসেবে আমাকে পার্টির ভেতরে ঢুকে কাজ করতে হবে। পোলমানের সঙ্গে আমার কথাও হয়ে গ্যাছে। এসব ব্যাপারে ওঁর আবার দারুণ মাথা।'

গ্রেবার মনে মনে চমকে উঠলো। হের পোলমানকে এ আলোকে ও কোনদিন বিচার করে দেখেনি। তাহলে ফ্রেজেনবুর্গও কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য!

জোসেফ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার বিছনাপত্তর কি এখন সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

'আপনি তো এখন এখানে রয়েছেন?'

'না, আমি একটু বেরুবো।'

'আর দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। আমাকে আর একবার যেতে হবে, মদের বোতল আর সিগারেটের প্যাকেটগুলোই নিয়ে আসা হয়নি।'

'সিগারেট!'

'হ্যাঁ, খুব ভালো কয়েক প্যাকেট বিদেশী সিগারেট আছে।'

জোসেফের মুখের চেহারা এখন যেন বদলে গেলো। একটু একটু করে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো ওর আয়ত চোখদুটো। 'অনেক দিন কোন ভালো সিগারেট খাইনি। কখনও কখনও সারাদিনে একটা সিগারেটও জোটাতে পারিনি। খাদ্যের চাইতে ওর প্রয়োজন আমার কাছে কোন অংশে কম নয়।' জোসেফ মুচকি হাসলো। 'নিশ্চয়ই, সিগারেটের জন্যে আর খানিকক্ষণ আমি স্বচ্ছন্দে অপেক্ষা করে যেতে পারি।'

বাইশ

এন্ডারষ্ট্রাসে ধরে গ্রেবার মন্থর পায়ে পথ হাঁটছিলো। তখন বিকেল পাঁচটা। সারাটা দিন একটা আস্তানার খোঁজে ও হন্যে হয়ে ঘুরেছে, কোথাও কিছু যোগাড় করতে পারেনি। শেষে ক্লান্ত হয়ে ও-আশা ছেড়ে দিলো।

এদিকটায় ধ্বংসের চেহারা আরও ব্যাপক, আরও নগ্ন। সারির পর সারি ভগ্নস্তূপ। রাস্তাটা মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে। আনমনে পথ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ও চমকে উঠলো। প্রথমটায় গ্রেবার বিশ্বাসই করতে পারেনি। দেখলো বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির মধ্যে ছোট একটা দোতলা বাড়ি। পুরনো আমলের হলেও বাড়িটা সম্পূর্ণ অক্ষত। রাস্তা থেকে একটু দূরে, চারদিকে বাগান-ঘেরা। বসন্তের কচি পাতায় হিন্দোলিত হচ্ছে দেবদারুর শাখাগুলো। এ যেন বিস্তীর্ণ ধ্বংসের মাঝে ছোট্ট একটা শ্যামলী মরূদ্যান। ফটকের দু'পাশে লাইলাকের ঝোপ, সবে কুঁড়ি ফুটতে শুরু করেছে। বেড়াটার কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি। দোতলার বারান্দায় একটা বিজ্ঞাপন ঝুলছে— 'পান্থনিবাস'।

বাগানের ফটক পেরিয়ে গ্রেবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে কেমন যেন অলীক একটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। দরজা-জানলার একটা কাচও ভাঙেনি। দু'পাশে জংকুইল, ভায়লেট আর গোলাপ ফুটেছে। খোলা দরজার সামনে বাদামী রঙের একটা শিকারী কুকুর ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো এ সবকিছু ও যেন এর আগে কোথাও দেখেছে। কিন্তু কোথায়, ও তো মনে করতে পারলো না। তবে অনেক— অনেক দিন আগে। কে জানে, হয়তো বা স্বপ্নেও দেখে থাকতে পারে।

দরজা পেরিয়ে ও ভেতরে প্রবেশ করলো। কেউ নেই, ঘরটা খালি। তিনটে টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার পাতা। দেওয়ালের গায়ে তাকের ওপর কয়েকটা গ্লাস উপুড় করে রাখা রয়েছে। কোথাও কোন বোতল নেই, না দেওয়ালে টাঙানো একটাও ছবি। সবকিছুতে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে।

কুকুরটা ঘুম ভেঙে আগেই ঝাউ ঝাউ করে ডেকে উঠেছিলো। এবার মাঝামাঝি বয়েসের এক ভদ্রমহিলাকে নিচে নেমে আসতে দেখে গ্রেবার আশ্বস্ত হলো। ম্লান দারিদ্র্যের প্রচ্ছন্ন একটা ছাপ থাকলেও, শান্ত সৌম্য চেহারা। পাতলা ঠোঁটের প্রান্তে চারিত্রিক ঋজুতার ছাপ সুস্পষ্ট।

হাইল হিটলারের পরিবর্তে উনি শুধু বললেন, 'সুসন্ধ্যা।'

সত্যিই তাই। সারাদিনের উদ্বিগ্ন ক্লান্তি শ্রান্তির পর ওর মনে হলো নিঃসন্দেহে এটা সুসন্ধ্যা। তাছাড়া তৃষ্ণায় বুকের কলজেটা ওর টাক টাক করছিলো। ধুলোয় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলো কিছু পানীয় নেবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—মৃত্যু-সীমানার বাইরে রমণীয় এই সন্ধ্যাটা ও এলিজাবেথের সঙ্গে কাটাবে এই সুন্দর শ্যামলী মরূদ্যানে।

'আচ্ছা, রাত্রের জন্যে এখানে খাবার কিছু পাওয়া যাবে ?'

ভদ্রমহিলা ইতস্তত করলেন। 'দেখুন, সত্যি বলতে কি এখন ও পাট প্রায় তুলে দিয়েছি বললেই চলে। তাছাড়া বিশেষ কিছু নেইও।'

'আমাদের কুপন আছে। আমার আর আমার স্ত্রীর, দুজনেরই। যদি বলেন তো কৌটোর খাবারও নিয়ে আসতে পারি।'

'আমাদের অবশ্য মটরশুঁটির...'

'মটরশুঁটি তো চমৎকার ! বহুদিন মটরশুঁটির স্যুপ খাইনি।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন। মায়ের হাসির মতো মিষ্টি অথচ নিঃশব্দ যন্ত্রণায় ভেজা নির্মম একটুকরো হাসি। 'আপনার যদি সত্যি কোন অসুবিধে না হয়, নিশ্চয়ই আসবেন। ইচ্ছে করলে বাগানেও বসতে পারেন।'

'খুব ভালো হবে। আমরা তাহলে কি আটটায় আসবো ?'

'মটরশুঁটির স্যুপের জন্যে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে না এলেও চলবে। আপনাদের যখন খুশি আসবেন।'

পিয়ানোওয়ালা বাড়ির দরজার সামনে এসে গ্রেবার দেখলো ওর নামে একটা চিঠি পিন দিয়ে গাঁথা রয়েছে। ওপরে মার হাতের লেখা। সীমান্ত থেকে ফিরোত পাঠানো হয়েছে। চিঠিটা হাতে নিতেই বুকের রক্ত ওর চলকে উঠলো। প্রকম্পিত হাতে খামের মুখটা ও ছিঁড়ে ফেললো। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। মা জানিয়েছেন কাল ভোরে ওঁরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখনও জানেন না। শুধু সতর্কতার জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ও যেন কিছু না ভাবে।

গ্রেবার তারিখটা দেখলো, ওর ছুটির কয়েকদিন আগে লেখা। চিঠিতে বিমান-আক্রমণের কোন উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে মা আবার ভীষণ সতর্ক, যাতে আপত্তিকর কোন শব্দ সরকারী মহল না খুঁজে পায়।

চিঠিটা ধীরে ধীরে মুড়ে ও পকেটে রাখলো। যাক, ওঁরা তাহলে বেঁচে

আর্ষেন! গ্রেবার গভীর একটা শ্বাস নিলো, মনে হলো ভারি একটা বোঝা যেন ওর কাঁধ থেকে নেমে গেলো। ও চারদিকে তাকালো। সারাটা হাকেনষ্ট্রাসে এখন মনে হচ্ছে কেমন যেন অন্যরকম।

'এই যে সীমান্ত সৈনিক,' পাগল ওয়ার্ডেনের হঠাৎ কণ্ঠস্বরে গ্রেবার চমকে উঠলো। 'এখনও বেঁচে আছেন তাহলে?'

'হ্যাঁ, আপনারই মতন।'

'চিঠিটা পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'গতকাল দুপুরে এসেছিলো। আমি পিন দিয়ে গেঁথে রেখেছি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'তাহলে আপনার পেনসিলে লেখা আগের চিঠিটা এবার খুলে ফেলি? জায়গার ভীষণ টানাটানি। পাঁচজন ইতিমধ্যেই ফিরে গ্যাছে।'

'না, আর দুটো দিন অপেক্ষা করুন।'

'আপনাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে।' হঠাৎ ওয়ার্ডেন গম্ভীর হয়ে গেলো। 'তিনটে বাচ্ছা সমেত একজন বিধবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার বিজ্ঞাপনের জন্যে একটা জায়গা দরকার।'

'তাহলে আমারটা খুলে ফেলুন।'

ওয়ার্ডেন চিঠিটা তুলে, গ্রেবারের হাতে দিলো। গ্রেবার চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিলো। ওয়ার্ডেন হাঁ হাঁ করে উঠলো, 'পাগল না মাথা খারাপ, এরকম জিনিস কেউ কখনও ছেঁড়ে? এটা ছেঁড়া মানেই নিজের ভাগ্যকে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলা। এটা রাখলেই দেখবেন ওঁরাও রয়ে গ্যাছেন।'

গ্রেবার স্তম্ভিত বিস্ময়ে পাগলের মুখের দিকে তাকালো। সেদিনের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ভেবেছিলো যতটা সম্ভব ওকে এড়িয়ে চলবে। কিন্তু এখন এটাকে নিতান্তই একটা কুসংস্কার বলে ও উড়িয়ে দিতে পারলো না। কাগজটা ও সযত্নে মুড়ে রাখলো খামের মধ্যে।

'অথচ জানেন…' ওয়ার্ডেনের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়লো। 'সবাই আমাকে পাগল বলে। আপনিও প্রথমে তাই ভেবেছিলেন। এখন দেখলেন তো শেষ পর্যন্ত আপনার চিঠি এলো?'

গ্রেবার কোন প্রতিবাদ করলো না। নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে ও ফিরে এলো। আসার পথে ভাবলো, বাবা-মার বেঁচে থাকার কথাটা ও এলিজাবেথকে কিছু বলবে না।

কারখানার কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ওকে এখন ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গোধূলির রাঙা আলো এসে পড়েছে ওর সারা মুখে। পার্কটাকে মনে হচ্ছে স্বাভাবিকের চাইতে বড় আর ধ্বংসলীন বাড়িগুলো আগের চেয়ে আরও মর্মস্পর্শী।

'আমি আবার কয়েকদিনের ছুটি পেয়েছি, এর্নস্ট।' এলিজাবেথ ফিস-ফিস করে বললো।

'ছুটি! কতদিনের?'

'পরশু থেকে তিনদিন। তোমার ছুটির শেষ তিনদিন।'

গ্রেবার থমকে দাঁড়ালো। দেখলো এলিজাবেথের দু চোখে অশ্রু টলটল করছে। 'এলিজাবেথ, তুমি···'

'আমি ওদের সব বুঝিয়ে বলেছি, এর্নস্ট। যদিও এই তিনদিন আমাকে পরে পুষিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না।'

গ্রেবার কোন উত্তর দিলো না। দিতে পারলো না। দুজনে পরস্পরের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো। দুজনেরই বুকের অতল থেকে মুচড়ে উঠছে নিঃশব্দ যন্ত্রণা, কালবৈশাখীর ঘূর্ণি ঝড়ের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ব্যর্থ হতাশা—যার থেকে ওরা মুক্তি পেতে চেয়েছিলো, যাকে ওরা সযত্নে এড়াতে চেয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত যার মুঠোর মধ্যে ওদের আত্মসমর্পণ করতে হলো। তবু গ্রেবারের মনে হলো এই হতাশার গহন গভীর থেকে যেন উথলে উঠছে কোমল ভালবাসা, কবোষ্ণ একটা প্রতীতি। তাহলে শেষ তিনটে দিন আমরা অন্তত একসঙ্গে কাটাতে পারবো?'

'হ্যাঁ, এর্নস্ট।'

'এই তিনটে দিনই আমাদের জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক, এলিজাবেথ!'

গ্রেবার নিবিড় করে ওর কাঁধটা জড়িয়ে ধরলো। তারপর দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চললো। পোড়ো-বাড়ির নির্জন একটা জানলায় বেলাশেষের সূর্যটা রঙিন পর্দার মতো ঝুলছে।

'আজ আমরা কোথায় ঘুমবো, এর্নস্ট?'

'গির্জায়। কিন্তু তার আগে আমরা এখন একটা নতুন জায়গায় যাবো।'

'এটার কথাই তুমি বলছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি, চমৎকার!' এলিজাবেথ কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে নিলো। 'ঠিক যেন রূপকথার মতো মনে হচ্ছে!'

'ভেবেছি এই রম্য মরূদ্যানেই আমরা দুজনে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দেবো।'

চামেলির মতো কি যেন একটা ফুলের গন্ধে বাতাস মেঁা মেঁা করছে। একটু আগে কে যেন গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল দিয়েছে। কুকুরটা এবার ছুটে এসে দুজনের পোশাক শুঁকলো। তারপর অস্পষ্ট একটা কুঁই কুঁই শব্দ করলো। বোঝা গেলো না এটা ওর আনন্দের অভিব্যক্তি, না দুঃখের বহিঃপ্রকাশ। ফ্রাউ ভিট্রে স্মিতহাস্যে দুজনকে নিঃশব্দে আহ্বান জানালেন। উনি এখন পোশাকের ওপর সাদা একটা আচ্ছাদন পরেছেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা বাগানেই বসবেন তো?'

'হ্যাঁ।' এলিজাবেথ সুন্দর করে হাসলো। 'তার আগে যদি সম্ভব হয় আমি একটু হাত-মুখ ধুতে চাই।'

'নিশ্চয়ই, আসুন আমার সঙ্গে।' উনি গ্রেবারের দিকে ফিরে তাকালেন। 'আপনি বরং এই দিক দিয়ে পেছনের বাগানে চলে যান।'

এলিজাবেথকে নিয়ে উনি দোতলায় উঠে গেলেন। গ্রেবার পাশের দরজা দিয়ে পেছনের বাগানে এলো। গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো, বাইরে থেকে বোঝাই যায় না বাগানটা এতো বড়। গালচের মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা মসৃণ মেঝে, ঝকঝক তকতক করছে। চারদিকে উঁচু উঁচু দেবদারু গাছ দিয়ে ঘেরা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, প্রাচীন অরণ্য-দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কোন দুর্গ। দূরে দূরে দু-একটা লাইলাকের ঝোপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে ধবধবে সাদা চাদর ঢাকা একটা ছোট টেবিল। দু'পাশে দুটো চেয়ার। টেবিলের ওপর প্লেট, গ্লাস, পাশে ঢাকা একটা জলের পাত্র। পাত্রের গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে রয়েছে। গ্রেবার এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেলো। যেমন ঠাণ্ডা তেমনি স্বাদ, বুক যেন জুড়িয়ে গেলো।

এলিজাবেথ ফিরে এলো। 'এটা তুমি কেমন করে খুঁজে পেলে, এর্নস্ট?'

গ্রেবার হাসলো। 'হঠাৎ করেই।'

এলিজাবেথ ঘাস মাড়িয়ে পায়ে পায়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলো। হাত দিয়ে কুঁড়িগুলো আলতো করে স্পর্শ করলো। 'এই ছাখো, কেমন সুন্দর কুঁড়ি এসেছে!'

'হ্যাঁ, আর কয়েকদিনের মধ্যেই ফুল ফুটবে।' গ্রেবার মনে মনে ভাবলো তখন আমি আর এখানে থাকবো না।

এলিজাবেথ ফিরে এলো। গ্রেবার সুগন্ধি সাবানের মৃদু গন্ধ পেলো। গন্ধটা যেন ওর প্রস্ফুটিত যৌবনের। ওকে এখন অনেক সতেজ আর সুন্দর দেখাচ্ছে। এলিজাবেথ চপল চোখে হাসলো। 'জানো, এখানে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে এটা যেন আগে কোথায় দেখেছি।'

'প্রথম দেখার পর আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিলো, এলিজাবেথ!'

'মনে হচ্ছে এর আগে যেন এখানে এসেছি। তুমি আমি, আমরা দুজনে···ঠিক এই বাগানটায়, হয়তো খুব ছোটবেলায়; তবু এখন যেন স্পষ্ট মনে পড়ছে।' এলিজাবেথ গ্রেবারের কাঁধে আলতো করে মুখ রাখলো। 'আঃ, জীবনের শেষ কটা দিন যদি দুজনে এমন শান্তিতে একটু কাটাতে পারতাম!'

গ্রেবার কিছু বললো না, শুধু ওর নরম চুলে হাত বুলিয়ে আদর করলো। ফ্রাউ ভিট্টে খাবার নিয়ে এলেন। গ্রেবার ওঁর হাতে কয়েকটা রেশন-কুপন গুঁজে দিলো। 'এগুলো আপনি রেখে দিন।'

'এতগুলো আমার লাগবে না।' ফ্রাউ ভিট্টে সংকুচিত হলেন। 'মটরশুঁটি আমার ঘরে আগে থেকেই ছিলো। শুধু চিনির জন্যে দু-একটা কুপন হলেই চলে যাবে।'

'না না, এগুলো আপনি সব রেখে দিন, আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।'

'আপনারা ইচ্ছে করলে পান করতেও পারেন। এখনও কয়েক বোতল বিয়ার আছে।'

'অপূর্ব! অপূর্ব!' গ্রেবার বাচ্চাদের মতো খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো। 'এমনি একটা স্নিগ্ধ পরিবেশে বিয়ার না হলে ঠিক জমে না।'

গ্রেবারের ছেলেমানুষি দেখে দুজনেই হেসে ফেললো। ফ্রাউ ভিট্টে গাঢ় চোখে গ্রেবারের দিকে তাকালেন। একদিকে নিঃসঙ্গ মাতৃত্ব অন্যদিকে শোভন ব্যক্তিমানস যেন উপচে উঠছে। ধীর পায়ে উনি ভিতরে চলে গেলেন।

রক্ত-মেঘে বেলাশেষের সূর্য ডুবে গেছে অনেক আগেই। সায়াহ্নের মৃদুল হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপছে। কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে। আজ দুপুরে স্টেশনের পথে ঠিক এমনি ডাক শুনে গ্রেবারের কান্না পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। গ্রেবার ট্রে থেকে ঝোলের পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে ঢাকনা খুললো। ঘন করে রাঁধা মটরশুঁটি আর বোলাগ্‌না সসেজ। 'নাঃ, আজ সবকিছুরই কোন তুলনা হয় না দেখছি!'

গ্রেবার খানিকটা করে ঝোল প্লেট ছুটোয় ঢেলে নেয়। ফ্রাউ ভিট্রে বিয়ার দিয়ে গেলেন। বোতল খুলে গ্রেবার ছুটো গ্লাস ভর্তি করলো। ওরা গ্লাসছুটো তুলে নিয়ে পান করে। বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা বিয়ার। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা নিঃশব্দে আহার করলো।

ধীরে ধীরে আঁধার ঘনিয়ে এলো। আকাশে শত্রু-বিমান-খুঁজে-ফেরা একটা তীব্র আলোর রেখা মেঘের বুক চিরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে গেলো। থেমে গেছে কোকিলের গান। রাত্রি শুরু হলো।

ঝোলের পাত্রটা ভরে দেবার জন্যে ফ্রাউ ভিট্রে ফিরে এলেন। 'একি, আপনারা কিছুই খেতে পারেননি দেখছি!'

'মোটেই তা নয়,' গ্রেবার প্রতিবাদ করলো। 'ঝোলের পাত্রটা প্রায় ফাঁকা করে এনেছি।'

'না না, ভালো করে পেট ভরে খান। এইতো খাবার বয়স। আমি আপনাদের জন্যে একটু স্যালাড আর পনীর নিয়ে আসছি।'

আকাশে এবার চাঁদ উঠলো। এলিজাবেথ হাসতে হাসতে বললো, 'যা-কিছু চাওয়ার সবই এখানে রয়েছে দেখছি—এই চাঁদ, বাগান, টেবিলে সাজানো খাবার। এখনও সারা রাত্রি পড়ে রয়েছে আমাদের জন্যে। সত্যি এর্নস্ট, এত সুখ আমি যেন সহ্য করতে পারছি না।'

'এমনি ভাবেই সারাজীবন সবাই বাঁচতে চায়, এলিজাবেথ। বিশেষ অর্থে এটা নতুন কিছু নয়।'

'হয়তো তাই। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে, যেহেতু এখান থেকে ধ্বংসের কোন চিহ্ন চোখে পড়ছে না।'

'যুদ্ধ শেষ হলে আমরা ঠিকভাবে বাঁচার চেষ্টা করবো। হয়তো এমন কোন শহরে যাবো যেখানে ধ্বংসের কোন চিহ্ন থাকবে না, যেখানে বোমার ভয়ে কেউ মুখ লুকোবে না। আমরা হয়তো সন্ধ্যেবেলায় ছুজনে হাত ধরাধরি করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবো, আর দোকানের শার্সিগুলো আলোয় ঝলমল করবে। তখন রাত্রেও আলোয় পরস্পরের মুখ দেখতে কোন অসুবিধে হবে না।'

'ওরা আমাদের কোথাও যেতে দেবে না, এর্নস্ট।'

'কেন নয়? এমনি বেড়াতে যাবো। যেমন ধরো সুইজারল্যাণ্ডে।'

এলিজাবেথ বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে হাসলো। 'ইশ, আমাদের কত যেন টাকা!'

'টাকাটা আনতে কোন সমস্যাই নয়। আমরা একটা ভালো ক্যামেরা

নিয়ে যাবো, ছবি তুলে বিক্রি করবো। দিন পনের কাটিয়ে দেওয়া মোটেই শক্ত কিছু নয়।'

এলিজাবেথ বাচ্ছা মেয়ের মতো ঠোঁট ফোলালো। 'আহাঃ, আমার জামা-কাপড় আর দু-একটা গয়না বুঝি লাগবে না?'

ফ্রাউ ভিট্রে স্যালাড আর পনীর নিয়ে এলেন। 'এখানে আপনাদের ভালো লাগছে তো?'

'ভীষণ। আমরা কিন্তু আরও খানিকক্ষণ এখানে থাকবো।'

'যতক্ষণ খুশি। আমি আপনাদের জন্যে কফি নিয়ে আসছি। অবশ্য ম্যল্ট্ কফি।'

'ওরে বাব্বা,!' গ্রেবার চোখ বড় বড় করে তাকালো। 'এ যে দেখছি একেবারে বেণীর সঙ্গে মাথা!'

'পাগল ছেলে!' ফ্রাউ ভিট্রে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

এগারোটা নাগাদ ওরা মরূদ্যান ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আকাশে তখন নিঃসঙ্গ একলা চাঁদ।

'আপনারা বড্ড দেরি করে ফেলেছেন,' ওদের আসতে দেখে গির্জার তরুণ যাজক গজগজ করলো। 'ভেতরে এখন আর একটুও জায়গা নেই।'

গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো এ সকালের সেই বৃদ্ধ নন। সম্ভবত ওঁর ছেলে, জোসেফকে যে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলো। মুখের আদলে বৃদ্ধের সঙ্গে একটা মিলও রয়েছে। তীক্ষ্ণ নাক, পরিষ্কার কামানো চিবুক।

'আমরা ভেতরের বাগানেও ঘুমতে পারি।'

'ইচ্ছে করলে ঘুমতে পারেন, কিন্তু ওখানে অনেকে ঘুমচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।'

গ্রেবার তার জিনিসপত্তর সংগ্রহ করে নিলো। তরুণ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কি বিবাহিত?'

'কেন বলুন তো?' গ্রেবার অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো।

'এটা ঈশ্বরের আবাসভূমি। এখানে স্ত্রী-পুরুষদের আলাদা আলাদা ঘুমতে হবে।'

'বিবাহিত হলেও?'

'হ্যাঁ, বিবাহিত হলেও।'

'কিন্তু বাগানে?'

'বাগানও গির্জার অন্যতম অংশ। কিন্তু আপনাদের দেখে তো বিবাহিত বলে মনে হচ্ছে না?'

গ্রেবার কোন কথা না বলে বিয়ের সার্টিফিকেটটা বার করে দিলো। তরুণ আলোর নিচে গিয়ে পড়ে দেখলো। তারপর ফিরে এলো। 'খুব অল্পদিন বিয়ে হয়েছে দেখছি।'

'কেন, এরও আবার কোন বিধি-নিষেধ আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। গির্জায় বিয়ে না হলে···'

'দেখুন,' গ্রেবার এবার চাপা গর্জন করে উঠলো। 'বেশি ওস্তাদি করার চেষ্টা করবেন না। আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত, শুতে চললাম। যদি কিছু করার থাকে কাল সকালে করবেন।'

'কি ব্যাপার বীডেনডিক, এত গোলমাল কিসের?'

বৃদ্ধ যাজক হঠাৎ ঘুম ভেঙে কখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, কেউ টের পায়নি। কণ্ঠস্বরে গ্রেবার ঘুরে দাঁড়ালো। ও ভেবেই পেলো না বয়সের ভারে জীর্ণ, শীর্ণকায় এই বৃদ্ধ কেমন করে একজন আত্মগোপনকারী পলাতককে সাতদিন গোপনে আশ্রয় দিতে পারেন।

তরুণ সমস্ত ব্যাপারটা ওঁকে বুঝিয়ে বললো। উনি হাত তুলে ওকে থামাবার চেষ্টা করলেন। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজকের রাত্রিটার মতো ওদের ঘুমতে দাও। তারপর যদি কোন অসুবিধে হয়···' বৃদ্ধ গ্রেবারের দিকে ফিরলেন, 'কাল রাত নটার সময় আপনি সাত নম্বর ডমহোফে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। বলবেন প্যাস্টর বীডেনডিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কোন না কোন ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করতে পারবো।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বৃদ্ধ তরুণ যাজককে বললেন, 'যাও, এঁদের বাগানের পথটা দেখিয়ে দাও।'

প্রথমে ছোট একটা দরজা, তারপর লম্বা টানা বারান্দা পেরিয়ে ওরা বাগানে এসে পৌঁছলো। সারা বারান্দায় কোথাও এতটুকু পা ফেলার জায়গা নেই, কাতারে কাতারে লোক সার দিয়ে ঘুমচ্ছে।

তরুণ বারান্দার ওপর থেকেই দেখিয়ে দিলো। 'ওই দিকটা কবরখানা। দেখবেন, ওখানে আবার শোবেন না যেন। দুজনের বিছনা আলাদা আলাদা করবেন আর পোশাক-পরিচ্ছদ কিছু খুলবেন না।'

'জুতোও না?'

'জুতোর কথা আলাদা।'

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো। চারদিকে নাক ডাকার বিচিত্র শব্দ। উঁচু বারান্দা আর বাগানের ধার ঘেঁষে গ্রেবার ছটো বিছনা পাতলো। বিছনা বলতে ঘাসের ওপরেই একটা ক্যানভাস, অন্যটায় কম্বল পেতে তার ওপর চাদর ঢাকা দিলো। এলিজাবেথ হাসলো।

গ্রেবার মুখ তুললো। 'কি ব্যাপার, হাসছো যে ?'

'দেখো, বিছনাছটো যেন ঠ্যাকে না !'

'ও, এই কথা !' ওর বলার ভঙ্গি দেখে গ্রেবারও হেসে ফেললো।

'আর জামা-কাপড় একদম কিচ্ছু খুলবে না।'

'উঁহু, একদম নয়।'

ঝোলাঝুলি দেওয়ালের একপাশে রেখে গ্রেবার জুতোজোড়া খুললো। তারপর এলিজাবেথকে ডাকলো, 'এসো, শোবে এসো।'

সমস্ত নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে হঠাৎ মহিলাকণ্ঠে শোনা গেলো একটা উৎচকিত আর্তনাদ, 'না না না, আ-আঃ···'

কে যেন চাপা গলায় বললো, 'চুপ ! চুপ ! কিচ্ছু হয়নি !'

এলিজাবেথ প্রথমে ভয় পেয়ে গ্রেবারকে জড়িয়ে ধরেছিলো। এবার ভুল বুঝতে পেরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'নাঃ, ঘুমিয়েও মানুষের জীবনে শান্তি নেই !'

এবার ছজনে টান-টান করে নিজেদের মেলে দিলো। সারাদিনের ক্লান্তি যেন এখন ভর করে এলিজাবেথের ছু চোখের পাতায়। গির্জার ভাঙা চূড়ার আড়ালে চাঁদটা ঢাকা পড়েছে। ক্রুশ-দেওয়া সারি সারি কবরগুলো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে।

গ্রেবার মাথা তুললো। 'এই ?'

'উঁ।'

'ঘুমোওনি ?'

'না।'

'ভয় করছে ?'

'হুঁ।'

'এসো, আমার কাছে এসো।'

'কিন্তু ওরা যদি জানতে পারে ?'

নিকুচি করেছে ওদের জানাজানির। তুমি আমার বুকের মধ্যে মুখ রেখে ঘুমলে ভয় করবে না, এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।'

তেইশ

গোলাপঝোপে পাখিদের কলকাকলিতে গ্রেবারের ঘুম ভেঙে গেলো। সূর্য তখনও ভালো করে ওঠেনি। ঝোলা খুলে এবার স্টোভ বার করলো। ভাবলো কেউ উঠে পড়ার আগেই প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলবে। তার আগে একটু জল চাই। মগ নিয়ে ও চারদিকে তাকালো। তরুণ ঠিকই বলেছিলো, ডানদিকে কেবল মেয়েরা ঘুমচ্ছে। বাঁদিকে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই জলের কলটা ও দেখতে পেলো। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মর্মর একটা মূর্তি, তার নিচেই কল। অদূরে কে একজন হাঁ করে ঘুমচ্ছে। কপালে দগদগে পোড়া দাগ। একটা পা নেই। কাঠের পাটা পাশে খোলা রয়েছে। ভোরের প্রথম আলোয় ওর পালিশ-করা কাঠের পাটা ঝকঝক করছে।

গ্রেবার যখন ফিরে এলো, দেখলো এলিজাবেথ উঠে পড়েছে। বিছনা-পত্তর গুটিয়ে রেখেছে একপাশে। ওকে এখন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কোথাও কোন ম্লানিমা নেই। এমন নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে যে জামা-কাপড়েও কোন ভাঁজ পর্যন্ত পড়েনি। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। গ্রেবার বললো, 'এইবেলা শীগগির চলে যাও, কলটা ফাঁকা আছে। চলো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এলিজাবেথ হাসলো। 'তোমাকে দেখাতে হবে না, আমি খুঁজে নেবো। তুমি বরং জিনিসপত্তরগুলোর ওপর চোখ রাখো, নইলে কেউ আবার হাওয়া করে দেবে।'

এলিজাবেথ এগিয়ে গেলো। গ্রেবার ওর ছন্দিল হাঁটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ ও চেঁচিয়ে উঠলো, 'উঁহু, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। সোজা বাঁদিক দিয়ে চলে যাও।'

স্টোভ জ্বেলে ও কফির জল বসালো। তারপর হাতে হাতে জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিলো। পাঁউরুটি কেটে মাখন মাখালো। রুটি মাখন কফি—সবই বিনডিং-এর বাড়ি থেকে আনা। আশ্চর্য! বিনডিং বরাবরই ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলো, অথচ ওকে ও ঠিক পছন্দ করতে পারেনি।

এলিজাবেথ ফিরে এলো। 'বাঃ, সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে তো!'

'দস্তুরমতো আসল বিন কফি।'

'নিশ্চয়ই বিনডিং-এর বাড়ি থেকে আনা?'

'অবশ্যই। এবং সম্পূর্ণ সৈনিকী কায়দায় তার সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে।'

এলিজাবেথ হাসলো। দুজনে ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসে প্রাতঃরাশ সেরে নিলো।

এলিজাবেথ এবার গ্রেবারের পিঠে ঠেস দিয়ে বসলো। 'এই, এখানে সিগারেট খেলে কিছু বলবে না তো ?'

'দেখলে নিশ্চয়ই বারণ করবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আমরা নির্দ্বিধায় ধূমপান করতে পারি।'

'দরকার নেই। চলো, জিনিসপত্তর জমা দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। সেই তো আবার কারখানায় যেতে হবে।'

'আজ আমি নিশ্চয়ই কোন না কোন জায়গা খুঁজে বার করবো, তুমি দেখো।'

'যেখানে তোমার বুকে মাথা রেখে রাত্তিরে আমি বেশ শান্তিতে একটু ঘুমতে পারবো।'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ।'

এবার পূবের আকাশ লালে লাল করে সূর্য উঠলো। চারদিকে লোকজন উঠতে শুরু করেছে। বাচ্ছারা কাঁদছে, কলতলায় লাইন দীর্ঘ পড়েছে। গ্রেবার দ্রুত জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিলো। 'আমি ঠিক সময়ে তোমার কারখানায় গিয়ে হাজির হবো, দেখো। যদি কোন কিছু হয় প্রথমে ফ্রাউ ভিট্রের বাগানে যাবে, না হলে এখানে।'

'ঠিক আছে।' এলিজাবেথ উঠে পড়লো। 'আজকের দিনটা কোন রকমে কাটাতে পারলে হয়।'

গ্রেবারের মন খারাপ হয়ে গেলো। 'আজ রাত্তিরে আমরা দুজনে অনেকক্ষণ জেগে গল্প করবো, এলিজাবেথ।'

'নিশ্চয়ই,' এলিজাবেথ ঘড়ি দেখলো। 'কিন্তু এর্নস্ট, তোমার জিনিস-পত্তর জমা দিতে সময় লাগবে, আমি বরং যাই।'

'যাও।'

এলিজাবেথ গ্রেবারের কপালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে, দ্রুত পায়ে চলে গেলো। ঠিক তখনই গ্রেবার শুনতে পেলো কে যেন খিলখিল করে হাসছে। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো। দেখলো থামের আড়ালে একটি তরুণী কচি বাচ্ছাটাকে তার হাতের তালুর ওপর দাঁড় করিয়ে নাচাচ্ছে, আর বাচ্ছাটা ছোট ছোট হাতে মার চুল ধরার চেষ্টা করছে। সেই দেখে তরুণী হাসছে। গ্রেবার কিংবা এলিজাবেথকে ও লক্ষ্যই করেনি।

'এই যে, ও ভাই, ও দাদা···এই যে···'

গ্রেবার এগিয়ে যাচ্ছিলো, কে যেন পেছন থেকে ডাকলো। ঘাড় ফেরাতেই দেখলো—কপালে দগদগে ঘা, খোঁড়া পা সেই লোকটা গ্রেবারকে লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো। লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ওর সামনে একটুকরো কাগজ পেতে দাঁড়ালো। 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

'তা না হয় করলেন। কিন্তু কি ব্যাপার ?'

'একটু কফি।'

'কফি !'

'তখন গন্ধ পেয়েছিলুম, খুব ভালো গন্ধ। বড্ড লোভ হচ্ছিলো। অনেক-দিন খাইনি। ভালো কফির স্বাদ কেমন তাই-ই ভুলে গেছি।'

গ্রেবার ওর স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকালো, মনে হলো চোখদুটো যেন কি আশ্চর্য চেনা। 'তখন বললেন না কেন, ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম ?'

পঙ্গু লোকটা ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'তখন বলতে পারিনি, পাছে আপনারা আমাকে ভিখিরি ভাবেন।'

গ্রেবার ঝোলা হাতড়ে কফির কৌটোটা বার করলো। 'এটা আপনি রেখে দিন।'

লোকটা সংকুচিত হলো, 'না না, আমাকে এই কাগজে সামান্য একটু দিন।'

'এতে সামান্যই আছে, তাছাড়া আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

এলিজাবেথদের ভাঙা বাড়ির নিচে ছোকরা দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। গ্রেবার প্রথমে খেয়ালই করেনি। দারোয়ানই ওকে দেখে হাত নেড়ে ডাকলো। 'আপনার একটা চিঠি আছে।'

গ্রেবার আকাশ থেকে পড়লো। 'আমার চিঠি !'

'হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর,' ছোকরা চোখ মিটমিট করে হাসলো। 'আর আপনার স্ত্রীর মানেই আপনার।'

গ্রেবার কিছু বললো না। খামটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখলো।

গেস্টাপো থেকে পাঠানো হয়েছে। ওপরে লেখা—ফ্রয়লাইন এলিজাবেথ ক্রুজে, নিচে ওর ঠিকানা। খামের মুখটা আঁটা থাকলেও, কেউ যে খুলেছে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেলো।

'কবে এসেছে ?'

'কাল সন্ধ্যেবেলায়।'

ওর চোখের দিকে তাকাতেই গ্রেবার বুঝতে পারলো চিঠিটা ও-ই খুলেছে। খামের মুখ ছিঁড়ে ও চিঠিটা বার করলো। সরকারী নির্দেশনামা, আজ সকাল এগারোটায় এলিজাবেথকে ওদের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। গ্রেবার ঘড়ি দেখলো। তখনও দশটা বাজেনি। চিঠিটা পকেটে রাখার সময় গ্রেবারের মনে হলো ওর হাতটা মৃদু কাঁপছে, বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছে। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে ছোকরা ওর মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি পড়ার চেষ্টা করছিলো। তাই গ্রেবার সহজ হবার ভান করলো। 'আর কিছু নেই ?'

'কেন, এইটেই কি যথেষ্ট নয় ?'

মনে মনে চমকে উঠলেও গ্রেবার হাসলো। 'আপনার জানাশোনা কোন ঘর আছে নাকি ?'

'ঘর ! ঘর কি হবে ?'

'আমার জন্যে নয়, আমার স্ত্রীর জন্যে।'

'ও।'

'যা ভাড়া লাগে, দেবো।'

'আচ্ছা, খোঁজ রাখবো।'

গ্রেবার আর দাঁড়ালো না। বুঝতে পারলো ছোকরা দারোয়ানের চোখদুটো এখনও ওর পেছনে অনুসরণ করছে। গ্রেবার দ্রুত পা চালালো। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে চিঠিটা ও আবার বের করলো। ছাপানো ফর্ম, যার থেকে ও কোন মর্মই উদ্ধার করতে পারলো না। এমনকি সইটাও ছাপানো। কেবল এলিজাবেথের নাম আর তারিখটা টাইপ করা। খুব সস্তা ধরনের গেরুয়া রঙের তুলট কাগজ। তবু হঠাৎ করেই মনে হলো ওর বুকের সমস্ত রক্ত যেন কাগজটা শুষে নিয়েছে। নাকের কাছে কাগজটা তুলে ধরতেই ও মৃত্যুর গন্ধ পেলো।

কাথেরীনেনকির্খের সামনে গ্রেবার দাঁড়িয়েছিলো। কখন ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে ও খেয়ালই করেনি। ঠিক পেছনেই কে যেন অস্পষ্ট স্বরে ওর নাম ধরে ডাকলো, 'এর্নস্ট—'

চট করে ঘুরে দাঁড়াতেই ও জোসেফকে দেখতে পেলো। সৈনিকের লম্বা কালো একটা ওভারকোট পরেছে। গলার স্বরের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে

গ্রেবার ওকে চিনতেই পারতো না। জোসেফ কিন্তু কোন কথা না বলে সোজা গির্জার মধ্যে প্রবেশ করলো। গ্রেবার ডাইনে বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে নিলো। না, কেউ ওদের লক্ষ্য করেনি। মিনিটখানেক পরে গ্রেবার ওকে অনুসরণ করলো। দেখলো সংরক্ষিত আসনের মধ্যে দিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে ও বেদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জোসেফের দেখাদেখি গ্রেবারও ওর পাশে নতজানু হয়ে বসলো। জোসেফ ফিসফিস করে বললো, 'পোলমান ধরা পড়েছেন।'

'কি বললেন !'

'পোলমান আজ ভোরে গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়েছেন।'

এই মুহূর্তে গ্রেবার বুঝতে পারলো না পোলমানের গ্রেপ্তারের সঙ্গে এলিজাবেথের চিঠির কোন সম্পর্ক আছে কিনা। স্থির চোখে ও জোসেফের দিকে তাকালো। 'তাহলে পোলমানও ধরা পড়লেন !'

জোসেফ চকিতে মুখ ফেরালো। 'কেন, আপনি কি আর অন্য কারুর কথা ভেবেছিলেন নাকি ?'

'গেস্টাপো থেকে আমার স্ত্রীর নামে একটা নির্দেশ এসেছে।'

'তারপর ?'

'আজ এগারোটায় ওদের সঙ্গে দেখা করার কথা বলা হয়েছে।'

'ওটা আপনার কাছে আছে ?'

'হ্যাঁ।' গ্রেবার চিঠিটা জোসেফের হাতে দিলো। 'পোলমান কি করে ধরা পড়লেন ?'

'ঠিক জানি না। আমি তখন ওখানে ছিলাম না। ফিরে আসার সময় দেখলাম পাথরটা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। সম্ভবত ওঁকে নিয়ে যাবার সময় পা দিয়ে উনি পাথরটা ঠেলে দিয়েছিলেন। ওটা আমাদের গোপন সংকেত। ঘণ্টাখানেক পরে দেখলাম ওঁর বইপত্তর সব ভ্যানে তোলা হচ্ছে।'

'ওঁকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে এমন কিছু কি ওখানে ছিলো ?'

'না, আমার তা মনে হয় না। বিপজ্জনক যা-কিছু সবই আগে থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো। এমন কি টিনের খাবারগুলো পর্যন্ত।'

গ্রেবার জোসেফের হাতে ধরা কাগজটার দিকে তাকালো। 'আমি তো ভেবেছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করবো এ সম্পর্কে কি করা উচিত না উচিত।'

'ঠিক সেই জন্যেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে এসেছিলাম।

নিশ্চয়ই ওঁর ঘরে কিংবা ঘরের আশেপাশে গেস্টাপোর গুপ্তচর এখন সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।' জোসেফ চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিঠিটা গ্রেবারকে ফিরিয়ে দিলো। 'এখন কি করবেন, কিছু ঠিক করেছেন ?'

'এই তো সবে পেলাম, কি করবো এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি হলে কি করতেন ?'

'পালাতাম।' জোসেফ নির্দ্বিধায় জবাব দিলো।

আধো-অন্ধকারে প্রোজ্জ্বলিত মোমবাতিটার দিকে গ্রেবার স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'ভাবছি নিজে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করবো ওরা কি চায়।'

'ব্যাপারটা যদি আপনার স্ত্রীর সম্পর্কে হয় তাহলে ওরা কিন্তু আপনাকে কিচ্ছু বলবে না।'

'এলিজাবেথকে ওরা যদি গ্রেপ্তার করতে চাইতো, পোলমানের মতো অনেক আগেই ওরা ওকে গ্রেপ্তার করতে পারতো। আমার মনে হয় হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তাই আমি আগে নিজে গিয়ে দেখতে চাই। এক্ষেত্রে পালানোটা কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'আপনার স্ত্রী কি ইহুদি ?'

'না।'

'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। ইহুদি হলে তার নিশ্চয়ই পালানো উচিত। আচ্ছা, আপনার স্ত্রীকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া যায় না ?'

'না। বাধ্য-শ্রমিক হিসেবে ও এখন সামরিক পোশাক-বিভাগে কাজ করছে।'

'বাঃ, একদিক থেকে এটা কিন্তু ভালো খবর। সম্ভবত ওরা ওঁকে গ্রেপ্তার করবে না। আপনি ঠিকই বলেছেন, ওরা যদি চাইতো সরাসরিই ওঁকে গ্রেপ্তার করতে পারতো। আচ্ছা, আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারছেন —কেন ওরা ওঁকে ডেকেছেন ?'

'ওর বাবা এখন বন্দীশিবিরে রয়েছেন। ওঁকে গ্রেপ্তার করার আগে থেকেই একজন মহিলা, গেস্টাপোর গুপ্তচর, ওদের বাড়িতে থাকতো। আমাদের বিয়ে সম্পর্কিত ব্যাপারে ও হয়তো কোন খবর দিয়ে থাকতে পারে।'

'অসম্ভব নয়। তাহলে বরং আপনি নিজেই যান।'

'আমি গিয়ে বলবো চিঠিটা আমি আজই সকালে পেয়েছি এবং কারখানায় ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

'সেই ভালো। চোখ কান খোলা রেখে সমস্ত ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা

করবেন। আমার মনে হয় না ওরা আপনার ওপর কোন রকম প্রতিশোধ নিতে চাইবে। যদি আপনার স্ত্রীকে কখনও লুকিয়ে রাখার দরকার হয়, আমি আপনাকে একটা ঠিকানা দেবো। তার আগে একবার ঘুরে আসুন। বিকেলে আমি এখানেই থাকবো···' জোসেফ ইতস্তত করলো। 'প্যাস্টর বীডেনডিকের স্বীকারোক্তি-মঞ্চের সামনে ওই যে 'অনুপস্থিত' বোর্ডটা ঝুলছে, বিকেলে এইখানেই আমার দেখা পাবেন।'

গির্জার আধো-অন্ধকার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই বাইরের চড়া আলোয় গ্রেবারের চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। চোখের ওপর হাত রেখে সূর্যকে আড়াল করে ও ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। হঠাৎ ওর চারপাশের সবকিছু মনে হলো কেমন যেন অচেনা আর অনেক দূরের। বাচ্চার হাত ধরে হাঁটা তরুণীটিকে দেখে ওর হিংসে হলো। দুপুর রোদে বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজ-পড়া বৃদ্ধকে দেখে মনে হলো উনি যেন আদিম কোন পৃথিবীর মানুষ, যে পৃথিবী এইমাত্র ওর চোখের সামনে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো। সবাই যেন ওর থেকে বিচ্ছিন্ন আর নিরুদ্বিগ্ন—কেবল ওরই চারপাশে ঘিরে রয়েছে ভয়ের গাঢ় একটা কালো ছায়া।

গেস্টাপো-ভবনে গিয়ে গ্রেবার চিঠিটা দেখালো। একজন এস এস ওকে বারান্দা ঘুরে সিঁড়ির নিচের ঘরটায় যেতে বললো। ভেতরে তিনজন এস এস পড়ে পড়ে গেঁজাচ্ছে। একজন বাগানের দিকের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে পিয়ানোর তাল ঠুকছে। দুজন চেয়ারে পায়রার মতো মুখোমুখি বসে খোসগল্প করছে। গ্রেবারকে দেখেও ওরা যেন দেখলো না। গ্রেবার চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ চশমা-চোখে একজন এস এস অফিসারকে প্রবেশ করতে দেখে তিনজনই উঠে দাঁড়ালো। গ্রেবার ছিলো দরজার কাছে। ওকে দেখে উনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে আপনি কি করছেন? সৈনিকদের সাধারণত সামরিক আদালতেই তলব করা হয়।'

গ্রেবার কোন কথা না বলে চিঠিটা দেখালো। উনি পড়ে দেখলেন। 'এটা আপনার নয়, ফ্রয়লাইন ক্রুজের।'

'উনি আমার স্ত্রী। কয়েকদিন আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। সামরিক পোশাক-বিভাগে উনি এখন কাজ করছেন। তাই ভাবলাম ওঁর হয়ে একবার দেখা করে আসি।'

গ্রেবার বিয়ের সার্টিফিকেটটা ওঁর হাতে দিলো। উনি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। কাগজ থেকে চোখ তুলে গ্রেবারের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর সার্টিফিকেটটা গ্রেবারকে ফিরিয়ে দিলেন। 'ঠিক আছে। মাটির নিচের বাহাত্তর নম্বর ঘরে চলে যান।'

গ্রেবার মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। ও জানে গেস্টাপোর মাটির নিচের ঘরগুলো একটা কুখ্যাত জায়গা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেলো, মনে হলো কবরের অতল অন্ধকারে ও যেন স্বেচ্ছায় পা বাড়াচ্ছে।

বাহাত্তর নম্বর একটা বড় হলঘর। সারা ঘর যেন ফাইল দিয়ে ঘেরা। মাঝেমাঝে কাঠের দেওয়াল তুলে আড়াল করা। একজন তরুণ এস এস অফিসার গ্রেবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গ্রেবার সমস্ত ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বললো। অফিসার কাগজপত্তর পরীক্ষা করে দেখলো। 'আপনি আপনার স্ত্রীর হয়ে সই করতে পারবেন?'

'পারবো।'

অফিসার দুটো ফর্ম টেবিলের ওপর রাখলো। 'এখানে সই করুন। সইয়ের নিচে লিখবেন এলিজাবেথ ক্রুজের স্বামী। বিয়ের তারিখ এবং রেজিস্ট্রি অফিসের ঠিকানা দেবেন। দ্বিতীয় ফর্মটা আপনি নিজের কাছে রাখতে পারেন।'

গ্রেবার খুব ধীরে ধীরে সই করলো। ওর মনে হলো সই করার আগে ফর্মটা পড়ে দেখা দরকার। ইতিমধ্যে অফিসার ওদিকের দেওয়ালে দেরাজ হাঁটকে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করছিলো। এবার চিৎকার করে উঠলো, 'হল্টমান, আবার তুমি সব পিণ্ডি পাকিয়ে রেখেছো। ক্রুজের প্যাকেটটা কোথায়?'

পাশের খোপ থেকে কে একজন মিনমিনে গলায় কি যেন বললো। গ্রেবার দেখলো ফর্মটা নিরাপত্তা আইনে আটক বের্নহার্ট ক্রুজের ভস্মের প্রাপ্তি-স্বীকার। দ্বিতীয়টা ডাক্তারী সমীক্ষা—বের্নহার্ট ক্রুজে হৃদ্‌রোগে মারা গেছেন।

কাঠের আড়ালের ওপার থেকে তরুণ ফিরে এলো। 'এটা ভস্ম।' কাগজের মোড়ক এবং কারুকার্য-করা চন্দন কাঠের সুন্দর একটা সিগারেট কেস ও রাখলো টেবিলের ওপর। 'আপনি সৈনিক, নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না—প্রয়োজনবোধেই আমরা বের্নহার্ট ক্রুজের মৃত্যু-সংক্রান্ত কোন তথ্য আগে প্রকাশ করতে পারিনি।'

গ্রেবার ম্লান চোখে তরুণ অফিসারের দিকে তাকালো। কোন কথা বললো না।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে ও ভাবলো এখনই এলিজাবেথকে কিছু জানানোটা ঠিক হবে না, পরে কখনও সুযোগ হলে বরং ওকে বুঝিয়ে বলবে। নইলে ও ঠিক ভাববে ডাক্তার ক্রুজেকে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে, এবং সেটা আদৌ বিচিত্র কিছু নয়।

মন্থর পায়ে গ্রেবার কাথেরীনেনকির্খের দিকে ফিরে চললো। রাস্তাটাকে এখন আর নিস্প্রাণ মনে হচ্ছে না। অথচ কোথায় যেন একটা মৃত্যু ঘটে গেছে—অচেনা অজানা একটা ব্যক্তিত্বের নিঃশব্দ মৃত্যু। আশৈশব ডাক্তার ক্রুজেকে দেখে এলেও, ওঁর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কোনকালেই ছিলো না। তবু এই মুহূর্তে ও যেন ওঁর জন্যে ব্যথিত না হয়ে পারলো না।

পকেটে ও চন্দন কাঠের ভারি সিগারেট কেসটা অনুভব করলো। সিগারেট কেসটা ডাক্তার ক্রুজের হলেও, ভস্মটা ওর নাও হতে পারে। হয়তো গ্যাস চেম্বারে অনেককে একসঙ্গে দহন করার পর কিছুটা ভস্ম অনেকগুলো মোড়কে আলাদা আলাদা রাখা হয়েছিলো, এটা তার যে-কোন একটা হতে পারে। যদি তা নাও হয়, হল্টমানও ভুল করতে পারে। একটা জিনিস গ্রেবার কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলো না, ভস্মটা ওদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো কেন? ওর মনে হলো এ একধরনের ক্রূর প্রতিহিংসা, আদিম বর্বরতার নির্লজ্জ উল্লাস। ও ভেবেই পেলো না ভস্মটা নিয়ে কি করবে। ইচ্ছে করলে যে-কোন ভগ্নস্তূপে ফেলে দিতে পারে, কিংবা সমাধিস্থ করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তার জন্যে অনুমতির দরকার এবং এলিজাবেথ হয়তো জানতে পারবে।

ভাবতে ভাবতে কখন গির্জার মধ্যে প্রবেশ করেছে ও খেয়ালই করেনি। প্যাস্টর বীডেনডিকের স্বীকারোক্তি-বেদীর সামনে এসে দেখলো 'অনুপস্থিত' বোর্ডটা নেই। সবুজ পর্দাটা একপাশ থেকে সরিয়ে ও ভেতরে মুখ বাড়ালো, দেখলো নেকড়ের মতো জুলজুল চোখে জোসেফ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমন সতর্ক ভঙ্গিতে ও বসেছিলো যেন যে-কোন মুহূর্তে গ্রেবারের পেটে মোক্ষম লাথি কষিয়ে ও অনায়াসে ছুটে পালাতে পারে। জোসেফ নীরব চোখে ওকে অভ্যর্থনা জানালো। গ্রেবার পায়ে পায়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

'কি খবর ?' জোসেফ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো।

গ্রেবার সিগারেট কেস এবং ভস্মের মোড়কটা দেখালো। 'ডাক্তার ক্রুজের।'

'কি আছে এতে ?'

'ভস্ম।'

'আর কিছু ?'

'না।'

একটু নীরবতার পর গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'পোলমানের আর কোন খবর পেয়েছেন ?'

'না।'

'এ দুটো নিয়ে কি করি বলুন তো ?'

'পুঁতে দিন।'

'কোথায় ? বাগানে ?'

'বাগানেই ভালো। তাছাড়া ওটা প্রকৃতই কবরখানা।'

গ্রেবার বিহ্বল চোখে দাঁড়িয়ে রইলো। সহসা ওর মনে পড়লো ফ্রান্সে দেখা—স্মরণীয় যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, সেই বিখ্যাত বিজয়-তোরণের নিচে সারি সারি অজানা সৈনিকদের কবরগুলোর কথা। লাল ছিট-দেওয়া সূর্যস্নাত সোনালী প্রজাপতিগুলো কেমন তার চারপাশে মাতাল হয়ে ডানা মেলে উড়তো। সে-স্মৃতি মনে পড়লেই কেন জানি ওর চোখের দৃষ্টি বরাবরই ঝাপসা হয়ে যেতো, আর অশ্রুত ব্যথায় বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠতো।

জোসেফ অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো ওর কাঁধে চাপ দিলো। 'দেরি করবেন না। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে অলিন্দে এসে দাঁড়ালো। জোসেফ বললো, 'আপনি যান, আমি সামনের রাস্তাটায় একবার চোখ বুলিয়ে আসি।'

'আজ আমরা কোথায় ঘুমবো, এর্নস্ট ?' এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করলো। 'গির্জায় ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'সে তুমি ভাবতেই পারবে না।' গ্রেবার মুচকি মুচকি হাসলো। এলিজাবেথ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। 'আজ আমি ফ্রাউ

ভিট্টের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দোতলায় ওঁর একটা বাড়তি ঘর আছে। ঘরটা আমি দেখেছি এবং আমার খুব পছন্দ হয়েছে। জিনিসপত্তরও সব নিয়ে গেছি।'

এলিজাবেথ চলকে উঠলো। 'সত্যি বলছো ?'

'সত্যি। আমি চলে যাবার পরেও তুমি ওখানে থাকতে পারবে। তোমার ছুটির সব ঠিক আছে তো ?'

'হ্যাঁ, এর্নস্ট। কাল থেকে তিনদিন আর আমি কারখানায় যাবো না।'

'তাহলে আজই আমাদের সত্যিকারের প্রথম মধুযামিনী বলো ? আজ আমরা সারারাত জেগে অনেক অনেক গল্প করবো।'

'হ্যাঁ, তারারা ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা দুজনে বেশ বাগানের খোলা হাওয়ায় বসে থাকবো। কিন্তু এর্নস্ট, তার আগে আমাকে যে একটা টুপি কিনতে হবে।'

'টুপি! টুপি কি হবে ?' গ্রেবার রীতিমতো অবাক হলো।

'আজকের দিনে দরকার হয় না বুঝি ?'

'দরকার হয় বলতে ? রাত্রে বাগানে বসে থাকবে বলে তুমি কি পরতে চাও ?'

এলিজাবেথ দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে হাসলো। 'সেজন্যেও হতে পারে। তবে তার চেয়ে বড় কথা—কিনতে হবে। টুপিটাকে তুমি একটা প্রতীক হিসাবে ধরতে পারো, যেমন ধরো—যখন তুমি সুখী তখন কিনতে পারো, যখন তুমি সুখী নও তখনও কিনতে পারো। বুঝতে পারলে না ?'

'কিচ্ছু বুঝলাম না। তবে তুমি যেভাবে বলছো আমারই একটা কিনতে ইচ্ছে করছে।'

এলিজাবেথ ধমক দিলো, 'তোমার কোন দরকার নেই।'

গ্রেবার হাসলো। 'বেশ, কিন্তু এখানে টুপির দোকান কোথায় আমি তো তাই-ই জানি না।'

'আমি জানি।'

'তোমার কাপড়ের কুপন আছে ?'

'আছে। তোমাকে ওসব কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

সামনের কাচের জানলার অর্ধেকটা ভেঙে গেছে, বাকি অর্ধেকটা তখনও অক্ষত রয়েছে। শোকেসে মাত্র দুটো টুপি রাখা রয়েছে। একটা কৃত্রিম সোলার ফুলওয়ালা, অন্যটায় সাদা পালক লাগানো। দুটোর কোনটাই এলিজাবেথকে মানাবে না।

দোকানি-ভদ্রমহিলা ওদের দেখে স্মিত হাসিতে অভ্যর্থনা জানালো এবং এলিজাবেথকে নিয়ে কাউন্টারের ওপাশে চলে গেলো। গ্রেবার দেখলো ভেতরে ছোট ঘুপরি মতো একটা ঘর। ঘরটা এখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। দুজনে হেসে হেসে নিচু গলায় কি যেন বলছে, গ্রেবার এত দূর থেকে ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারলো না। তরুণী দেওয়াল-আলমারির তাক থেকে একগাদা টুপি নামিয়ে আনলো। লাল নীল হলুদ সাদা রঙের নানান ধরনের টুপি। আর এলিজাবেথ তার থেকে বেছে বেছে মাথায় দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরেফিরে নিজেকে দেখছে। ওকে দেখে গ্রেবারের মনে হলো রুপোলী পর্দায় দেখা ছায়াছবির কোন নায়িকার মতো। মগ্ন তন্ময়তায় এখন ওকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে, আর ওদের দুজনের কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে দূর থেকে আসা ঝরনার গভীর কলোচ্ছ্বাসের মতন।

একটু পরে এলিজাবেথ ফিরে এলো। 'না, একটাও টুপি আমার পছন্দ হলো না।'

গ্রেবার চমকে উঠলো। একটা সম্ভাবনার কথা ওর মাথায় বিদ্যুৎ-চমকের মতো দ্রুত খেলে গেলো। কিন্তু এলিজাবেথকে ও ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে দিলো না বা এ-সম্পর্কে ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

চব্বিশ

জানলার ফ্রেমে বাঁধানো নক্ষত্রখচিত একটুকরো আকাশ। বুনো আঙুরের লতা ঝুলছে। নিঃশব্দ দোলকের মতো মৃদুল হাওয়ায় দুলছে আঙুরের গুচ্ছ-গুলো।

'সত্যিই আমি কাঁদছি না এর্নস্ট, তুমি বিশ্বাস করো। আর যদি কাঁদিও তার জন্যে তুমি কষ্ট পেয়ো না। আমি নই, আমার বুকের ভেতর থেকে কি যেন একটা আকুল হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কি যেন একটা গুমরে গুমরে উঠছে—সে শুধু তোমার জন্যে, এর্নস্ট। এ আমার দুঃখ নয়, আমি সুখী...'

গ্রেবারের চওড়া বুকে মাথা রেখে এলিজাবেথ কুমিরের মতো চুপটি করে পড়েছিলো। দু'প্রান্তে কারুকার্য-করা অনেকদিনের পুরনো আখরোট কাঠের উঁচু খাট, চওড়া বিছনা। পুরনো আমলের ড্রেসিং টেবিলটা রয়েছে ঘরের

এক কোণে। জানলার ঠিক সামনে টেবিল আর দুটো চেয়ার পাতা। উলটো দিকের দেওয়ালে টাঙানো আয়না, জ্যোৎস্নার মৃদু আলোছায়া কাঁপছে তার বুকে।

'আমি সুখী, এর্নস্ট। গত কয়েক সপ্তা হাজার চেষ্টা করেও আমি নিজেকে শান্ত করতে পারিনি···তুমি বিশ্বাস করো, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। শুধু আজকেই যা একটু শান্তি পেলাম।'

'আমার মনে হয় শহর থেকে দূরে গ্রামের দিকে কোথাও তোমাকে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'তুমি চলে যাবার পর আমার কাছে গ্রাম কিংবা শহর দুই-ই সমান, এর্নস্ট।'

'গ্রামগুলো কিন্তু এখনও অক্ষত।'

'আগে কিংবা পরে এখানেও একদিন বোমাবর্ষণ থেমে যাবে। যদিও অস্তিত্ব বলতে এখন এ শহরের আর কিছুই বাকি নেই, তবু যতদিন আমি কারখানায় কাজ করতে বাধ্য, ততদিন আমার অন্য কোথাও যাওয়া হবে না, এর্নস্ট। আর আপাতত আমি ও-কথা ভাবছিও না। নিরিবিলি সুন্দর এই ঘরটা পেয়েই আমি সুখী। তুমি চলে যাবার পরেও আমি শান্তিতে এখানে কাটিয়ে দিতে পারবো, তুমি কিন্তু বেশি কিছু ভেবো না।'

'ভাবতে আমরা বাধ্য হই, এলিজাবেথ। তোমার আমার সবার জন্যেই আমরা ভাবি।' একটু নীরবতার পর এলিজাবেথের নরম চুলে হাত বোলাতে বোলাতে গ্রেবার বললো, 'তাছাড়া সুখ পারস্পরিক, কোথাও এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না।'

'সত্যি, অবাক লাগে যখন ভাবি—দশ বছর বন্য জীবনযাপনের পরেও আমাদের জীবনে এই সুখ কি ক্ষণস্থায়ী, কি আশ্চর্য ভঙ্গুর!'

এলিজাবেথের বুকের ভিতরের নিঃশব্দ হাহাকার গ্রেবার এবার যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো। তারও অনুরণিত ভাবনা যেন মিশে একাকার হয়ে গেলো ওর গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে। 'দুঃখ কোরো না, এলিজাবেথ, যেহেতু আমরা মানুষ, যেহেতু আমরা পশুর মতো নির্লিপ্ত-সুখ চাই না, তাই আমরা বুকের মধ্যে এমন কষ্ট পাই। আর এর জন্যে দায়ী এই কলুষিত সমাজ, ক্ষমাহীন লোভ আর যুদ্ধলিপ্সা।' একটু নিস্তব্ধতার পর গ্রেবার বললো, 'যেমন করেই হোক এই কদর্য নগ্নতা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবেই।'

'হ্যাঁ, এর্নস্ট, আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। ভেবেছি শুরু থেকে আবার নতুন করে শুরু করবো।'

নিবিড় আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে গ্রেবার ওর কপালে চুমু দিলো। 'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে!'

একই ভাবে দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইলো। আধো-আলো আধো-ছায়ায় গ্রেবার অপলক চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। এলিজাবেথ মুখ তুলতেই দেখতে পেলো ওর নির্নিমেষ চোখের মণিদুটো। 'এই, ঘুমবে না?'

'কি হবে ঘুমিয়ে? এই তো বেশ ভালো লাগছে।'

'কিন্তু কাল ঘুমবার আদৌ কোন সুযোগ পাবে কিনা কেউ বলতে পারে না।'

'না পেলেও কিছু এসে যাবে না, ফেরার পথে পুরো দুটো দিন আমি ট্রেনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারবো।'

'হয়তো পারবে, কিন্তু বিছনায় তো আর শুতে পারবে না।'

'তা ঠিক। পরশু থেকে আবার আমার মাথার নিচে থাকবে প্রান্তরের সবুজ ঘাস আর ওপরে নীলিম আকাশ।'

এলিজাবেথ বাচ্ছাদের মতো ঠোঁট ফোলালো। 'খুব মজা, না?'

'মজা না হলেও, গ্রীষ্মকালে কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগে না। রাশিয়ায় শীতকাল সত্যিই অসহ্য।'

'বলা যায় না, আর একটা শীত হয়তো তোমাকে ওখানে কাটাতে হতে পারে।'

গ্রেবার হাসলো। 'যে হারে আমরা পিছু হটছি, শীতের আগেই আমরা পোলাণ্ড কিংবা জার্মানিতে এসে পৌঁছবো। তখন যদি খুব ঠাণ্ডা লাগে, তুমি তো রয়েছো।'

যে কথাটা এতক্ষণ বলিবলি করেও এলিজাবেথ বলতে পারলো না, তুমি আবার কবে সীমান্ত থেকে ফিরবে এর্নস্ট—এই একটা তিক্ত অনুভূতি, দগদগে গভীর ক্ষতের চেয়ে আরও নগ্ন হয়ে দুজনের মাঝখানে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলো। আর এই মুহূর্তের নিটোল নিস্তব্ধতা মনে হলো করুণ আর্তনাদের চেয়েও নির্মম। গ্রেবারের মনে হলো জানলায় ঝোলানো আঙুরলতা, আয়নায় ঢেউ-খেলানো রুপোলী জ্যোৎস্নার ওপারে কোথায় যেন একটা অজানা রহস্য ওৎ পেতে রয়েছে, আর ঠিক তখনই শোনা গেলো আঁতকে-ওঠা বিমান-আক্রমণের কর্কশ সংকেত-ধ্বনি।

'আমরা বরং এখানেই থাকি। এখন আমার আর জামা-কাপড় পরে চোরাকুঠরিতে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আমারও না।'

গ্রেবার উঠে পড়লো। টেবিল সরিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকালো। নিথর নিস্পন্দ রাত। সারা বাগান প্লাবিত জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে। এমন রাতই বিমান-আক্রমণের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। ও দেখলো দরজা খুলে ফ্রাউ ভিট্টে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুখ-চোখ ওঁর শুকিয়ে গেছে।

নিচে থেকেই উনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি সবে আপনাদের জাগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। আমাদের চোরাকুঠরিটা লিয়েরনিজষ্ট্রাসে...'

উনি আর দাঁড়ালেন না, কথাটা বলেই ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। গ্রেবার খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো। কিন্তু উনি আর বাইরে বেরুলেন না। তাহলে উনিও এখানে থাকছেন। গ্রেবার অবাক হলো না। ওর মনে হলো এই-ই ভালো। উনি যখন এখানে রয়েছেন, এই বাড়ি এই বাগান যা-কিছু সব যেন কোন মায়াস্পর্শে টিঁকে থাকবে, যেন বাইরের তুমুল রলোরোল, এই উন্মত্ততা ওদের কাউকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারবে না। বাগানের ওপারে রুপোলী জ্যোৎস্নায় গাছেরা নিস্পন্দ। লাইলাকের ঝোপ, এমনকি জানলার আঙুরগুচ্ছগুলো এখন আর দুলছে না। ওর মনে হলো ধ্বংসের ঝড় এই শান্ত মরূদ্যান পর্যন্ত যেন কিছুতেই ধেয়ে আসতে পারবে না।

গ্রেবার ফিরে এলো। এলিজাবেথ ততক্ষণে উঠে বসেছে বিছনায়। কোমল জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ওর মসৃণ দু কাঁধে, পিঠের খাঁজ বেয়ে ঢালু হয়ে নেমে গেছে হালকা একটা ছায়া। পীনোন্নত সুডৌল স্তনদুটো এখন আরও বড় আরও নিটোল মনে হচ্ছে। রঙহীন স্বচ্ছ চোখ, ঘন আঁখি-পল্লবের নিচে গাঢ় ছায়া। এই মুহূর্তে ওকে মনে হচ্ছে সুদূর-থেকে-আসা অপরিচিত কেউ, যেন প্লাবিত জ্যোৎস্নায় ভেসে-যাওয়া বাইরের বাগানটারই মতো রহস্যময়, আশ্চর্য থমথমে।

'ফ্রাউ ভিট্টেও এখানে থাকছেন।'

'তুমি এখানে এসো, এর্নস্ট।'

বিছনার দিকে আসার সময় রুপোলী আয়নায় দেখলো ওর বিবর্ণ মুখরেখা। চিনতে পারলো না। মুখটা যেন অন্য কারুর। গ্রেবার অবাক হয়ে গেলো।

'কই, এসো।'

কাছে আসতেই এলিজাবেথ ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু হাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো ওর গলা। 'তুমি কাছে থাকলে আমার আর ভয় করবে না, এর্নস্ট।'

'কিচ্ছু হবে না এলিজাবেথ, তুমি দেখো।' যদিও জানে না কেন, তবু গ্রেবারের মনে হলো এই বাগান, প্লাবিত জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ মাধুরিমা, আলোকিত মুকুর, এলিজাবেথের মসৃণ চওড়া কাঁধ আর সীমাহীন এই নৈশ নিস্তব্ধতা—সব সব যেন কানায় কানায় ওকে ভরিয়ে তুলেছে। 'তুমি দেখো, কিচ্ছু হবে না।'

এলিজাবেথ বিছনা থেকে বালিশ, পরিত্যক্ত অন্তর্বাসগুলো টান মেরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে। তারপর সম্পূর্ণ নগ্ন টান-টান হয়ে শুলো। কোমরের নিচে জঘন থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে দীঘল দুটি পা। কাঁধের দু পাশ থেকে কটিতট পর্যন্ত সরু হয়ে এসেছে অনন্য একটি দেহরেখা, তারপর হঠাৎ যেন থমকে গেছে নাভিদেশে। নিটোল মসৃণ দু উরুসন্ধির মাঝে গাঢ় একটুকরো অন্ধকার। তরুণীর নয়, এই দেহ এখন যেন কোন পরিণত মানবীর।

বলিষ্ঠ বাহুনিষ্পেষণের মধ্যে গ্রেবার অনুভব করলো ওর নরম শরীর। ও যেন গ্রেবারের আড়ালে নিজেকে লুকতে চাইছে, যেন সহস্র হাতে গ্রেবারকে টেনে নামাতে চাইছে মাটির নিচে। এখন দুজনের মাঝে আর কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, সবকিছু যেন তন্ময় একাকার মিশে গেছে। যদিও প্রথম দিনের মতো বুকের মধ্যে আর তুমুল রলোরোল নেই, তবু ধীরে ধীরে ওরা যেন প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে যা-কিছু শব্দ, প্রতিটি সীমান্ত, সারাটা দিগন্তরেখা, আর তারও ওপারে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ···

গ্রেবার মাথা তুললো, যেন সুদূর থেকে একটু একটু করে ও ফিরে এলো নিজের সত্তায়। ও কান পেতে রইলো। দুটি সময়ের মাঝে দূরত্ব ও কিছু অনুমান করতে পারলো না। বাইরে সবকিছু নিস্তব্ধ নিথর। ও ভুল করেনি তো? আবার কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছু শুনতে পেলো না—না বিমানের গর্জন, না বিস্ফোরণ, না বিমান-বিধ্বংসী কামানের কোন আওয়াজ। চোখ বন্ধ করে ও আবার ঘুমবার চেষ্টা করলো। হঠাৎ মনে হলো এলিজাবেথ যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

গ্রেবার মুখ তুললো। 'ওরা আসেনি, এলিজাবেথ।'

'ওরা এসেছিলো।' ঘুম-জড়ানো অস্পষ্ট স্বরে এলিজাবেথ ফিসফিস করে বললো, 'আমি জানি ওরা এসেছিলো।'

দুজনে নিশ্চল পাশাপাশি শুয়ে রইলো। গ্রেবার মাথা ঘুরিয়ে দেখলো মেঝেতে ছড়ানো বালিশ জামা কাপড়, দেওয়ালে ধূসর আয়না আর এপারে খোলা জানলা। ওর মনে হলো এই রাত্রি বুঝি আর শেষ হবে না, তবু অনুভব করলো রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন কানায় কানায় ভরে রয়েছে। বাতাসে আঙুরগুচ্ছগুলো দুলছে আর ওদের ছায়াময় ভাবনাগুলো যেন আয়নায় ঘুরছে। গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে পাশ ফিরলো। দেখলো সমুদ্র-ঝিনুকের মতো ওর বন্ধ চোখের পাতা, ঠোঁট দুটো ঈষৎ উন্মুক্ত আর গভীর স্পন্দনে উঠছে নামছে ওর নগ্ন বুক। ও একই ভাবে চুপচাপ শুয়ে ছিলো, কোথাও একচুলও নড়েনি। অন্য মেয়েদের মতো এলিজাবেথ কখনও আলুথালু হয়ে ঘুময় না। ওর শোয়া ভারি সুন্দর। শান্ত স্থির শুয়ে ও গভীর ঘুমিয়ে পড়ে। আর সারাদিনের ক্লান্তির পর ওকে তখন আশ্চর্য সুন্দর দেখায়।

এলিজাবেথ চোখ মেললো। 'এই, বিমানগুলোর কি হলো জানো?'

'জানি না, এলিজাবেথ।'

কাঁধের ওপর থেকে চুলগুলো ও ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিলো। 'আমার কিন্তু বড্ড খিদে পাচ্ছে।'

'আমারও। দাঁড়াও আনছি।'

গ্রেবার উঠে পড়লো। বিনডিং-এর বাড়ি থেকে আনা টিনের খাবারগুলো ও রাখলো টেবিলের ওপর। আরকে জরানো বাছুর আর খরগোশের মাংস। নানা ধরনের ফলের রস। আনারস আর খরগোশের মাংসের টিন-দুটো ও কেটে ফেললো।

'আমি কিন্তু উঠছি না।'

'তোমাকে উঠতে হবেও না।'

গ্রেবার মুচকি হেসে ওর দিকে তাকালো। দেখলো চোখদুটো দুষ্টুমিতে ভরা। তবু হঠাৎ-ব্যস্ত-হয়ে-ওঠা গিন্নির চাইতে, ওকে ওইভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকতে দেখে গ্রেবারের ভালো লাগলো। টিনের খাবার, জলের পাত্রটা নিয়ে ও আবার বিছনায় ফিরে এলো।

'যখনই এগুলোর দিকে তাকাই, আলফনসের কথা মনে পড়ে যায়। সত্যি ওর সঙ্গে আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি।'

'ও-ও অনেকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলো। ব্যাস, শোধবোধ হয়ে গেলো। শবানুগমনের সময় তুমি গিয়েছিলে নাকি ?'

'না।'

ফ্রাউ ভিট্রের কাছ থেকে পাওয়া দুটো চীনামাটির পাত্রে গ্রেবার টিনের মাংসটা ঢেলে নিলো। মদের একটা বোতল খুলে রাখলো বিছনার পাশের ছোট টেবিলটায়। তারপর দু টুকরো রুটি কেটে নিলো।

এলিজাবেথ এবার বিছনায় উঠে বসলো। সম্পূর্ণ আনগ্না। গ্রেবার মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকালো। এলিজাবেথ ওর গ্লাসটা চাঁদের আলোয় তুলে ধরলো। ঝিলিমিলি জ্যোৎস্নায় টলটল করে উঠলো স্বুবর্ণ মদিরা। এক চুমুকে গ্লাসটা ও নিঃশেষ করে ফেললো। 'জ্যোৎস্নায় সবকিছু কেমন যেন অন্যরকম দেখায়, তাই না ?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ,' গ্রেবার গ্লাসদুটো আবার ভর্তি করলো। 'জ্যোৎস্না রাতে তোমাকে মনেই হয় না তুমি সামরিক পোশাক তৈরি কারখানায় কাজ করো।' এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে গ্রেবার দুষ্টুমি করে হাসলো। 'এখন নিশ্চয়ই আমাকে আর সৈনিকের মতো দেখাচ্ছে না ?'

'না এর্নস্ট, একটুও না। বরং তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক তরুণ প্রেমিকের মতন। কেন এরকম মনে হয় বলো তো ?'

'যেহেতু যখন চাঁদ ওঠে আর প্লাবিত জ্যোৎস্নায় সবকিছু ভেসে যায়, তখন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আমরা নিজেদের ধরে রখতে চাই না বলে।'

'তখন আমরা পরস্পরকে নিবিড় করে ভালবাসতে চাই, তাই না এর্নস্ট ?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ।'

দুজনে নিঃশব্দে খেলো, পান করলো। জানলা দিয়ে দেখা গেলো নিঃসঙ্গ আকাশে ঝলসানো পরিপূর্ণ চাঁদ। সারা বিছনায় কোথাও কোন ছায়া নেই। কে বলবে একটু আগেও এই আকাশে হানা দিয়েছিলো বোমারু বিমান। সত্যি, জ্যোৎস্নার মায়ালোকে সবকিছু এখন যেন মনে হচ্ছে রূপকথা।

'এর্নস্ট ?'

'উঁ।'

'কি ভাবছো ?'

গ্রেবার সহজ হবার ভান করলো। 'কই, কিছু না তো !'

এলিজাবেথ সমুদ্র-ঝিনুকের মতো বড় বড় চোখদুটো কেবল মেলে দিলো। 'বলবে না ?'

একটু নিস্তব্ধতার পর গ্রেবার বললো, 'স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে বলতে আমরা কেঁদে ফেলতে পারতাম, এলিজাবেথ। আমরা এর চেয়ে অনেক বেশি বিষণ্ণ ম্লান হতে পারতাম।'

'এর্নস্ট!'

'তুমি বিশ্বাস করো, আজেবাজে কথার মধ্য দিয়ে সারাটা দিন আমি নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। সবচেয়ে সতর্ক ছিলাম তোমার জন্যে, পাছে তোমার খারাপ লাগে, তুমি কষ্ট পাও···'

'হ্যাঁ এর্নস্ট, আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় নিজেকে সামলে নিতে পেরেছো।'

'আমি তাই-ই চেয়েছিলাম।'

'এখন তোমার খুব মন খারাপ লাগছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। মনে হচ্ছে কাল তোমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমি বুঝি মারাই যাবো।'

'না এর্নস্ট, না!' এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর এখন আর্তনাদের মতো মনে হলো।

'আমি জানি এত খারাপ লাগা উচিত নয়···অন্তত তোমাকে পাবার পর।' গ্রেবার ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'জানো, যখন খুব খারাপ লাগে, যখন ভাবি আমাকে আবার সীমান্তে ফিরে যেতে হবে—তখন মনে হয় তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো হতো।'

'আমারও ঠিক তাই মনে হয়, এর্নস্ট। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমারও বুকের মধ্যে এমন কষ্ট হতো না।'

'অথচ এখন আগের মতন সেই নিঃস্ব রিক্ত একই শূন্য হাতে আমাকে আবার সীমান্তে ফিরে যেতে হতো, এলিজাবেথ। প্রেমহীন ভালবাসাহীন সে নিঃসঙ্গতার চেয়ে বিচ্ছেদের দুঃখ আমার অনেক ভালো।'

এলিজাবেথ উঠে দাঁড়ালো। হাতে হাতে জিনিসপত্তর সব বিছনা থেকে সরিয়ে ফেললো। তারপর আবার বিছনায় ফিরে এলো।

গ্রেবার বললো, 'আমি হয়তো তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারলাম না।'

'এর চেয়ে সুন্দর আর কেউ বোঝাতে পারে না, এর্নস্ট।' এলিজাবেথ ঝাঁপিয়ে পড়লো গ্রেবারের বুকে। গ্রেবার আবার অনুভব করলো ওর নরম শরীর। এই মুহূর্তে মনে হলো ওর কোন নাম নেই। ঠিক তখনই কেমন যেন অসহ্য শুভ্র একটা শিখা দীপ্ত জ্বলে উঠলো ওর বুকের মধ্যে, আর সে-প্রোজ্জ্বলিত শিখায় একাকার হয়ে গেলো ওর চাওয়া পাওয়া, জীবন মৃত্যু,

ওর প্রেম ভালবাসা, সব সব। ওর বন্ধ চোখের পাতায় ভেসে উঠলো অবিলোপী স্নিগ্ধ প্রশান্তির একটা শান্ত মুখচ্ছবি।

বিকেলের ছায়া তখন পড়ে এসেছে। ওরা দুজন বাগানে বসেছিলো। বাড়ির পোষা মেনিটা ধীর শান্ত পায়ে বাগানে ঘুরছে। পেটটা ভারি হয়ে ঝুলে পড়েছে, আর দু-একদিনের মধ্যেই প্রসব করবে। এখন কারুর দিকেও তাকাচ্ছে না। এলিজাবেথ অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ আনমনা হয়ে ও বললো, 'মনে হয় আমারও বাচ্ছা হবে।'

গ্রেবার চমকে উঠলো। 'বাচ্ছা! কেন?'

এলিজাবেথ ওর মুখের দিকে তাকাতেই হেসে ফেললো। 'বারে, কেন নয়?'

'না, মানে···ঠিক এই সময়ে···তোমার কি মনে হচ্ছে বাচ্ছা হবে?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'তাহলে তো তোমাকে আমার আরও বেশি করে আদর করা উচিত। যদিও এ সময়ে আমি ঠিক বাচ্ছার কথা ভাবিনি।'

'ভাবতে তোমাকে হবে না, এর্নস্ট। প্রকৃতপক্ষে এটা তোমার ভাবার ব্যাপার নয়। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত আমি সুনিশ্চিত নই।'

'হয়তো নও, কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্যে একটা শিশু জন্ম নেবে।···ভাবতেই আমার অবাক লাগছে!'

বেড়ালটা আবার ফিরে এলো। এবার রান্নাঘরের দিকে ও ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। এলিজাবেথ বললো, 'বাচ্ছা প্রতিদিনই জন্মাচ্ছে, এর্নস্ট।'

হঠাৎ গ্রেবারের হিটলারের কথা মনে পড়লো, ওঁর জন্মলগ্নে কে আর ভেবেছিলো এই শিশুর বাবা-মাকেই একদিন এ পৃথিবীর নির্মম অভিশাপ কুড়োতে হবে!

'এই, কি ভাবছো?'

'আচ্ছা এলিজাবেথ, তুমি বাচ্ছার কথা কেন বললে? এটা কি তোমার ইচ্ছে, না অন্যকিছু?'

'কেন, বাচ্ছা তুমি চাও না?'

'চাই। শান্তির সময় হলে নিশ্চয়ই চাইতাম। কিন্তু তার আগে বাচ্ছার কথা আমি কখনও ভাবিনি, এলিজাবেথ। আমাদের চারদিকের এই বিষাক্ত

পরিবেশে একটা শিশু কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়াবে আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু অন্যদিক থেকেও ভেবে দেখার আছে, এর্নস্ট,' এলিজাবেথ শান্ত স্বরে বললো।

'যেমন ?'

'যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাকে বাস্তব শিক্ষা দেবার। কেউ যদি শিশু নাই চায়, তাহলে কেমন করে সে জানবে—প্রত্যেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেমন করে এত বড় একটা যুদ্ধ সংগঠিত হলো, কেমন করে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে গেলো। তাছাড়া পৃথিবীকে আবার নতুন করে কারা গড়বে বলো ?'

'সেইজন্যেই কি তুমি বাচ্ছা চাও, এলিজাবেথ ?'

'না। একটু আগেও আমি এ সম্পর্কে কিছু ভাবিনি।'

গ্রেবার চুপ করে রইলো। কি বলবে ও ? তাছাড়া ওর যুক্তির বিরুদ্ধে তার কিছুই বলার নেই। এলিজাবেথ ঠিকই বলেছে।

'এর্নস্ট ?'

'উঁ ?'

'কি ভাবছো ?'

'তোমাকে আমার জীবনে বড্ড তাড়াতাড়ি পেলাম, এলিজাবেথ।' গ্রেবার মুখ তুললো। 'ভাবছি ঠিক এখনই আমাদের বিয়ে করাটা উচিত হয়নি, তাছাড়া অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে আমরা বাচ্ছা চাই কিনা।'

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে গ্রেবারকে কথা বলতে দেখে এলিজাবেথ ঝরনার মতো ঝরঝর হাসিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর একসময় চকিতে উঠে দাঁড়ালো। 'সবচেয়ে সহজ দিকটা তুমি কেন লক্ষ্য করছো না, এর্নস্ট ? আমি তো যে-কোন শিশু চাইনি, চেয়েছি কেবল তোমার শিশু। শুধু তোমার স্মৃতিকে আমার রক্তের স্পন্দনে আমার সত্তায় উপলব্ধি করবো বলো।'

'এলিজাবেথ !'

'আমি যাই, ফ্রাউ ভিট্টে তোমার রাতের খাবারের কি ব্যবস্থা করছেন দেখে আসি। তাছাড়া ট্রেনে দুদিনের মতো তোমার খাবার আমি নিজে হাতে গুছিয়ে দিতে চাই।'

গ্রেবার একা তার চেয়ারে চুপচাপ বাগানে বসে রইলো। বিকেলের পড়ন্ত

রোদে রাঙা হয়ে রয়েছে সারা আকাশ। একটা দিন শেষ হতে চললো। তার স্মৃতির পুঁজিতে চুরি করে জমানো আর একটা দিন। যদিও সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে ও রওনা হয়ে গেছে, তবু আর একটা দিন ও রয়ে গেলো। এখন বিকেল। আর ঘণ্টাখানেক পরেই ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

সকালের দিকে ডাকঘরে গিয়ে শেষবারের মতো আর একবার খোঁজ নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু বাবা-মার নতুন কোন খবর পায়নি। যা-কিছু গোছ-গাছ বিলিব্যবস্থা করার সবই করা হয়ে গেছে। এলিজাবেথ এখানে থাকতে চায় জেনে ফ্রাউ ভিট্রে খুশিই হয়েছেন। গ্রেবার নিজে লিয়েবনিসষ্ট্রাসে গিয়ে বিমান-আক্রমণের চোরাকুঠরিটা দেখে এসেছে। শুধু ভালোই নয়, অন্য যে-কোন চোরাকুঠরির চাইতে মজবুত। বিমনা হয়ে ও চুপচাপ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলো। মৃদুল হাওয়ায় দুটো সাদা প্রজাপতি ডানা মেলে উড়ছে আর মনের পরতে পরতে ওর ভরে উঠছে স্নিগ্ধ একটা প্রশান্তি। এখন আর মনে হচ্ছে না—ছুটিটা কত সংক্ষিপ্ত এবং জীবনের যা-কিছু ভিত চোরাবালির ওপর গড়া।

ভেতর থেকে শুনলো চীনামাটির পেয়ালা-পিরিচের ঠুংঠাং শব্দ আর এলিজাবেথের কাটা-কাটা স্খলিত কণ্ঠস্বর। এলিজাবেথ হাসছে। মনে পড়লো তার শেষ কথাকটা—তোমার স্মৃতিকে আমার রক্তের স্পন্দনে আমার সত্তায় উপলব্ধি করতে চাই, এর্নস্ট! এখন ওর মনে হলো, দুজনের মাঝে কোথায় যেন কাচের স্বচ্ছ একটা দেওয়াল ভেঙে গেলো আর তার ওপারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো অনাগতের সবুজ শ্যামলী একটুকুরো প্রান্তর। দেওয়ালের ওপারের কথা গ্রেবার কখনও ভাবেনি। এখানে ফিরে আসার পর ও ভেবেছিলো নিবিড় প্রত্যয়ে কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু সে-কোন কিছু আর যাই হোক না কেন, অন্তত শিশু নয়। শিশুর কথা জীবনে ও এই প্রথম ভাবলো। গোধূলির রাঙা আলোয় স্নান-সেরে-ওঠা লাইলাক ঝোপের দিকে গ্রেবার অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। এখন ওর মনের অণুতে অণুতে ভরে উঠছে কবোষ্ণ একটা ভালবাসা।

'না এলিজাবেথ, দেরি হয়নি। ট্রেন ছাড়বে ছটায়। এই সামান্য কটা জিনিস আমি নিজেই তোলা-নামা করতে পারবো। তোমাকে আর আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত আসতে হবে না। আমি এখান থেকেই বিদায় নিয়ে যেতে

চাই, আমি চাই তোমার এখানকার শান্ত স্মৃতিটা আমার মনের মধ্যে গাঁথা থাক। আমি চাই না স্টেশনের অজস্র ভিড়ের মধ্যে তোমাকে মিশিয়ে ফেলতে। গতবারে মা আমার সঙ্গে স্টেশনে গিয়েছিলেন। আমি কিছুতেই ওঁকে থামাতে পারিনি। দুজনেরই পক্ষে সে এক বিশ্রী ব্যাপার। তার পর থেকে যতবারই আমার মার কথা মনে পড়েছে—প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো আলু-থালু বেশ, ক্লান্ত শ্রান্ত রোরুদ্যমানা একটা নারীর ছবিই আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠেছে, আমার মার প্রকৃত ছবিটাকে আমি কিছুতেই মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। তুমি বুঝতে পেরেছো?'

'পেরেছি এর্নস্ট।'

'এতে অন্তত আমাদের কষ্টের বোঝা কিছুটা কমবে। তাছাড়া আমি চাই না—বাঁদরের মতো দেখতে অন্য একটা পোশাক পরে আমাকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা সংখ্যায় পরিণত হতে দেখে তোমার খারাপ লাগুক। আমরা যেমন আছি ঠিক তেমনিভাবেই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাই। আর এই টাকাকটা তুমি রেখে দাও, এইগুলো আমার কাছে রয়েই গিয়েছিলো।'

'আমার লাগবে না, এর্নস্ট। নিজের রোজগারে আমার খুব ভালো-ভাবে চলে যাবে।'

'আমি জানি। কিন্তু ওখানে খরচ করার কোন সুযোগই পাবো না, মিছিমিছি পড়ে থাকবে। তুমি বরং খুব সুন্দর দেখে একটা পোশাক কিনো।'

'ঠিক আছে, আমি বরং মাঝে মাঝে তোমাকে ডাকে কিছু পাঠাতে পারবো।'

'আমার জন্যে কিচ্ছু পাঠাতে হবে না। এখানে তোমরা সাধারণত যা খেতে পাও তার চাইতে অনেক ভালো খাবার আমরা ওখানে পাই। তুমি বরং সুন্দর দেখে একটা পোশাক কিনো। বলো, কিনবে?'

'কিনবো, এর্নস্ট।'

'অবশ্য জানি না এতে ঠিক কুলোবে কিনা।'

'খুব কুলোবে। চাই কি পোশাকের সঙ্গে একজোড়া জুতোও হয়ে যেতে পারে।'

'বাঃ, তাহলে তাই কিনো।'

গ্রেবার এলিজাবেথকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো বুকের মধ্যে। তপ্ত ঠোঁট রাখলো ওর নরম ঠোঁটে, কপালে, গোলাপের ঝরা পাপড়ির মতো কোমল চিবুকে। একটু পরে এলিজাবেথ ওর মুখের কাছে মুখ রেখে

ফিসফিস করে বললো, 'পোশাকটা আমি যত্ন করে তুলে রেখে দেবো, এর্নস্ট ! যেদিন তুমি আবার ফিরে আসবে, সেদিন পরে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে যাবো।'

গ্রেবার একবারও পেছনে ফিরে তাকালো না। না শ্লথ না দ্রুত, স্থির শান্ত পায়ে ও হেঁটে চললো। সামরিক ঝোলাটা এখন ভারি আর পথটা সুদীর্ঘ মনে হচ্ছে। দু-মুখো একটা রাস্তার মোড়ে বাঁক নিতেই মনে হলো ও যেন এলিজাবেথের চুলের সেই হালকা মিষ্টি গন্ধটা পাচ্ছে। একটু এগোতেই মিষ্টি গন্ধটা বারুদে-পোড়া উগ্র গন্ধের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেলো।

নদীর চওড়া বাঁধ পেরিয়ে বড় একটা বাতাবিলেবুর গাছ। গাছের পাতাগুলো সব ঝলসে গেছে। নদীর জল এখন এসে ঠেকেছে তলানিতে, উপলের মধ্যে দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখনই যদি বিমান-আক্রমণ শুরু হয় আর ও যদি ট্রেনটা না ধরতে পারে, তাহলে কি হবে? এলিজাবেথ ওকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে যাবে? কিন্তু চারদিকের অবস্থা এত স্বাভাবিক যে ভাবতেই গ্রেবারের কান্না পেলো। তাছাড়া বিমান-আক্রমণ হলে ট্রেনও দেরিতে ছাড়বে, তখন ফিরে আসার কোন প্রশ্নই আসে না।

ও ব্রামশেট্রাসে এসে পৌঁছলো। আসার সময় এখান থেকেই ওকে হেঁটে শহরে প্রবেশ করতে হয়েছিলো। স্টেশনগামী বাসগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রেবারের মনে হলো প্রথম দিনের দেখার সঙ্গে আজকের দেখার যেন কোন মিল নেই। মিনিট দশেক পরেই বাস ছেড়ে দিলো। ইতিমধ্যে স্টেশনটাকে আরও দূরে সরিয়ে আনা হয়েছে। টিনের চালের ওপর ঘাস লতাপাতা চাপানো, যাতে বিমান থেকে কিছু বোঝা না যায়। স্টেশনের দেওয়াল ঘিরে বসানো হয়েছে কৃত্রিম গাছ, একপাশে রাখা হয়েছে একটা কাঠের গরু। দূরে ফাঁকা মাঠে দুটো বুড়ো ঘোড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চরছে।

আগে থেকেই ট্রেন প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলো। অধিকাংশ বগিতে লেখা 'সামরিক যাত্রীদের জন্যে'। প্রত্যেক কামরায় এক-একজন অফিসার সৈনিকদের কাগজ পরীক্ষা করে দেখছেন। একদিন দেরির জন্যে গ্রেবারকে কোন কৈফিয়ত দিতে হলো না। জানলার ধারের একটা আসনে ও চুপ-চাপ বসে রইলো। কিছুক্ষণ পরে আরও তিনজন যাত্রী উঠলো—একজন অসামরিক কর্মচারী, কপালে দগদগে গভীর ক্ষত, একজন কোন কর্পোরাল

এবং অন্যজন সাধারণ সৈনিক। বুকের স্বস্তিকা-আঁটা দুজন অল্পবয়সী তরুণী ঢাকা-দেওয়া একটা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির হলো।

অসামরিক কর্মচারীটি জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো। 'কফি এসেছে বলে মনে হচ্ছে।'

কর্পোরাল বললেন, 'আমাদের জন্যে নয়, এই প্রথম যেসব রংরুট সীমান্তে যাচ্ছে তাদের জন্যে। সামরিক-ভাষণ শেষ হবার পর ওদের প্রত্যেককে এক পেয়ালা করে কফি দেওয়া হবে।'

সৈনিকটি চোখ মিটমিট করে হাসলো। 'আমাদের জন্যে ভাষণও দেওয়া হবে না, কফিও না।'

তরুণ রংরুটদের গুনে গুনে দুটো সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। হাঁটু পর্যন্ত চকচকে বুট-পরা দুজন এস এস অফিসারকে এবার প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলো। ছুটি থেকে ফেরা আরও তিনজন সৈনিক কামরায় প্রবেশ করলো। ওদের একজন জানলাটা খুলেই বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো। বাইরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা, সঙ্গে একটা বাচ্ছা। গ্রেবার প্রথমে শিশু, পরে মার মুখের দিকে তাকালো। কান্না-ভেজা চোখের পাতাদুটো ফোলা-ফোলা, কঙ্কালসার শীর্ণ শরীর, সাধারণ ছিটের ব্লাউজের নিচে শিথিল স্তনাভাস। আহত পশুর মতো করুণ চোখে ও স্বামীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'তুমি কিন্তু তোমার শরীরের যত্ন নিও, হেনরিখ।'

'নিশ্চয়ই। আর তুমিও বাচ্ছাগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো।'

'সে জন্যে কিচ্ছু ভেবো না।'

হেনরিখ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'না মারী, ওদের জন্যে ভাবনা আমার কম নয়।'

নিশ্চুপ দুজনে পরস্পরের দিকে সজল চোখে তাকিয়ে রইলো।

'হয়তো শেষের দিকে আমাদেরও কফি দেওয়া হতে পারে,' অসামরিক কর্মচারীটি বললো।

পাশের সৈনিকটি ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'দেওয়া তো উচিত। হাজার হোক আমরাও তো পুরনো সৈনিক এবং সীমান্তে ফিরে যাচ্ছি।'

'কফি দিক বা না দিক, রাত্তির বেলার খাবার নিশ্চয়ই দেবে।'

এবার কুচকাওয়াজের পদশব্দ এবং আদেশ শোনা গেলো। ওদের প্রায় সবাই অত্যন্ত তরুণ, টলটলে কাঁচা মুখ, দু চোখে চাপা কৌতূহল। কর্পোরাল ওদের দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় বললেন, 'এদের মধ্যে কটা বাঁচবে কে

জানে! এখনও কুঁড়ির অবস্থাও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, অথচ এদের ওপরেই নির্ভর করে আমাদের যুদ্ধ চালাতে হবে।'

কুচকাওয়াজের শব্দ থেমে গেলো। কে যেন ভাষণ দিচ্ছে।

কর্পোরাল জানলায় ঝুঁকে-পড়া সৈনিকটিকে বললেন, 'জানলাটা বন্ধ করে দিন।'

হেনরিখ কোন উত্তর দিলো না। বক্তার কণ্ঠস্বর এখন আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। গ্রেবার আসনের পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করলো। হেনরিখ সম্ভবত কর্পোরালের কথাটা শুনতে পায়নি। বেদনাহত চোখে ও মারীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। গ্রেবার মনে মনে ভাবলো, ভাগ্যিস এলিজাবেথ এখানে আসেনি!

হঠাৎ 'এগিয়ে চলেছে সৈনিক বীর' গানটা শোনা গেলো। গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো কামরার ভেতরে সবাই কেমন যেন উসখুস করছে। ও নিজেও অস্বস্তি বোধ করলো। একটু পরেই রঙরুটরা যে-যার কামরায় উঠে গেলো এবং দেখতে দেখতে কফির পাত্রও শূন্য হয়ে গেলো।

'সব ব্যাটাই শালা সার্কাসের ভাঁড়!' অসামরিক কর্মচারীটি নিজের মনে গজগজ করলো। 'কেন, আমাদের জন্যেও একটু বেশি কফি আনলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো?'

ওর সামনের সৈনিকটি চাপা স্বরে বললো, 'বানচোৎদের ধরে চাবকানো উচিত।'

হেনরিখ তখনও জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলো। এবার মারীকে ও বললো, 'বার্থা খুড়ীর ওপর একটু নজর রেখো।'

'রাখবো হেনরিখ, তুমি কিচ্ছু ভেবো না।'

ওরা আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

কে যেন বললো, 'ছটা তো বেজে গ্যাছে, কখন ট্রেন ছাড়বে?'

কেউ উত্তর দিলো না।

আরও প্রায় মিনিট কুড়ি ওদের অপেক্ষা করতে হলো।

'এবার তুমি যাও।'

'আর একটু অপেক্ষা করি, হেনরিখ।'

'বাচ্ছাটা নেতিয়ে পড়েছে। আমার মনে হয় ওর বোধহয় ঘুম পেয়েছে।'

'এই তো সারারাত রয়েছে, পড়ে পড়ে ঘুমবে।'

একটু বিরতির পর হেনরিখ বললো, 'জোসেফকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

'জানাবো।'

সৈনিকটি এবার কম্বল বিছিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লো। যেন এরই জন্যে ও এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলো। ট্রেনটা এবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো।

'তাহলে সবাইকেই যতটা সম্ভব চোখে চোখে রেখো।'

'রাখবো হেনরিখ, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তুমি শুধু নিজের শরীরের ওপর যত্ন নিও,' ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে মারীও প্রায় ছুটতে শুরু করলো, 'আর সব সময় সতর্ক থেকো।'

'নিশ্চয়ই।'

গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো শোকার্ত নারীর কেবল একটা মুখ জানলার পাশাপাশি ছুটে চলেছে। যেন জীবনমৃত্যুকে তুচ্ছ করেও আর দশ সেকেণ্ডের জন্যে ও হেনরিখের মুখটা স্পষ্ট দেখে নিতে চায়। আর তখনই হঠাৎ ও এলিজাবেথকে দেখতে পেলো। এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে ছিলো একটা থামের আড়ালে, গ্রেবার আগে লক্ষ্যই করেনি। পলকের জন্যে হলেও, গ্রেবার ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলো—মুখ নয়, সমুদ্র-ঝিনুকের মতো কেবল আয়ত দুটো চোখ। স্থির, নিষ্পলক। গ্রেবার লাফিয়ে উঠে হেনরিখকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। 'দেখি, দেখি।'

আর তখনই ওর সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে গেলো। বুঝতে পারলো না কেন ও স্টেশনে একলা এলো, কেন ও এলিজাবেথকে সঙ্গে করে আনলো না, কেন ওকে কিছু বললো না! সত্যিই তো, এখন মনে হলো অনেক কিছু প্রয়োজনীয় কথা যেন ওকে বলার ছিলো।

সরিয়ে দিলেও হেনরিখ কিন্তু তার জায়গা থেকে নড়েনি। গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে ও বললো, 'লিসার দিকেও একটু চোখ রেখো···সারাদিন বড্ড মনমরা হয়ে···'

'দেখি দেখি, আমাকে একটু জানলা দিয়ে দেখতে দিন···' গ্রেবার হেনরিখের কনুই ধরে টান দিলো। 'আমার স্ত্রী ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

হেনরিখ ভ্রূক্ষেপই করলো না। 'মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখো।'

মারী কিন্তু এবার অনেক পেছিয়ে পড়েছে, হেনরিখের কথা ও কিছুই শুনতেও পাচ্ছে না। গ্রেবারের হঠাৎ কেন জানি মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। একটানে হেনরিখকে ও হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এলো কামরার মাঝখানে। তারপর জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে হাত নাড়লো। এবার বাঁকের মুখে ও এলিজাবেথকে স্পষ্ট দেখতে পেলো। দূরে ছোট্ট একটা পুতুলের মতো সে

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়তো নাড়ানো-হাতটা সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কে নাড়ছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে না।

বাঁকটা সম্পূর্ণ ঘুরতেই গ্রেবার আর কিচ্ছু দেখতে পেলো না।

পঁচিশ

ছুদিন পরে গ্রেবার তার দলকে খুঁজে পেলো এবং সেনা-দপ্তরে গিয়ে তার ফিরে আসার খবর জানালো। সার্জেন্ট মেজরের কোন পাত্তা নেই, কেবল একজন কেরানী চেয়ারে বসে ঢুলছে। শেষবারে দেখা জায়গা থেকে গ্রামটা এখন প্রায় একশো কুড়ি কিলোমিটার পশ্চিমে।

গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'এখানের খবর কি ?'

'ওকথা আর জিগেস করবেন না, এক কথায় যাকে বলে জঘন্য। তারপর আপনার ছুটি কেমন কাটলো ?'

'ওই একরকম। কেন, এখানে কিছু হয়েছে নাকি ?'

'অনেক। এসে যখন পড়েছেন নিজে চোখেই সব দেখবেন।'

'অন্য সৈনিকরা সব কোথায় ?'

'কিছু ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, কিছু মৃতদের কবর দিচ্ছে। ছুপুরের আগেই ওরা ফিরে আসবে।'

'কেউ মারাটারা গ্যাছে নাকি ?'

'সেটা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। আমি তো ঠিক জানি না আপনি যাবার সময় কারা কারা বেঁচেছিলেন, তবে অনেক রঙরুটকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয়েছিলো। সবকটারই গলা টিপলে ছুধ বেরোয়, যুদ্ধের 'য'ও বোঝে না। মাছির মতো ওরাই মরেছে সবার আগে। আমাদের একজন নতুন সার্জেন্ট এসেছেন, মাইনার্ট।' কেরানী হাই তুললো। 'এসে যখন পড়েছেন, রয়েসয়ে সব দেখবেন, আমি আর কি বলবো।'

গ্রেবার গ্রামের পথে পা বাড়ালো। সব গ্রাম প্রায় একইরকম দেখতে, একইভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। কেবল তফাত, যা এখন আর তুষার নেই, পথগুলো কাদায় প্যাচপ্যাচ করছে। হাঁটতে গেলে পা বসে যায়। পথের মাঝেমাঝে তক্তা পাতা। তক্তার এ মাথায় পা দিলে ও মাথা ঢেঁকির মতো উঠে যাচ্ছে।

সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে গেছে, রোদের তেজ বাড়ছে। গ্রেবারের মনে হলো জার্মানির চেয়ে এখানে গরম যেন একটু বেশি। ও কান পেতে শুনলো সীমান্তে ভারি কামানের শব্দ, দিগন্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত তার গুরু-গম্ভীর আওয়াজ। ওদের আস্তানাটা খুঁজে পেতে গ্রেবারের কোন অসুবিধে হলো না। জিনিসপত্তর রেখে ও আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। এবার গ্রামের চারধার ঘিরে ট্রেঞ্চগুলো ওর চোখে পড়লো। ওগুলো এখনও জলে টৈটম্বুর হয়ে রয়েছে, মাঝে-মাঝে পাড় থেকে ধসে গেছে। কোথাও কোথাও সিমেণ্ট আর লোহা জমিয়ে গোপন-আশ্রয় তৈরি করা হয়েছে। দূর থেকে দেখলে ওগুলো মনে হয় ঠিক যেন গোরস্থান।

গ্রেবার ফিরে চললো। বড় রাস্তায় সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। চশমা চোখে ছড়ি হাতে তক্তা পেরিয়ে আসার সময় ওঁকে দেখে সার্কাসের দলে তারের-খেলা-দেখানো কোন ক্লাউনের মতো মনে হলো। গ্রেবারকে দেখে উনি খুব খুশি হলেন, 'তুমি চলে গেলে, আর সব ছুটিও বাতিল হয়ে গেলো। সেদিক থেকে তুমি খুব ভাগ্যবান, গ্রেবার।' কম্যাণ্ডার উজ্জ্বল চোখে ওর দিকে তাকালেন। 'তারপর, ছুটিতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না, স্যর।'

'ভালো। আমরা আপাতত এখানে ঘাঁটি গেড়েছি। জায়গাটা বিশেষ সুবিধের নয়। আমরা আর দু-একদিনের মধ্যেই সংরক্ষিত আস্তানায় ফিরে যাবো। ঢালায়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গ্যাছে। জায়গাটা তুমি দেখেছো?'

'ঠিক দেখার সুযোগ হয়নি।'

'সে কি, এখনও তুমি ছাখোইনি?'

'না, স্যর।'

'এখান থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পেছনে। কেন, ট্রেনে আসার সময় লক্ষ্য করোনি?'

'আমি ভোরবেলায় এখানে এসে পৌঁছেছি, স্যর। রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে ঠিক লক্ষ্য করতে পারিনি।'

'তাই হবে।' গ্রেবারের মুখের দিকে তাকিয়ে উনি কি যেন খোঁজার চেষ্টা করলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তোমাদের প্ল্যাটুন লিডার, লেফটেনাণ্ট মুয়েলার মারা গ্যাছেন। এখন তোমাদের নতুন লেফটেনাণ্ট মাস।'

ঠিক এই মুহূর্তে কি বলবে গ্রেবার ভেবে পেলো না। কোনরকমে ও ঢোক গিললো। 'হ্যাঁ, স্যর।'

কাদার মধ্যে ছড়ি গিঁথে গিঁথে কম্যাণ্ডার রায়ে মাটি পরীক্ষা করে দেখলেন। 'সব জিনিসেরই ভালো মন্দ আছে। যতদিন না এই কাদা শুকচ্ছে, রাশিয়ানরা সাঁজোয়া নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতে পারবে না। আর আমরাও সংরক্ষিত অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করার সুযোগ পাবো। তুমি ফিরে আসাতে আমরা খুব খুশি হয়েছি, গ্রেবার। তরুণ রঙরুটদের শিক্ষা দেবার জন্যে আমাদের পাকা সৈনিকের দরকার। তারপর তোমাদের ওখানকার খবর কি?'

'এখানকার মতো একই অবস্থা। বহুবার বিমান-আক্রমণ হয়ে গ্যাছে।'

'তাই নাকি? তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা!'

'অন্যান্য শহরের খবর ঠিক জানি না, তবে আমাদের শহরে প্রতি দু'দিন অন্তর কমসে কম একবার করে অন্তত বিমান-আক্রমণ হয়েছে।'

রায়ে এমনভাবে গ্রেবারের দিকে তাকালেন যেন ওর মুখ থেকে আরও অনেক কিছু শুনতে চান। গ্রেবার কিন্তু আর কিছু বললো না।

দুপুরে অন্য সৈন্যরা সব ফিরে এলো। ইম্মেরমান বললো, 'এই যে, এখনও বেঁচে আছো তাহলে? তা এই ভাগাড়ে আবার মরতে ফিরে এলে কেন, পালাতে পারলে না?'

গ্রেবার হাসলো। 'কোথায়?'

ইম্মেরমান মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবলো। 'কেন, সুইজারল্যাণ্ডে।'

'তাই তো, ওর কথা আমার একদম মনে ছিলো না। ইশ্, কি ভুলটাই না করেছি! প্রতিদিন জার্মানি থেকে বিলাসবহুল বিশেষ একটা ট্রেন ছাড়ে সুইজারল্যাণ্ডে পলাতকদের পৌঁছে দেবার জন্যে। ট্রেনের মাথায় রেড-ক্রশের চিহ্ন আঁকা থাকে, যাতে কেউ না বোমা ফ্যালে। আর সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে পলাতকদের স্বাগত জানাবার জন্যে বিজয়-তোরণও তৈরি করে রাখা হয়েছে। ভাঁড় আর কাকে বলে! অত যদি সহজ হতো সবাই তাহলে জার্মানি ছেড়ে পালাতো।'

'সহজ নয় আমি জানি। এসব ক্ষেত্রে জীবনের জন্যে সব সময়ই বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। তাছাড়া প্রতিদিন যে হারে পিছু হটছি, কোথায় গিয়ে পৌঁছুবো কেউ জানে না। এও তো এক ধরনের পালানো, পরিণামে

এর ঝুঁকি সুইজারল্যাণ্ডে পালানোর চাইতে কোন অংশে কম বিপজ্জনক নয়।'

গ্রেবার ভাবলো কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। মনে মনে ভাবলেও, এই মুহূর্তে উপযুক্ত কোন জবাব ও খুঁজে পেলো না। তাই চুপ করে রইলো।

'মুয়েলার মারা গ্যাছেন, তুমি জানো ?'

'কম্যাণ্ডার রায়ের কাছে একটু আগে শুনলাম।'

'মেইনেকে আর শ্রয়েডার এখন হাসপাতালে, মুয়েকে মারা গ্যাছে পেটে গুলি লেগে। বেরনিংও মারা গ্যাছে। ওর একটা পা একদম উড়ে গিয়েছিলো। প্রথমে ওকে আমরা খুঁজেই পাইনি। যখন খুঁজে পেলাম, রক্তপাতে সারা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে গ্যাছে।'

গ্রেবার চুপ করে রইলো। যদিও এইসব মৃত্যুসংবাদের জন্যে ও আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলো, তবু বেরনিং-এর জন্যে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেলো। হঠাৎ আর একজনের কথা ওর মনে পড়লো, 'আর হির্শলাণ্ড ?'

'হির্শলাণ্ড! কেন, হির্শলাণ্ডের আবার কি হবে ?'

'ও-ও তো মারা গ্যাছে।'

'কে বললো ?'

'আমি শুনলাম।'

'গাধা আর কাকে বলে! ওই তো ও বসে রয়েছে।'

গ্রেবার সাপ দেখার মতো চমকে উঠলো। তারপর চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো। সত্যিই তাই, পুরনো একটা পিপের ওপর বসে ও সামরিক ঝোলাটা পরিষ্কার করছে। 'কি ব্যাপার! আমি ওর মার সঙ্গে দেখা করলাম, উনি বললেন হির্শলাণ্ড মারা গ্যাছে।'

গ্রেবার হির্শলাণ্ডের পাশে এসে দাঁড়ালো। 'আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।'

'সত্যি ?' হির্শলাণ্ড খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। 'তোমার মনে ছিলো ? আমি তো ভেবেছিলুম তুমি বোধহয় ভুলেই গ্যাছো।'

'কেন, হঠাৎ তোমার একথা মনে হলো কেন ?'

'না, এমনি···নানান কিছুর মধ্যে মনে না থাকাটাই স্বাভাবিক।'

'কাউকে কোন কথা দিলে, আমি তা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি।'

'জানি গ্রেবার, সেইজন্যেই তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম। আমি

সাধারণত আমার জন্যে কারুর কাছে কিছু চাই না।' একটু বিরতির পর হির্শলাণ্ড জিজ্ঞেস করলো, 'মার খবর কি ? তুমি ওঁকে বলেছো তো আমি ভালো আছি ?'

'তোমার মার ধারণা তুমি মারা গ্যাছো, হির্শলাণ্ড।'

'কি বললে ? অসম্ভব !'

'উনি আমাকে নিজে মুখে বলেছেন সেনাদপ্তর থেকে এই মর্মে চিঠি পেয়েছেন।'

হির্শলাণ্ড বিহ্বল চোখে গ্রেবারের দিকে তাকালো। 'কিন্তু আমি তো ওঁকে প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লিখি !'

'ওঁর ধারণা চিঠিগুলো তোমার আগের লেখা।' একটু চুপ করে থেকে গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন করে হলো কিছু অনুমান করতে পারছো ? আর যাই হোক এই সেনাবাহিনীতে দুজন হির্শলাণ্ড যখন নেই···'

'আমার মনে হয় কেউ ইচ্ছে করে করেছে।'

'এই ধরনের কাজ কেউ ইচ্ছে করে করতে পারে না।'

'স্টেইনব্রেনারও নয় ?'

'ও কি এখনও বেঁচে আছে ?'

'নিশ্চয়ই। সার্জেন্ট মেজর মারা যাবার পর স্টেইনব্রেনারই দুদিন অফিসের কাজকর্ম দেখাশোনা করেছিলো। কেরানীবাবুও তখন অসুস্থ ছিলেন।'

'কম্যাণ্ডার রায়ে কি তখন সব চিঠি সই করেছিলেন ?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না। আর মার কাছে কোন একজনের সই থাকলেই যথেষ্ট।'

'আচ্ছা শয়তান তো !' গ্রেবার দাঁতে দাঁত চাপলো। আর তখনই ওর হাইনের মুখটা মনে পড়লো। 'বিশ্বাসই করা যায় না। কিন্তু এতে ওর লাভটা কি হলো ?'

'মজা দেখলো। হাজার হোক আমি ইহুদি, আমাকে জব্দ করতে পারাটাই ওর আনন্দ। তারপর, মা কি বললেন ?'

'উনি বিশেষ কিছুই বলেননি, সারাক্ষণ শুধু চুপচাপ শান্ত শুনে গেলেন। আমার মনে হয় তোমার একটা চিঠি লেখা উচিত এবং সবকিছু ওঁকে খুলে বলাই ভালো। আমার কথা বিশেষভাবে চিঠিতে উল্লেখ কোরো, তাহলে উনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।'

'হয়তো পারবেন, কিন্তু চিঠি পেতে পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

গ্রেবার দেখলো হির্শলাণ্ডের ঠোঁটদুটো মৃদু কাঁপছে। ক্রোধে হাতের আঙুলগুলো ওর আপনা থেকেই মুঠো হয়ে এলো। 'বরং চলো, অফিসে গিয়ে এর একটা ফয়সালা করে আসি। যা-কিছু করার ওখানে গিয়েই করবো। ভুল স্বীকার করে ওদের তারবার্তা পাঠাতে হবে। নইলে কম্যাণ্ডার রায়ের কাছে আমি নালিশ করবো।'

'না গ্রেবার, না!'

'কেন নয়? প্রয়োজন হলে তার চেয়েও বেশি কিছু আমরা করতে পারি।'

'কিন্তু আমি পারি না। আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবো না। আর পারলেও···না, আমি তা চাই না। স্টেইনব্রেনার যদি একবার জানতে পারে আমি ওর নামে নালিশ করেছি, আমার ওপর ও এর চাইতে আরও হিংস্র প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। আমি হয়তো তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না···'

'আমি বুঝতে পেরেছি, হির্শলাণ্ড।' গ্রেবার চাপা স্বরে বললো, 'কিন্তু জেনে রেখো, এমন দিন চিরটা কাল থাকবে না।'

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর গ্রেবার স্টেইনব্রেনারের সঙ্গে দেখা করলো। রোদে পুড়ে গায়ের রঙ একটু তামাটে হলেও, আগের মতো একই উচ্ছল চাপা হাসি ঠিকরে পড়ছে ওর দু চোখের মণি থেকে। ওকে এখন মনে হচ্ছে ঠিক যেন সূর্যস্নাত প্রাচীন কোন দেবদূত।

'বাঃ, বাড়িতে গিয়ে বেশ তো মজা লুটে এলে!'

গ্রেবার উত্তর দিলো না, সার্টের বোতাম খুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। স্টেইনব্রেনার ওর দিকে তাকিয়ে আবার মুচকি মুচকি হাসলো। 'তারপর, ওখানকার খবর কি?'

'বলা বারণ।'

'মানে?'

'আসার পথে সীমান্ত অতিক্রম করার আগে দুজন এস এস ক্যাপ্টেন আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, আমরা যেন কোনক্রমেই শহরের অবস্থার কথা কাউকে না বলি। এই আদেশ লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এবং সেই কঠোর শাস্তিটা কি, নিশ্চয়ই তোমার বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছে না?'

স্টেইনব্রেনার ঝকঝকে দাঁতে সুন্দর করে হাসলো। 'আমি নিজেও একজন এস এস, তুমি আমার কাছে স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।'

'আমাকে তুমি অত বোকা ভেবো না, স্টেইনব্রেনার।'

স্টেইনব্রেনার গম্ভীর হয়ে গেলো। 'তার মানেই তুমি বলতে চাও অনেক কিছু বলার আছে।'

'আমি কিছুই বলতে চাইনি।'

'কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন ওখানে অনেক কিছু বিপর্যয় ঘটে গ্যাছে?'

'ওই যে বললাম, আমি অত গাধা নই।'

গ্রেবারের মুখের দিকে তাকিয়ে স্টেইনব্রেনার কি যেন পড়ার চেষ্টা করলো, তারপর আবার মুচকি মুচকি হাসলো। 'বিয়ে করেছো তো?'

গ্রেবার মনে মনে চমকে উঠলো। 'তুমি কেমন করে জানলে?'

'আমি সব জানি।'

'বুঝতে পেরেছি, অফিসের নথিপত্তর তুমি সব ঘাঁটকেছো।'

স্টেইনব্রেনার সে কথার কোন জবাব দিলো না। একটু চুপ করে থেকে ও বললো, 'এবার ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে আমিও বিয়ে করছি।'

'তাই নাকি! মেয়ে ঠিক করা হয়ে গ্যাছে?'

'হ্যাঁ, আমাদেরই শহরে এস এস কম্যানড্যাণ্টের মেয়ে।'

'খুব স্বাভাবিক।'

'রক্তের সংমিশ্রণের দিক থেকে খুব ভালো খাপ খাবে। ছ্যাখো, শুধু ইহুদি উচ্ছেদ করলেই হবে না, দেশকে সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করতে গেলে চাই পবিত্র আর্য রক্তের সংমিশ্রণ।'

'নিশ্চয়ই। জীবনে তুমি অনেক ইহুদি উচ্ছেদ করেছো বলে মনে হচ্ছে?'

'আমার যোগ্যতার নথিপত্তর দেখলে তুমি আর একথা কখনও জিগেস করতে না। কিন্তু বেশিদিন আর সে সুযোগ পেলাম কোথায়? সেনা-বাহিনীতে চলে আসতে হলো।'

গ্রেবারের দিকে ও ঝুঁকে এলো। তারপর গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'আমি শীগগিরই আবার এস এস-এ ফিরে যাচ্ছি। ওখানে প্রতিদিন যা সব কাণ্ড হচ্ছে···এই তো কয়েকদিন আগেও তিনশো পোলিশ এবং রাশিয়ান কুত্তাকে একসঙ্গে গুলি করে মারা হলো এক ঘণ্টার মধ্যে। ছজন এস এস অফিসারকে তার জন্যে বিশেষ সম্মানও দেওয়া

হয়েছে। আর শালা এখানে···তুমি চলে যাবার পরমাত্র পাঁচজন গেরিলা ধরা পড়েছিলো, তাও আবার বসন্তরোগে আক্রান্ত।'

অদূরে আরক্ত সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে গ্রেবার ভাবলো এস এস সংগঠনের এক সার্থক সৃষ্টি এই স্টেইনব্রেনার। যান্ত্রিক, বর্বর অমানবিকতায় এর জুড়ি নেই। মানুষ মারা ওর কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসেরই মতো সহজ। গ্রেবার জিগেস করলো, 'হির্শলাণ্ডের মার কাছে তুমি ওর মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়েছিলে, তাই না ?'

'কে বললে ?'

'আমি জানি।'

'তুমি কিৎসু জানো না।'

'যাই বলো, ঠাট্টাটা কিন্তু ভারি চমৎকার হয়েছে।'

স্টেইনব্রেনার বাতাসে ঢেউ তুলে হাসলো। 'তোমার বুঝি তাই মনে হয় ? ওর মার মুখের অবস্থাটা একবার কল্পনা করার চেষ্টা করো। অথচ আমার ঘণ্টা, হির্শলাণ্ড আমার টিকিও ছুঁতে পারবে না। আর পারলেও, এই ধরনের ভুল যে-কোন সময়েই হতে পারে।'

গ্রেবার সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকালো। 'সত্যি, তোমার সাহস আছে।'

'সাহস ! এর জন্যে আবার সাহসের দরকার হয় নাকি ? নিতান্তই সাধারণ একটা রসিকতা।'

'এটা রসিকতা নয়, স্টেইনব্রেনার। এর জন্যে যথেষ্ট সাহস থাকা দরকার। সবাই জানে, কারুর মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করলে নিজেই খুব শীগগিরি মারা যায়।'

স্টেইনব্রেনার হাসলো। 'তুমি বিশ্বাস করো ?'

'সবাই করে। এটা আমাদের পুরনো জার্মান প্রবাদ।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।' স্টেইনব্রেনার উঠে পড়লো।

'আমি নিজে দুজনকে জানি, যারা এই ধরনের ঠাট্টা করার পর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বীভৎসভাবে মারা যায়।'

'বাজে বোকো না,' স্টেইনব্রেনার কঠিন চোখে গ্রেবারের মুখের দিকে তাকালো। মুখে স্বীকার না করলেও বুক তার শুকিয়ে গেছে। ঠোঁট থেকে উবে গেছে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি। দু-এক মিনিট ইতস্তত করে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। গ্রেবার পেছন থেকে একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। কামানের গুমগুম চাপা আওয়াজে সীমান্ত তখন কেঁপে উঠছে। একঝাঁক

কাক দ্রুত ডানা মেলে পেরিয়ে গেলো পশ্চিমের আকাশ। হঠাৎ গ্রেবারের মনে হলো ও যেন কোনদিনও ছুটিতে ছিলো না।

রাত্রে গ্রেবারের ওপর পাহারা দেবার দায়িত্ব পড়লো। সারা গ্রাম জুড়ে খাঁ খাঁ করছে গা-ছমছমে একটা নিস্তব্ধতা। শুধু মাঝে মাঝে কামানের শব্দে কেঁপে উঠছে আকাশ আর হঠাৎ-ঝলসে-ওঠা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ধ্বংসস্তূপগুলো। কাদায় ওর ভারি বুটের শব্দ অশরীরীর চাপা গোঙানির মতো মনে হচ্ছে।

হঠাৎ নিঃশব্দ অথচ তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা ওর বুকের ভেতর থেকে উঠে এলো। আসার পথেও প্রথমে ওর তেমন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু এখন যেন অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে যন্ত্রণাটা ওর টুঁটি চেপে ধরলো। নিশ্চল স্থির হয়ে ও দাঁড়িয়ে রইলো। একটুও নড়লো না। যন্ত্রণার কেন্দ্রে ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা বুকে নিয়ে ও অপেক্ষা করলো, অনুভব করতে চাইলো যন্ত্রণার তীব্রতাটুকু। ওর ভীষণ ইচ্ছে হলো যন্ত্রণার মধ্যে থেকে একটা নাম ফুল হয়ে আশ্চর্য ফুটে উঠুক।

কিন্তু উঠলো না। হারানোর স্বচ্ছ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই ফিরে এলো না। ওর মনে হলো কোথাও কোন সেতু নেই, কি যেন ও চিরজন্মের মতো হারিয়ে এসেছে। গ্রেবার নিজের বুকের মধ্যে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। ওর মনে হলো কোথাও কোন কণ্ঠস্বর, ললিত আশার কোন না কোন প্রতিধ্বনি ও নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। কিন্তু পেলো না। কেবল সারা বুক জুড়ে হাহাকার করছে একটা নির্জন নিঃসঙ্গতা।

ওর মনে হলো যত অসহ্যই হোক, নামহীন এই যন্ত্রণা ও বুকের মধ্যে নিঃশব্দে লালন করবে। নইলে কেমন করে উপলব্ধি করবে ভালবাসা! অস্ফুটস্বরে একটা নাম ও বারবার উচ্চারণ করলো। তখনই ভেসে উঠলো কুয়াশা-জড়ানো অস্পষ্ট একটা মুখ। অশ্রুসজল আয়ত দুটো চোখ, আর এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে বাতাসে। গ্রেবার আর্তনাদ করে উঠলো —না না না! মুখটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফ্রাউ ভিট্রের বাগানের ছবিটাকে ও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু সবটাই তখন ওর মনে হলো শব্দবিহীন বাঁশির সুরের মতন। হঠাৎ কেন এমন হলো? এলিজাবেথের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? হয়তো ও ঘুমিয়ে ছিলো আর সেই মুহূর্তে···

কাদার মধ্যে থেকে গ্রেবার বুটজোড়া টেনে তুললো। এখন বুঝতে পারলো সার্টের ভেতরটা ওর ঘামে জবজব করছে।

'কি ব্যাপার, এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি শোনার চেষ্টা করছো ?'

গ্রেবার দেখলো জাউয়ের ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রেবার উদাস চোখে ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'তুমি তো বিবাহিত, তাই না জাউয়ের ?'

'নিশ্চয়ই। বউ ছাড়া কৃষি-খামারের কোন অর্থই হয় না।'

'অনেকদিন বিয়ে করেছো ?'

'হ্যাঁ, তা বছর পনেরো হলো। কেন বল তো ?'

'তখন তোমার কেমন মনে হতো যখন প্রথম বিয়ে করেছিলে ?'

'কি যে বলো, সে কি আর এখন মনে আছে ?'

'আচ্ছা, তখন তোমার মনে হতো না নোঙরের মতো কি যেন একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চাই ? সারাদিন কি এই কথাটাই বারবার ঘুরেফিরে মনে হতো না, মনে হতো না যে বাড়ি ফিরে যাই ?'

'হতো বইকি। এখনও হয়, বিশেষ করে ফসল বোনার মরসুমে। ঠিক-মতো চাষবাস···'

'চাষবাসের কথা তোমাকে আমি জিগেস করিনি জাউয়ের, জিগেস করছি তোমার বউয়ের কথা।' গ্রেবার অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠলো।

জাউয়ের থতমত খেয়ে গেলো, তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, 'স্টেইনব্রেনারকে জিগেস কোরো, বাড়ির বউদের খবর ও আমার চাইতে অনেক ভালো বলতে পারবে।'

'ওটা একটা আস্তো শয়তান!' দাঁতে দাঁত চেপে গ্রেবার চাপা গর্জন করে উঠলো।

জাউয়ের ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো।

ছাব্বিশ

ওরা এখন কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। শুধু আন্দাজে শিরস্ত্রাণ দেখে কিংবা ভাষা শুনে বুঝে নিচ্ছে ওরা ওদের দলের সৈনিক কিনা। ট্রেঞ্চগুলো অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। সিমেন্টের ঢালাই-করা গোপন আশ্রয়গুলো বুলেটে বুলেটে ক্ষতবিক্ষত। প্রতিমুহূর্তে সৈনিকদের এক আড়াল থেকে আর

এক আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। দীর্ঘ, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কেবল বৃষ্টি, তুমুল রলোরোল, রাত্রির অন্ধকার আর বিস্ফোরণের আলোয় ছিটকে-ওঠা কাদার ফোয়ারা ছাড়া কোথাও আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝড়ে আকাশ যেন নেমে এসেছে অনেক নিচে আর তারাদের অসীম শূন্যতা থেকে বৃষ্টিপাতের মতো অঝোরে ঝরে পড়ছে বোমা, কামানের গোলাগুলি

বোমারু বিমানের সন্ধানে ঘুরে মরা তীব্র আলোর রেখাগুলো মেঘকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে বিমান-বিধ্বংসী কামানের একটানা ক্রুদ্ধ গর্জন। গুলি খেয়ে জ্বলন্ত বিমানগুলো শিকারী বাজের মতো পাক খেয়ে খেয়ে নেমে আসছে নিচে আর অনিশ্চিত শূন্যে প্যারাসুটগুলো দুলছে যেন অতল জলের গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে। মেশিনগানের ঝাঁক-ঝাঁক গুলি ধেয়ে যাচ্ছে প্যারাসুটগুলোকে লক্ষ্য করে।

বারোদিন সমানে একটানা লড়াই চলেছে। প্রথম তিনদিন সীমান্তের কোন হেরফের হয়নি। শজারুর বাসার মতো ছোট বাঙ্কারগুলো কামানের গোলাতেও অক্ষত ছিলো। কিন্তু যেদিন থেকে রাশিয়ান সাঁজোয়া বাহিনীর মুখে ভেঙে গেলো দুর্জয় অবরোধ, সেদিন থেকেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো সীমান্তরেখা। ওরা মাত্র কয়েক কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশ করে আবার আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ফিরে গেলো। পরের দিন ভোরের আলোয় দেখা গেলো কয়েকটা ট্যাঙ্ক তখনও জ্বলছে, একটা ট্যাঙ্ক বিশালতম দৈত্যাকার গুবরে পোকার মতো সম্পূর্ণ উলটে রয়েছে। সামরিক শ্রমিকদের জোর করে পাঠানো হলো রাস্তা তৈরি আর টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার কাজে। দু ঘণ্টার মধ্যে ওদের অর্ধেকেরও বেশি মারা গেলো খোলা মাঠে, আত্মরক্ষার কোন অবকাশই পেলো না। তার পর থেকে খুব নিচু দিয়ে উড়ে-আসা বোমারু বিমানগুলো আক্রমণ চালিয়ে ছোট ছোট বাঙ্কারগুলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিলো। ছ'দিনের দিন ওগুলোকে আড়াল ছাড়া আর কোন কাজেই ব্যবহার করা গেলো না। সপ্তম দিনের রাত্তির থেকে রাশিয়ানরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো। আর তখন থেকেই মুষলধারে শুরু হলো অবিরাম বৃষ্টিপাত। যেন প্রলয়ঙ্কর মহাপ্লাবনে পৃথিবী আবার ভেসে যাবে। সৈনিকরা পরস্পরকে চিনতে পারছে না। ঘন কাদার মধ্যে বুকে-হেঁটে-বেড়ানো সরীসৃপের মতো ওদের আত্মরক্ষার রঙটা কাদায় মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ওদের সৈন্যবাহিনী এখন অবস্থান করছে দুটো ভাঙা বাড়িতে—একটাতে কম্যাণ্ডার রায়ে, অন্যটাতে লেফটেনান্ট

মাস। অবরোধ বলতে কয়েকটা মেশিনগান আর বোমানিক্ষেপকারী কয়েকজন সৈনিক।

একইভাবে তিনদিন কেটে গেলো। ওদের সামরিক সম্ভার বলতে এখন আর কিছুই নেই। রাশিয়ানরা যদি শুধু এগিয়ে আসতো তাহলেই যথেষ্ট। কিন্তু কোথাও কোন আক্রমণ ঘটলো না। পরের দিন বিকেলের মুখে ছুটো জার্মান বিমান এসে সামরিক অস্ত্রসম্ভার আর খাদ্যসামগ্রী দিয়ে গেলো। সেই দিনই ঢালাইয়ের সাজসরঞ্জাম সব এসে পৌঁছলো এবং সারা রাত জেগে রাস্তা মেরামতের কাজ চললো। কিন্তু শেষ রাত্রে হঠাৎ-আক্রমণে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। কোথাও কোন প্রস্তুতি নেই, সাঁজোয়ার যান্ত্রিক শব্দ নেই—সহসা অবরোধ রেখার প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, ফিকে আঁধারে কারা যেন মাটি ফুঁড়ে ঠেলে উঠলো এবং হাতবোমাগুলো দ্রুত ছুঁড়ে দিলো।

বিস্ফোরণের চোখ-ঝলসানো আলোয় গ্রেবার চকিতে দেখলো ওর পাশেই শিরস্ত্রাণের নিচে বিস্ফারিত ছুটো চোখ, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। গ্রেবার এক ঝটকায় তরুণ রঙরুটের হাত থেকে হাতবোমাটা ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত ছুঁড়ে দিলো। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠলো সারা আকাশ। 'এভাবে কেউ স্ক্রু খোলে না, বোকা হাঁদারাম!' গ্রেবার ওকে ধমক দিলো। 'এদিকে ছাখো—এইভাবে শুধু আলগা করে নেবে, কখনও টেনে আনবে না।'

ঠিক তখনই ওদের দিকে সোজাসুজি একটা রাশিয়ান হাতবোমা ছুটে আসতে দেখে গ্রেবারের বুক কেঁপে উঠলো, এক লহমায় মনে পড়লো মৃত্যুর কুৎসিত মুখটা। চোখের পলক পড়ার আগেই আর একটা হাতবোমা ছুঁড়ে দিয়ে ও কাদার মধ্যে টুপ করে ডুবে পড়লো। সেই মুহূর্তে অনুভব করলো বিস্ফোরণের তীব্র আলোড়ন, চাবুকের তীক্ষ্ণ স্বননে কে যেন ওকে ঠেসে ধরলো কাদার মধ্যে। কোনরকমে নিজেকে মুক্ত করে ও সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিলো ডানদিকে। 'দেখি, এদিকে একটা দাও! শীগগির!' কিন্তু কাউকে উত্তর না দিতে দেখে ও ঘাড় ফেরালো, দেখলো আশেপাশে তরুণ রঙরুটের কোন চিহ্ন নেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে এখান থেকে না পালালেই নয়। গ্রেবার সন্তর্পণে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। প্রথমে খানিকক্ষণ চুপচাপ কুমীরের মতো পড়ে রইলো, তারপর কাদার মধ্যে বুকে হেঁটে আরও খানিকটা পেছিয়ে এলো। প্রোজ্জ্বলিত প্যারাসুটের আলোয় দেখলো তরুণ রঙরুটের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। বোমাটা সম্ভবত সরাসরি আঘাত করেছে ওর বুকে। আশ্চর্য, বোমাটা

তো ওকেও আঘাত করতে পারতো ! সব মিলিয়ে মনটা ওর ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো।

অন্য একটা গর্তের সমান্তরালে মাথাটা রেখে গ্রেবার নিঃসাড়ে পড়ে রইলো। এখন দুদিক থেকেই মেশিনগানের গুলিবিনিময় চলছে। গ্রেবার ভাবলো এই অবস্থায় এখানে থাকাটা বিপজ্জনক, যেভাবেই হোক অবরোধের ওপারে আশ্রয় নিতে হবে। মাথাটা যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টি অর্ধেক ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু মনের গহনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে অন্য আর একটা মুখ, সমুদ্র-ঝিনুকের মতো আয়ত স্বচ্ছ দুটো চোখ।

এক গর্ত থেকে আর এক গর্ত গ্রেবার বুকে হেঁটে পেরিয়ে চললো। পরের গর্তে দুজন মৃত সৈনিক পড়ে রয়েছে। গ্রেবার এখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো। অদূরে শুনলো রাশিয়ানদের ছোঁড়া একটা হাতবোমার শব্দ। গ্রেবার দেখলো ওরা এখন দুদিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে। আর এদিক থেকে সমানে চলেছে মেশিনগানের অগ্ন্যুদ্গার। বেশ কিছুক্ষণ পরে হাতবোমার শব্দ আর শোনা গেলো না, কিন্তু এ পক্ষের মেশিনগানের শব্দ তখনও কানে তালা লাগিয়ে চলেছে। গ্রেবার এগিয়ে চললো। ও জানে রাশিয়ানরা আবার ফিরে আসবে। এখন আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। একটু পরে থেমে গেলো মেশিনগানের শব্দ, আর তারপরেই ভারি একটা কামানের গোলায় থরথর করে কেঁপে উঠলো আকাশ। অবরোধ-বাড়ির একটা অংশ সোজা ছিটকে লাফিয়ে উঠলো শূন্যে। রক্ত-মেঘ ছিঁড়ে বিষণ্ণ একটা প্রভাত এলো।

ভোরের প্রথম আলো ফুটে ওঠার আগেই গ্রেবার পালিয়ে আসার সুযোগ পেলো। আসার পথে সাউয়ের এবং দুজন রংরুটের সঙ্গে দেখা হলো। সাউয়েরের নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। দুজন রংরুটের একজনের পেটটা হাঁ হয়ে গেছে। নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসেছে। তার ওপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো টুপটাপ ঝরে পড়ছে। কারুর কাছে বাঁধার মতো কিচ্ছু নেই। তাছাড়া, এখন আর সে সময়ও নেই। যত তাড়াতাড়ি মারা যায় ততই ভালো। দ্বিতীয় রংরুটের একটা পা ভেঙে গেছে। গ্রেবার বুঝতেই পারলো না নরম কাদার মধ্যে কি করে ওর পাটা ভাঙলো। অদূরে একটা ট্যাঙ্ক জ্বলছে, মাঝখানটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এখন ওটাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন বিশালকায় জন্তুর ভাঙা পাঁজরের মতো

মনে হচ্ছে। ওপাশে একজন মৃত সৈনিক পড়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ মুখটা ওর পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কেবল ভোরের আলোয় ঝকঝক করছে ওর সাদা দাঁতগুলো।

এবার বাঁদিকের গোপন-আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এলেন একজন যোগাযোগকারী অফিসার। 'অবরোধের ওপারে সবাই মিলিত হও।' ভাঙা ভাঙা গলায় গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে উনি জিগেস করলেন, 'অন্যরা সব কোথায় ?'

'ঠিক বলতে পারবো না।'

'কতজন মারা গ্যাছে কিছু জানো ?'

'না।'

সাউয়ের জিগেস করলো, 'আমাদের ওষুধপত্তর কিছু আছে ?'

'থাকতেও পারে।'

অফিসার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন।

'আমরা তোমার জন্যে ওষুধ নিয়ে এক্ষুনি আবার ফিরে আসছি,' গ্রেবার নাড়িভুঁড়ি-বেরিয়ে-আসা সৈনিকটিকে বললো। 'তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্যাণ্ডেজ না করলে নিয়ে যাওয়াও যাবে না।'

রঙরুট কোন উত্তর দিলো না, কেবল ম্লান করুণ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো। মৃদু নড়ে উঠলো যন্ত্রণায় নীল-হয়ে-আসা ওর শীর্ণ ঠোঁট-দুটো। গ্রেবার এবার দৃষ্টি ফেরালো পা-ভাঙা রঙরুটের দিকে। 'আমাদের দুজনের কাঁধে ভর রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার চেষ্টা করো।'

ওকে মাঝখানে নিয়ে সন্তর্পণে খানাখন্দ এড়িয়ে ওরা এগিয়ে চললো। ঘাঁটিতে এসে পৌঁছতে অনেকটা সময় লাগলো। ওকে নামিয়ে দিতেই তরুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো। গ্রেবার ওকে টেনে ভাঙা একটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে রাখলো। ওর শিরস্ত্রাণটা খুলে রাখলো দেওয়ালের ওপর, যাতে সহজে ওকে নজরে পড়ে। ওর ঠিক পাশেই পড়ে রয়েছে দুজন রাশিয়ান সৈনিকের মৃতদেহ।

ওদের নিজেদের যে-কটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকজন রাশিয়ান সৈনিকও ছিলো। কম্যাণ্ডার রায়ে আঘাত পেয়েছেন। ওঁর বাঁ হাতে বড় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অন্য তিনজন আহত সৈনিককে ক্যানভাসের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। ঘণ্টাখানেক পরে একটা জাংকার বিমান এসে ওষুধপত্তরের কয়েকটা মোড়ক ফেলে দিয়ে গেলো। তার

অর্ধেক পড়লো অনেক দূরে রাশিয়ানদের নাগালের মধ্যে। বাকি অর্ধকে কোনরকমে উদ্ধার করা হলো।

এবার সাতজন সৈনিক এসে পৌঁছলো। কবর থেকে উঠে-আসা মানুষের মতো সর্বাঙ্গে কাদামাখা। আরও কয়েকটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বিধ্বস্ত একটা বাংকারের নিচে থেকে। লেফটেনাণ্ট মাস মারা গেছেন। যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে সার্জেণ্ট-মেজর রাইনেকের ওপর। অস্ত্রশস্ত্রও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। দুটো ভারি আর দুটো হালকা ধরনের মেশিনগান তখনও কেবল সক্রিয় রয়েছে।

এবার শব-উদ্ধারকারীর একটা দল কিছু সামরিক সম্ভার এবং টিনের খাবার নিয়ে এসে পৌঁছলো। সঙ্গে আনা স্ট্রেচারে করে ওরা আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিলো। কিন্তু একশো গজ যেতে না যেতেই ভারি একটা কামানের গোলায় অ্যাম্বুলেন্সটা সোজা ছিটকে উঠলো শূন্যে এবং চোখের নিমিষে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

দুপুরের দিকে বৃষ্টি ধরে এলো। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে এবার সূর্য দেখা গেলো আর তখনই শুরু হলো একটা গুমসনি গরম। কম্যাণ্ডার রায়ে বিমর্ষ চোখে আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। 'ওরা এবার হালকা ধরনের ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ চালাবে বলে মনে হচ্ছে। চুলোয় যাকগে, আমাদের ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানগুলোকে আগে থেকে প্রস্তুত রাখতে বলো।'

সমানে যুদ্ধ চললো। বিকেলের দিকে আর একটা জাংকার বিমান পণ্য-সম্ভার নিয়ে এলো। ওর চারদিকে ঘিরে রয়েছে একঝাঁক মেসারম্‌সমিটস্ বোমারু বিমান। জাংকার বিমানটাকে এবার একলা ফেলে বোমারু বিমান-গুলো দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং রাশিয়ানদের ওপর বেপরোয়া বোমা বর্ষণ করে আবার ফিরে এলো। যাওয়া এবং আসার ফাঁকে রাশিয়ানরা চারটে বোমারু বিমানকে ভূপাতিত করলো। বাকিগুলো পালিয়ে গেলো। রাশিয়ান বিমানের তুলনায় মেসারম্‌সমিটস্ বোমারু বিমানগুলো অনেক বড এবং দ্রুতগামী।

পরের দিন সকালে মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করলো। লেফটেনাণ্ট রাইনেকে যখন সবাইকে সমবেত করলেন, দেখা গেলো মাত্র বিয়াল্লিশজন তখনও বেঁচে রয়েছে। বাকি সবাই হয় মৃত, না হয় আহত। এবং ওদের সংখ্যা একশো কুড়িরও বেশি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর গ্রেবার তার রাইফেলটা নিয়ে বসলো।

নলটা কাদায় ঠেসে গেছে, ভালো করে পরিষ্কার করা দরকার। এখন ও আর কিছুই ভাবলো না, এমনকি পুরনো দিনের স্মৃতিও না। যন্ত্রের মতো কেবল কাজ করে গেলো। রাইফেলটা পরিষ্কার করার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ও খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। তারপর ঘুমলো, আবার জেগে উঠলো এবং নিজের আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলো।

পরের দিন ভোরের আগেই রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলো আক্রমণ শুরু করলো। সম্ভবত আগের রাত থেকেই ওরা কামান, মেশিনগান দিয়ে একটা অর্ধ-বৃত্ত রচনা করে রেখেছিলো। টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা যতবার পুনরুদ্ধার করেছে ততবারই ওরা নষ্ট করে দিয়েছে। জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী এখন অত্যন্ত দুর্বল। অন্যদিকে রাশিয়ান .গোলন্দাজবাহিনী মরিয়া হয়ে সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সরাসরি দু বার আঘাত পাবার পরেও বাংকারটা টিঁকে ছিলো, কিন্তু ওটাকে এখন আর আদৌ অবরোধ বলা চলে না। ঝড়ের মুখে জাহাজের মতো দেওয়ালটা দুলছে।

গ্রেবার তার কাঁধের ক্ষতটা বেঁধে নেবার কোন সুযোগই পেলো না। পকেট থেকে কনিয়াকের চ্যাপ্টা বোতলটা বার করে ঢকঢক করে খানিকটা ঢেলে দিলো গলায়। প্রচণ্ড আঘাতে বাংকারটা আর একবার থরথর করে কেঁপে উঠলো। গোড়া থেকে বেশ খানিকটা চড়চড় করে ফেটে গেলো। এখন আর ওটাকে ঝড়ের মুখে জাহাজের মতোও মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গশীর্ষ-লাফানো ছোট্ট একটা নৌকোর মতো। ভোরের আবছা আঁধারে সৈনিকরা যে যার জায়গায় অপেক্ষা করে রয়েছে। গ্রেবারের একবারও মনে হলো না কয়েকদিন আগেও ও ছুটিতে ছিলো, দিন-পনেরো আগেও ও জার্মানির কোন শহরে কাটিয়ে এসেছে। এলিজাবেথের কথা এখন আর ওর মনে পড়লো না। বুক-কাঁপানো আওয়াজ আর আকাশে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গকণায়, আধো-ঘুম আর আধো-জাগরণের মধ্যে সবকিছু ওর কাছে এখন আদিম মৃত্যু-স্বপ্নের মতো মনে হলো।

হালকা রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলো দ্রুত এগিয়ে এলো, তার দু পাশে পদাতিক সৈন্যবাহিনী। জার্মান সৈন্যবাহিনী ট্যাঙ্কগুলোকে এগিয়ে আসতে দিয়ে পদাতিক সেনাদের আক্রমণ করলো। দু'পক্ষ থেকে সামনে চললো মেশিনগানের গুলি-বিনিময়। ট্যাঙ্কগুলো কামানের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ার পর, ওগুলো লক্ষ্য করে গুলি চালানো হলো। এবার রাশিয়ান

ট্যাঙ্কগুলোও গর্জে উঠলো। সম্ভবত গর্তে পড়ে দুটো ট্যাঙ্ক অকেজো হয়ে গেলো। বাকিগুলো এগিয়ে এলো। আত্মরক্ষার কোনরকম সুযোগ না নিয়ে ওরা সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো জার্মানবাহিনীর ওপর। তাছাড়া মেশিনগানের তুলনায় ওদের সাঁজোয়া দুর্ভেদ্যও বলা যায়। সংকীর্ণ ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঠিকমতো গুলি করতে না পারলে ওগুলোকে বাধা দেওয়া অসম্ভব। অপূর্ব কৌশলে দুটো ট্যাঙ্ক এখন দ্রুত ধেয়ে আসছে এবং গোলাবর্ষণ করছে। আকাশ-বিদীর্ণ-করা প্রচণ্ড শব্দে বাংকারটা আর একবার থরথর করে কেঁপে উঠলো, তারপরেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো মাটিতে।

'গ্রেনেডগুলো এদিকে দাও!' রাইনেকে চিৎকার করে বললেন। তারপর তারের সঙ্গে মালার মতো বাঁধা কয়েকটা হাতবোমা কাঁধে ঝুলিয়ে উনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। দেখা গেলো প্রায় বুকে হেঁটে উনি ট্যাঙ্কগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং অসীম সাহসে গ্রেনেডের সাহায্যে ট্যাঙ্কদুটোকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

কম্যাণ্ডার রায়ে এবার ভারি মেশিনগান দিয়ে ট্যাঙ্কদুটোকে আক্রমণ করার আদেশ দিলেন। লেফটেনাণ্ট রাইনেকের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে এবার ভারি মেশিনগানদুটো গর্জন করে উঠলো।

একটু পরেই বিশাল দানবদুটোর একটা হঠাৎ থেমে গেলো। 'চমৎকার!' ইম্মেরমানের দিকে তাকিয়ে কম্যাণ্ডার রায়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন। সত্যি, লক্ষ্যভেদের এ নিপুণতায় ইম্মেরমানের সঙ্গে কারুর তুলনাই হয় না। এখন ওকে দেখে মনে হলো না—ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, ও যেন এখন নিজের আত্মরক্ষায় ব্যস্ত কোন উন্মত্ত পশু।

মেশিনগানের মুখ এবার দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য স্থির করলো। কিন্তু ট্যাঙ্কটা ঘুরে দ্রুত মেশিনগানের গুলির আওতার বাইরে চলে গেলো।

'যদিও ওরা আবার ফিরে আসবে, তবু মোট ছটা ট্যাঙ্ককে আমরা বিধ্বস্ত করতে পেরেছি।' কম্যাণ্ডার রায়ে আদেশ দিলেন, 'এবার পদাতিক সৈন্যদের আক্রমণ করো।'

হাঁফ ছাড়ার মতো একটু অবকাশ পেতেই ইম্মেরমান জিজ্ঞেস করলো, 'রাইনেকে কোথায়?'

কেউ কোন উত্তর দিলো না। রাইনেকে আর ফিরলেন না।

সারা বিকেল ধরে চললো তুমুল লড়াই। অন্যান্য অবরোধগুলো ভেঙে

চুরমার হয়ে গেছে। তবু গোলাগুলির বিরাম নেই। ওদের অস্ত্রশস্ত্র আর খুব সামান্যই রয়েছে এবং এখন অত্যন্ত হিসেব করে খরচ করতে হচ্ছে। তাছাড়া সৈনিকরা পরিশ্রান্ত। ওরা পালা করে টিনের খাবার খেলো, গর্তে-জমা বৃষ্টির জল পান করলো। রাশিয়ান একটা বুলেট হির্শলাণ্ডের বাঁ হাতটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে চলে গেছে।

বেলাশেষের সূর্যটা মাথার ওপরে গনগন করছে। রক্তমেঘে-মেঘে পশ্চিমের আকাশটা এখন মনে হচ্ছে বিশাল। বাতাসে থমথম করছে বারুদের গন্ধ আর বাংকারের আশেপাশে চাপ চাপ মানুষের রক্ত। বাইরের মৃতদেহগুলো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

সন্ধ্যের দিকে আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে উঠলো। তারপর হঠাৎ করেই একসময় থেমে গেলো। ওরা প্রতিমুহূর্তেই নতুন আক্রমণের জন্যে প্রতীক্ষা করে রইলো। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আর নতুন কোন আক্রমণ ঘটলো না। এই দু ঘণ্টার নিস্তব্ধতা যেন ওদের গিলতে এলো, ওদের কাছে মনে হলো এই নিস্তব্ধতা যেন যুদ্ধের চেয়ে আরও ভয়াবহ।

রাশিয়ানরা আবার যখন আক্রমণ শুরু করলো, ওদের সেনাবাহিনীর আর দুটো মাত্র মেশিনগান তখন অবশিষ্ট রয়েছে। তাই দিয়েই ওরা আত্মরক্ষা করলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। বিকেলের আগেই ওরা দ্বিতীয় অবরোধে পেছিয়ে এসেছিলো, তীব্র আক্রমণের মুখে এবার বুঝি তাও আর টিঁকবে না। মেশিনগানের একটা গুলি সাউয়েরের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই ও মারা গেলো।

অদূরে গুঁড়ি মেরে ফিরে আসার সময় হির্শলাণ্ড হঠাৎ ছিটকে লাফিয়ে উঠলো। তারপর একপাক ঘুরে, ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেলো। গ্রেবার ওকে টেনে নিয়ে এলো অবরোধের এপারে, দেখলো বুলেটে বুকটা বিদীর্ণ হয়ে গেছে। পকেটের কাগজপত্র সব রক্তে ভিজে জবজব করছে। গ্রেবার মনে মনে ভাবলো ভালোই হলো, ওর মাকে আর নতুন করে মৃত্যু-সংবাদ জানাবার দরকার হবে না।

শেষ রাত্রে ওরা যুদ্ধঘাঁটি ছেড়ে পিছু হটে আসতে বাধ্য হলো। আদেশ যখন এসে পৌঁছলো, ছজন ইতিমধ্যেই মারা গেছে, তিনজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। আহতদের একজন আবার মাঝপথেই মারা গেলো।

কয়েক কিলোমিটার দূরে বিশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীকে যখন একত্রিত করা হলো, দেখা গেলো মাত্র ত্রিশজন বেঁচে রয়েছে। পরের দিন নতুন রিক্রুট নিয়ে সৈন্যবাহিনীকে আবার একশো কুড়িতে পূর্ণ করা হলো।

খবর পেয়ে গ্রেবার ফ্রেজেনবুর্গকে দেখতে গেলো। অস্থায়ী একটা তাঁবুকে হাসপাতাল হিসেবে আপাতত ব্যবহার করা হচ্ছে। ফ্রেজেনবুর্গের বাঁ পাটা জখম হয়েছে।

'ওরা তো পাটাকে কেটে বাদ দিতে চাইছে। যত সব হাতুড়ে ডাক্তার, কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসাই জানে না।' ফ্রেজেনবুর্গের শুকনো ঠোঁটে ফুটে উঠলো তিক্ত একটা হাসির রেখা। 'আমি অবশ্য শহরের হাসপাতালে যাবার একটা ব্যবস্থা করেছি। অভিজ্ঞ কোন ডাক্তারকে আমি পাটা আগে দেখাতে চাই।'

খোলা জানলার সামনে দড়ির খাটিয়ায় ও শুয়েছিলো। কম্যাণ্ডারের সামরিক কোটটা ভাঁজ করে রাখা রয়েছে জখমি পায়ের নিচে। খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ে এক চিলতে সবুজ মাঠ, দূরে দিগন্তের গায়ে যেন ঢালু হয়ে মিশে গেছে। থোকা থোকা লাল হলুদ সাদা বুনো ফুল ফুটে রয়েছে এখানে-ওখানে। তাঁবুটা ছোট। অন্য আর দুটো খাটিয়া রয়েছে উলটো দিকের জানলার পাশে।

ফ্রেজেনবুর্গ জিজ্ঞেস করলো, 'রায়ের কি খবর?'

'গুলি বিঁধে হাতে বেশ চোট পেয়েছেন।'

'হাসপাতালে আছে?'

'না, সেনাবাহিনীতেই রয়েছেন।'

'খুব স্বাভাবিক,' ফ্রেজেনবুর্গ আবার শুকনো ঠোঁটে ম্লান হাসলো। 'অনেকেই সাধারণত ফিরে যেতে চায় না। এবং রায়েও যে ফিরে যাবে না, আমি এরকম আশা করেছিলাম।'

'কেন?'

'ওর বিশ্বাস ও হারিয়ে ফেলেছে। এখন আর কোন আশা নেই।'

বিবর্ণ-হয়ে-আসা ওর মুখের দিকে গ্রেবার কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আর তুমি?'

'জানি না। পাটার ব্যবস্থা সবার আগে করতে হবে।'

মাঠের দিক থেকে বয়ে এলো একঝলক তপ্ত বাতাস। 'সত্যি, ভাবতে অবাক লাগে, তাই না?' ফ্রেজেনবুর্গ আবার শুকনো ঠোঁটে হাসলো। 'যখন দিনের পর দিন তুষার জমে পাহাড় হয়ে উঠলো, তখন কেউ ভাবতেও পারেনি এ দেশে আবার কোনদিন গ্রীষ্ম আসবে। তার পরে হঠাৎ করেই একদিন গ্রীষ্ম এলো।'

'কি বলতে চাইছো?'

'কিছু না।' একটু বিরতির পর ফ্রেজেনবুর্গ জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর বাড়ির খবর কি ?'

গ্রেবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'জানি না। বাড়ি আর এখানের এই রণাঙ্গনের মধ্যে আমি এখনও পর্যন্ত কোন যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারিনি, মনে হয় ছুটির আগে বোধহয় পারতাম, এখন আর পারছি না। এখন মনে হচ্ছে সবকিছুই কেমন যেন দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রকৃত বাস্তব যা তাকে যেন আর কিছুতেই চিনতে পারছি না।'

'এই পরিস্থিতির মধ্যে বাস্তবকে চিনে নেওয়া অত সহজ নয়।'

'অথচ আগে মনে হতো একদিন আমি তাকে ঠিক চিনতে পারবো। ফিরে আসার পর ভেবেছিলাম আমি আর মানুষ খুন করবো না।'

'অনেকেই সে কথা ভাবে।' যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠলো ফ্রেজেনবুর্গের সারা মুখ।

'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

ফ্রেজেনবুর্গ মাথা নাড়লো। 'ও কিছু নয়। মরফিন ইনজেকশন দিয়েছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রণা কমে যাবে। হয়তো ঘুমিয়ে পড়বো···তার আগে ঘণ্টাখানেক ভেবে নিতে চাই।'

'তুমি কিসে যাবে কিছু ঠিক করেছো ?'

'অ্যাম্বুলেন্স এসে এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবে।'

'কবে ?'

'কাল।'

'তাহলে তো খুব শীগগির আমাদের আর দেখা হচ্ছে না ?'

ফ্রেজেনবুর্গ ম্লান হাসলো। 'না না, তালিতুলি দিয়ে দেখবে ওরা ঠিক আমাকে আবার এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো। দুজনেই জানে কথাটা সত্যি নয়।

গ্রেবার জিজ্ঞেস করলো, 'পরে কি করবে, কিছু ঠিক করেছো ?'

'অন্যেরা আমাকে নিয়ে কি করবে এখনও পর্যন্ত আমি তাই-ই জানি না। আগে সেইটে খুঁজে পেতে হবে। আমি কখনও ভাবিনি আমার শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি হবে। আমার বরাবরই ধারণা ছিলো আমি সরাসরি ওদের হাতে ধরা পড়বো। এখন অর্ধেক ধরা পড়লাম। বুঝতে পারছি না ভবিষ্যতে এর কী মূল্য দিতে হবে।' ফ্রেজেনবুর্গ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এখন আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে, এর্নস্ট। আমার পাটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, আমি খোঁড়া হয়ে গেছি—এটা বুঝতে পারার আগে আমি একটু ভালো করে ঘুমিয়ে নিতে চাই।'

'আমি তাহলে যাই, লুডভিগ।' গ্রেবার তার হাতটা ফ্রেজেনবুর্গের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

'নিজের ওপর সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রেখো, এর্নস্ট।'

'নিশ্চয়ই। তুমিও তোমার শরীরের যত্ন নিও।'

ফ্রেজেনবুর্গ কোনরকমে তার ক্লান্ত ম্লান চোখদুটো মেলে রাখার চেষ্টা করলো। 'জীবনের আদিম আকস্মিকতার স্রোতে আমি ভাসছি, এর্নস্ট। আগে অন্যরকম ভাবতাম। কিন্তু এখন মনে হয় সেও বুঝি প্রবঞ্চনা। তখন আমাদের একবারও মনে হয়নি এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরাও লড়তে পারতাম এবং সে শক্তির সঞ্চয় ছিলো আমাদেরই বুকের মধ্যে।'

গ্রেবার এবার চমকে উঠলো। ওর মনে হলো বুকের মধ্যে কি যেন একটা দপ করে জ্বলে উঠলো। এই একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যে ও যেন সারাজীবন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, অথচ কোথাও পায়নি। একমাত্র যিনি দিতে পারতেন, সেই শান্ত সৌম্য অশীতিপর বৃদ্ধ হের পোলমান, যিনি এখন বন্দীশিবিরের গাঢ় অন্ধকারে বসে দিন গুনছেন। ওঁর জন্যে হঠাৎ গ্রেবারের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। তবু মনের অন্য প্রান্ত থেকে একটা শিখা যেন দীপ্ত আলোকিত হয়ে উঠছে। গ্রেবার এতক্ষণ স্থির চোখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলো, এবার ফ্রেজেনবুর্গের মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো।

'হ্যাঁ এর্নস্ট, এখনও সময় আছে। এখনও আমরা চেষ্টা করতে পারি যাতে এমন ঘটনা আর কখনও না ঘটে। তার জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, যদি আর একবার সুযোগ পাই—আমি আমার রাইফেলটা আবার তুলে নেবো শক্ত হাতের মুঠোয়।'

চোখ বন্ধ করে মাথাটা ও পেছন দিকে হেলিয়ে দিলো। গ্রেবার খানিকক্ষণ ওর মাথার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর মন্থর পায়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বাইরে এলো।

গ্রেবার তার ঘাঁটির দিকে ফিরে চললো। মাথার ওপরে সীমাহীন নীলিম আকাশ। পশ্চিমের দিগন্ত সূর্যাস্তের আলোয় রাঙা হয়ে রয়েছে, পূবের আকাশ কেঁপে উঠছে নিনাদিত কামানের গুরুগুরু গর্জনে। তার পর থেকে আর বৃষ্টি হয়নি। কাদা এখন শুকতে শুরু করেছে। মাঠের এদিকটায় ফুটে রয়েছে নাম-না-জানা অজস্র বুনো ফুল। হঠাৎ ওর কাছে

সবকিছু কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো, মনে হলো সব যোগসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে গেছে। এই অনুভূতিটাকে গ্রেবার চিনতে পারলো। মাঝরাতে যখনই আচমকা ঘুম ভেঙে গেছে আর জেগে উঠে বুঝতে পারেনি ও এখন কোথায় রয়েছে, তখনই রাত্রির নিঃসঙ্গতায় এই তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাকে কাঁদিয়ে দিয়ে গেছে। তার সঙ্গে ও আপ্রাণ সংগ্রাম করেছে, প্রতিবারেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আলো আছে। পথ খুঁজে পাবার জন্যে যতবারই আলোক-শিখাটাকে ও তুলে ধরেছে, ততবারই আলেয়ার মতো ওটা কেবলই দূরে দূরে সরে গেছে।

আর এখন, হঠাৎ করেই আবার শুকনো কাদায় ফুটে-ওঠা বুনো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো—না, অন্তহীন দুঃখ-হতাশার বিস্তীর্ণ বন্ধ্যাভূমিতে ও ওর ব্যক্তিজীবনের সুখকে বড় করে দেখবে না। এই তো এলিজাবেথের চিঠি একমুঠো কোমল ভালবাসার কবোষ্ণ উত্তাপ নিয়ে এখনও আমার পকেটে রয়েছে। তাহলে কেন ভাববো ওকে আমি চিরজন্মের মতো হারিয়ে এসেছি! ওর চিঠি আমি পেয়েছি। ও এখনও বেঁচে আছে। এর বেশি আপাতত আমি আর কিছু চাই না। জোসেফের কথাটা ও এখন স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো—কেউ যখন বিপন্ন, অস্তিত্বের প্রহেলিকা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চুলচেরা বিচারের আগে নিজেকে বাঁচাতে হবে। হ্যাঁ, আমি আগে নিজেকে বাঁচাবো, তারপর দেখবো শক্ত মুঠোয় রাইফেলটা তুলে নিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় কিনা।

ঘাটির কাছাকাছি এসে পৌঁছতে গ্রেবার দেখলো—অনেকটা জায়গা জুড়ে বার্চ গাছে ঘেরা পরিত্যক্ত একটা রম্য উদ্যান, ভেতরে অর্ধেক ভাঙা একটা সাদা বাড়ি। ফটকের সামনে স্বর্ণচাঁপা ফুলগুলো মৃদুল হাওয়ায় দুলছে। ভেতরে ফোয়ারার সামনে পরিত্যক্ত একটা পাথরের প্রতিমূর্তি। দুজন তরুণ রংরুট করমচার ঝোপে কি যেন খুঁজছে।

সাতাশ

'নিশ্চয়ই গেরিলা।' রাশিয়ান বন্দীদের দিকে তাকিয়ে স্টেইনব্রেনার বললো। হালকা বাদামী রঙের স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো ওর চিকচিক করছে। বন্দী চারজনের মধ্যে দুজন পুরুষ আর দুজন নারী। নারীদের একজন আবার

তরুণী। নিটোল স্বাস্থ্য, মসৃণ গোল মুখ, ঢেউখেলানো একরাশ কালো চুল। আজকের ভোরের ট্রেনে ওদের এখানে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেবার বললো, 'এদের দেখে কিন্তু গেরিলা বলে মনে হচ্ছে না।'

'আলবৎ মনে হচ্ছে। তুমি কি করে বুঝলে এরা গেরিলা নয়?'

'দেখে। এদের দেখে মনে হচ্ছে গরীব চাষী।'

স্টেইনব্রেনার হাসলো। 'দেখেই যদি সবকিছু বোঝা যেতো, পৃথিবীতে তাহলে অপরাধী বলে কিছু থাকতো না।'

তা তো বটেই, গ্রেবার ভাবলো। তুমি নিজে তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

এমন সময় কম্যাণ্ডার রায়েকে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। 'কি ব্যাপার, তোমরা এখানে এদের নিয়ে কি করছো?' জটলা দেখে উনি থমকে দাঁড়ালেন।

'এই বন্দী চারজনকে আজ এখানে পাঠানো হয়েছে, স্যর।'

'আমি জানি।' কম্যাণ্ডার স্টেইনব্রেনারকে ধমক দিলেন, 'কিন্তু তুমি এখানে কি করছো?'

'আদেশ না আসা পর্যন্ত এদের কোথায় আটকে রাখা যায় তাই যুক্তি করছি।' নির্লজ্জ মিথ্যে কথাটা স্টেইনব্রেনার নির্বিবাদে চালিয়ে দিলো।

গ্রেবারের ইচ্ছে হলো ওর গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু তার আগেই দেখলো কম্যাণ্ডার রায়ের বিমর্ষ চোখদুটো যেন ওরই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

অস্ফুট স্বরে উনি বললেন, 'আমাদের হাতে এত সমস্যা, অথচ বারবার আমাদেরই সৈন্যবাহিনীর কাছে এদের পাঠানো হচ্ছে কেন আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না!'

'অসুবিধে কি, স্যর? এই সামনেই একটা বাগানবাড়ি রয়েছে। আমি দেখেছি, গ্যারেজে ওদের আটকে রাখতে কোন অসুবিধে হবে না।'

উত্তর দেবার মতো এতটা দুঃসাহস হবে, কম্যাণ্ডার রায়ে কল্পনাই করতে পারেননি। তাই তীক্ষ্ণ চোখে স্টেইনব্রেনারের মুখের দিকে তাকিয়ে উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। ও কি ভাবছে বুঝতে ওঁর কোন কষ্ট হলো না। অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ও বন্দীদের পালাতে বাধ্য করবে, তারপরেই ওরা আর কোনদিন এ পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না।

'গ্রেবার,' ছড়ি দিয়ে উনি বন্দীদের দেখিয়ে দিলেন। 'এদের দায়িত্ব তোমার ওপর রইলো। স্টেইনব্রেনার তোমাকে গ্যারেজটা দেখিয়ে দেবে। তুমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবে গ্যারেজ থেকে পালাবার কোনরকম

সুযোগ আছে কিনা, তারপর আমাকে জানাবে। মনে রেখো এদের সমস্ত দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার একার ওপর। যাও, দুজন রঙরুটকে নিয়ে তুমি এদের সঙ্গে যাও।'

বন্দীদের একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বৃদ্ধা বন্দিনীর শিরাবহুল শীর্ণ শরীর, চোখের নিচে শুকনো জলের দাগ। তরুণীর পায়ে জুতো নেই। ঘাঁটি ছেড়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে আসার পর স্টেইনব্রেনার তরুণ বন্দীকে ধাক্কা দিলো, 'এই শুয়োর, ছোট্!'

তরুণ ফ্যালফ্যাল করে ওর মুখের দিকে তাকালো। স্তব্ধ বাতাসকে চমকে দিয়ে স্টেইনব্রেনার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। তারপর হাতের ইঙ্গিতে ওকে বললো, 'তোকে মুক্তি দিলুম। যা, ছোট্ ছোট্।'

বয়স্ক বন্দী রাশিয়ান ভাষায় ওকে কি যেন বললো। তরুণ ছুটলো না। স্টেইনব্রেনার বুট দিয়ে ওর হাঁটুতে লাথি মারলো। 'ছোট্ শালা শুয়োরের বাচ্ছা, ছোট্!'

'থামো,' গ্রেবার বিরক্ত হলো। 'কম্যাণ্ডারের আদেশ শুনতে তুমি নিশ্চয়ই ভুল করোনি, ম্যাক্স?'

'আরে ধ্যাৎ, রাখো ওসব ছেঁদো আদেশ।' গ্রেবারের কানের কাছে মুখ এনে স্টেইনব্রেনার ফিসফিস করে বললো, 'বুনো শুয়োরদুটোকে আগে ছোটাও। তারপর গজ দশেক যখন যাবে, আমরা পেছন থেকে ওদের গুলি করে মারবো। বাকি দুটোকে গ্যারেজে আটকে রাখবো। রাত্তিরে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাবো মাঠের মধ্যে।'

'কি দরকার এসব ঝুটঝামেলার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে?'

'ঝুটঝামেলা! তুমি আবার এর মধ্যে ঝুটঝামেলার কি দেখলে দোস্ত্? হয় আমি, না হয় তুমি, না হয় সিকিউরিটি সার্ভিসের লোকেরা, কেউ না কেউ এদের তো একদিন গুলি করে মারতোই। তার আগে আমরা দুজনে বরং মেয়েটাকে ভালো করে ভোগ করে নিই।'

'না।'

'তোমার আর কি? সবে ছুটি থেকে ফিরেছো, অনেক মেয়েকেই রাত্তিরে নিয়ে শুয়েছো···'

'চুপ করো!' গ্রেবার অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার করে উঠলো। 'তোমাকে শুধু গ্যারেজটা দেখিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে, দেখিয়ে দাও।'

স্টেইনব্রেনার গুম হয়ে গেলো। খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর ওরা সেই পুরনো বাগানবাড়িটায় এসে পৌঁছলো। ফটক পেরিয়ে কাঁকর-বিছানো

পথ। সামনে পাথরের প্রতিমূর্তি, ডানদিকে করমচার ঝোপের আড়ালে একটা গ্যারেজ।

স্টেইনব্রেনার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো, 'এইটে।'

গ্রেবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। ছোট হলেও ঘরটা মজবুত। পাকা মেঝে। দরজার প্রতিটি লোহার শিক গ্রেবার টেনে টেনে দেখলো। নাঃ, পালানোর কোন সম্ভাবনা নেই। তবু কোন অস্ত্রশস্ত্র লুকনো আছে কিনা দেখার জন্যে প্রত্যেকের দেহ অনুসন্ধান করে দেখা হলো। স্টেইনব্রেনার নিজেই এ কাজের দায়িত্ব নিলো এবং তরুণীকে ও পরীক্ষা করে দেখলো সবচেয়ে ভালো করে।

গ্রেবার তালা দিয়ে তালাটা টেনে দেখলো।

স্টেইনব্রেনার হাসলো, 'বাঃ, ঠিক খাঁচায় পোরা বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে! এই বাঁদরি, কলা খাবি ?'

গ্রেবারের চোয়ালছুটো এবার কঠিন হয়ে উঠলো। তরুণ রংরুট ছুজনকে ও বললো, 'তোমরা ছুজনে এখানে পাহারায় থাকো। সাবধান, এদের যেন কোনরকম কিছু না হয়। কম্যাণ্ডার রায়ের আদেশ।'

'ঠিক আছে।' তরুণ ছুজন রাইফেল হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

'তোমরা কেউ জার্মান জানো ?' গ্রেবার রাশিয়ান বন্দীদের জিজ্ঞেস করলো।

বন্দীরা কেউ জবাব দিলো না।

গ্রেবার স্টেইনব্রেনারকে বললো, 'এসো। পরে এদের খড়ের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখতে হবে।'

স্টেইনব্রেনার এতক্ষণ লোহার শিক ধরে তরুণীর প্রতি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছিলো। এবার গ্রেবারের কথায় ফিরে তাকালো, উদগ্র কামনায় চকচক করে উঠলো চোখের মণিছুটো। 'আহা, খড়ে বেচারিদের কষ্ট হবে, তার চেয়ে তুমি বরং ওদের জন্যে ছুটো পালকের বিছনাই করে দিও।'

গ্রেবার দাঁতে দাঁত চাপলো। 'প্রয়োজন হলে তাই-ই দেবো।'

গ্রেবার ফিরে এসে কম্যাণ্ডার রায়েকে জানালো ঘরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং বন্দীরা নিজে থেকে পালাতে পারবে না। কম্যাণ্ডার বললেন, 'তবু তুমি নিজে ওদের দায়িত্ব নাও। আমার মনে হয় ছু-একদিনের মধ্যে রাশিয়ান সৈন্যরাই ওদের মুক্তি দিতে পারবে।'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'প্রয়োজন হলে আরও দুজন রংরুটকে সঙ্গে নিতে পারো।'

'দরকার হবে না, স্যর। আমি একাই পারবো।'

'খুব ভালো কথা, তাহলে তাই করো। আশা করি, তোমাকে এর বেশি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

'না, স্যর।'

কম্যাণ্ডার র‍্যায়ে বেরিয়ে গেলেন। গ্রেবারের মনে হলো কি এক অজানা অস্থিরতায় উনি যেন ছটফট করছেন।

ইম্মেরমান মুচকি মুচকি হাসলো। 'উনি শেষ পর্যন্ত তোমাকে কারারক্ষী করে ছাড়লেন?'

'রংরুটদের সামরিক কায়দাকানুন শেখানোর চাইতে এ বরং অনেক ভালো।'

'কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না গ্রেবার, রংরুটদের এখন শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়ার সময় কোথায়? রাশিয়ানরা চারদিক থেকে যেভাবে ঘূর্ণিঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে, আমরা তো খড়ের কুটোর মতো উড়ে যাবো। অন্তত গত কয়েক ঘণ্টায় ওদের আক্রমণের প্রচণ্ড তীব্রতা দেখে আমার তাই-ই মনে হচ্ছে। এখন এই মুহূর্তে অনেক দূরে পেছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

'অনেক দূর বলতে তুমি কি জার্মান সীমান্তের কথা বলছো?'

'ধরো তাই।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

'আমারও না।' ইম্মেরমান সতর্কভঙ্গিতে চারদিকে তাকালো। তারপর নিচু গলায় বললো, 'সত্যি বলতে কি এখন আর কোথাও পেছিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। এবং সরকার না চাইলে, তৃতীয়পক্ষ কেউ আসবে না এ যুদ্ধের মীমাংসা করতে।'

গ্রেবার কোন কথা বললো না। কথা বলতে ওর ইচ্ছেও করছিলো না। আসলে ওর মন পড়েছিলো বাগানবাড়িতে। কেননা তরুণ রংরুট দুজনের ভরসায় এত বড় দায়িত্ব ফেলে যাওয়া যায় না। তাছাড়া আর যাই হোক, স্টেইনব্রেনারকেও আদৌ বিশ্বাস করে না।

রোদের তেজ এখন কমে গেছে। বিকেলটা আশ্চর্য নির্জন আর থমথমে।

যদিও মুহুর্মুহু কামানের গর্জনে কেঁপে উঠছে দিগন্ত, তবু গ্রামের এদিকটা সত্যিই খুব নিরিবিলি। খড় এনে পৌঁছে দেবার পর তরুণ রংরুট তুজনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। গ্রেবার এবার বার্চ গাছে ঘেরা পরিত্যক্ত বাগান-বাড়ির চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখলো। ফটকের সামনেই একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ। কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখানে গোল বেদীর মতো খানিকটা ঘেরা, তার ওপর পাথরের একটা প্রতিমূর্তি। মূর্তিটা সম্ভবত কোন রাখাল বালকের, এখন আর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। পথের তু পাশে টানা সবুজ ঘাসের প্রান্তর, আগাছা আর বুনো ফুলের দৌরাত্ম্যে যার অনেকটাই এখন ভরে গেছে। ডানদিকে করমচার ঝোপ, বাঁদিকে ছাতার মতন গোল টালির ছাদওয়ালা একটা সৌখিন বসার জায়গা। রোদ ঝড় বৃষ্টিতে বেঞ্চির রঙ-গুলো চটে গেছে।

বাগানের তুলনায় বাড়িটা খুবই ছোট। পেছনদিকটা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। থামওয়ালা গাড়িবারান্দার নিচে দিয়ে গ্রেবার আবার গ্যারেজে ফিরে এলো।

বৃদ্ধা ঘুমিয়ে পড়েছে। তরুণী এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে। পুরুষ বন্দী তুজন ঠায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। লোহার শিক গলে পড়ন্ত বিকেলের একফালি রোদ এসে পড়েছে গ্যারেজের ভেতরে। গ্রেবার এসে দাঁড়াতেই পুরুষ তুজন ওর দিকে চমকে তাকালো। তরুণী কিন্তু কোনদিকে তাকালো না। বয়স্ক বন্দী সতর্ক চোখে গ্রেবারকে লক্ষ্য করলো। গ্রেবার ফিরে এসে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসলো, রাইফেলটাকে কোলের ওপর ফেলে রাখলো আলতো করে।

নীলিম আকাশে ভেসে চলেছে একপাল সাদা ভেড়ার মতো নিঃসঙ্গ মেঘগুলো। পাখিপাখালির গুঞ্জরিত গানে মুখর হয়ে উঠছে বার্চের শাখা। এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে হলুদ ডানাওয়ালা একটা প্রজাপতি। একটু পরেই দ্বিতীয়টা এলো। গোধূলির রাঙা আলোয় তুজনে পাখায় পাখা জড়িয়ে খেলা করলো। দেখতে দেখতে গ্রেবার একসময়ে ঝিমিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যের পর একজন রংরুট বন্দীদের জন্যে খাবার নিয়ে এলো। আসলে তুপুরে রাঁধা মটরশুঁটির সুরুয়াতেই জল ঢেলে পাতলা করা হয়েছে। বন্দীদের খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত রংরুট অপেক্ষা করলো, তারপর বাসন নিয়ে চলে এলো। গ্রেবারের জন্যে খাবার এবং সিগারেটও ও নিয়ে এসেছিলো। গ্রেবার দেখলো সিগারেটের সংখ্যা স্বাভাবিক বরাদ্দের চেয়ে

অনেক বেশি। লক্ষণ তাহলে তো ভাল নয়। সৈনিকদের যখন ভালো খাবার আর বেশি সিগারেট দেওয়া হয়, ধরে নিতে হবে সামনেই কোন বিপদ এগিয়ে আসছে।

'আমি কি চলে যাবো ?' তরুণ রঙরুট গ্রেবারকে জিজ্ঞেস করলো।

'না, তুমি একটু দাঁড়াও।'

গ্রেবার উঠে পড়লো। দুজনে গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়ালো। তরুণ এমনভাবে বন্দীদের দিকে তাকালো, যেন ওরা চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ার। গ্রেবার বললো, 'ওরা জন্তু নয়, মানুষ।'

'হ্যাঁ, রাশিয়ান।'

'রাশিয়ানরাও মানুষ।'

'কিন্তু, কমিউনিস্ট।'

'কমিউনিস্টরা জন্তু নয়। যাকগে, এখন রাইফেলটা ঠিক করে ধরো। মেয়েদের আগে বাইরে বার করতে হবে।'

গ্রেবার ইঙ্গিতে বয়স্ক রাশিয়ান বন্দীকে বললো মেয়েদের যদি বাইরে যাবার প্রয়োজন থাকে ওরা যেতে পারে, ওরা ফিরে এলে তোমরা যাবে।

রাশিয়ান অন্যদের কি যেন বললো। ওরা সম্মতি জানালো। তরুণ রঙরুট দরজার দিকে তাক করে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো। গ্রেবার ওর ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললো। তারপর দরজা খুলে বৃদ্ধাকে আগে বাইরে আসতে বললো। বেরিয়ে আসার পর গ্রেবারকে দরজায় তালা বন্ধ করতে দেখে বৃদ্ধা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। ওর ধারণা ওকে বোধহয় এবার গুলি করে মারা হবে।

গ্রেবার বয়স্ক রাশিয়ানকে বললো, 'ওকে বলো ওর কোন ভয় নেই।'

রাশিয়ান ওকে আবার কি যেন বললো। বৃদ্ধা কান্না থামালো। তরুণ রঙরুটকে এখানে থাকতে বলে গ্রেবার বৃদ্ধাকে নিয়ে পোড়ো বাড়ির পেছন দিকে চলে গেলো। বৃদ্ধা ফিরে না আসা পর্যন্ত ও অপেক্ষা করলো, তারপর আবার তরুণীকে নিয়ে গেলো। তরুণী বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলো। ওর ভয়কে চিনতে গ্রেবারের কোন অসুবিধে হলো না। সত্যিই, কি আশ্চর্য ভঙ্গুর মানুষের জীবন! পুরুষ বন্দীদের ও গ্যারেজের পেছনে যেতে বললো। ওরা ফিরে আসার পর গ্রেবার আবার তালা লাগিয়ে দিলো।

'দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার, তাই না ?' উত্তেজনায় তরুণ রঙরুটের চোখ তখন চকচক করছে।

ওর রাইফেলটা একপাশে ঠেলে দিয়ে গ্রেবার বললো, 'তুমি এবার যেতে পারো।'

নবাগত সৈনিকটি অন্ধকারে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গ্রেবার নির্নিমেষ চোখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে বয়স্ক বন্দীর হাতে চারটে সিগারেট দিলো সবাইকে দেওয়ার জন্যে। দেশলাই কাঠি জ্বেলে ও গলিয়ে দিলো শিকের মধ্যে দিয়ে। আবছা আঁধারে সিগারেটের প্রদীপ্ত আলোয় ওদের মুখগুলো এখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। তরুণীর পেছনে-ফেলে-আসা স্তব্ধ গভীর চোখের দিকে তাকাতেই এলিজাবেথের জন্যে গ্রেবারের বুকটা নিঃশব্দ যন্ত্রণায় টনটন করে উঠলো।

বয়স্ক রাশিয়ান দরজার সামনে এসে ওর দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো, 'তুমি···ভালো লোক···'

গ্রেবার ম্লান ঠোঁটে হাসলো।

বয়স্ক বন্দী এবার লোহার শিকগুলো চেপে ধরলো। 'জার্মানির জন্যে যুদ্ধ শেষ···তুমি ভালো লোক।'

'কি সব যা-তা বোকছো!'

'আমাদের যেতে দাও না কেন···এবং তুমি আমাদের সঙ্গেই এসো?' গ্রেবার দেখলো ভাষার জন্যে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারছে না, তবু বন্দীর চোখদুটো এখন যেন চুনীর মতো জ্বলছে। 'তুমি আমাদের সঙ্গে এসো···মারুসা ভালো মেয়ে···তোমাকে লুকিয়ে দেবে···তোমার ক্ষতি হবে না···তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে দেবো। তুমি বেঁচে যাবে···'

গ্রেবার মাথা নাড়লো। মনে মনে ভাবলো, এটা কোন সমাধানই নয়। এভাবে কোন সমস্যার সমাধান হবে না।

বন্দী এবার লোহার শিকের ওপর মুখটা চেপে ধরলো। 'বিশ্বাস করো আমরা সরল···কিচ্ছু জানি না···তুমি ভালো···আমরা তোমাকে বাঁচিয়ে দেবো···জার্মানির জন্যে যুদ্ধ হার···'

গ্রেবার দরজার সামনে থেকে সরে এলো। কোমল আঁধারে দ্রুত-উচ্চারিত শব্দগুলো ওর মনে হলো ঝরনার গভীর কলোচ্ছ্বাসের মতন। হয়তো ওরা সত্যিই কিছু জানে না। কোন অস্ত্রই ওদের কাছে খুঁজে পাওয়া যায়নি, এমনকি দেখতেও গেরিলাদের মতো নয়। গ্রেবার ভাবলো আমি যদি ওদের ছেড়ে দিই, জানবো জীবনে সামান্যতমও কিছু করতে পারলাম। নিরপরাধ কয়েকটা মানুষকে আমি রক্ষা করতে পারলাম। কিন্তু তা বলে আমি ওদের সঙ্গে যেতে পারি না। যার থেকে মুক্তি চাই তার মধ্যে আমি

আবার ফিরে যেতে চাই না। পায়ে পায়ে ও পাথরের প্রতিমূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। অদূরে সারি সারি বার্চের গাছগুলো এখন আকাশের গায়ে অরণ্য প্রাচীরের মতো মনে হচ্ছে, আর গ্যারেজের অন্ধকারে একটা সিগারেট একচক্ষু দৈত্যের জ্বলন্ত চোখের মতো তখনও দপদপ করে জ্বলছে।

গ্রেবার আবার দরজার সামনে ফিরে এলো। বাকি সিগারেট এবং দেশলাইয়ের কয়েকটা কাঠি গুঁজে দিলো বন্দীর হাতে। 'এগুলো তুমি রাত্রির জন্যে রেখে দাও।'

'তুমি ভালো···তরুণ···যুদ্ধ তোমাদের হার···জীবন খুব ভালো, আমরা তোমাকে···' কোমল অথচ গভীর বন্দীর কণ্ঠস্বর। তবু 'জীবন' শব্দটা গ্রেবারের কাছে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকলো। কালোবাজারীরা যখন বলে 'মাখন', বেশ্যারা যখন বলে 'ভালবাসা', 'জীবন' শব্দটাও এখন অনেকটা সেইরকম মনে হলো, যেন যে কোন মুহূর্তে ওটাকে ও বিকিয়ে দিতে পারে।

কেন জানি গ্রেবার হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, 'চুপ করো!'

বন্দী চমকে উঠলো। স্তব্ধ বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো সেই কণ্ঠস্বর।

গ্রেবার এবার টহল দিতে শুরু করলো। তুমুল রলোরোলে কেঁপে উঠছে দিগন্ত। আকাশে টিপ টিপ করে ফুটে উঠেছে তারাগুলো। হঠাৎ ওর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো। মনে হলো সহযোদ্ধারা যেন ওকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে আর ওকে ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ কি যেন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর, টালির ছাউনির নিচে একটা বেঞ্চিতে গ্রেবার টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লো। এখান থেকে গ্যারেজটা স্পষ্ট দেখা যায়। যদিও ও জানে লোহার ভারি দরজাটা ওদের পক্ষে ভেঙে ফেলা সম্ভব নয় আর ওরা তা করবেও না, তবু ও নজর রাখলো।

প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ-সীমান্ত যেন আরও উত্তাল উদ্দাম হয়ে উঠছে। এবার আকাশে গরুড়ের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেলো। তার সঙ্গে বিমান-বিধ্বংসী কামানের একটানা আওয়াজ। তারপরেই শোনা গেলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। গ্রেবার কান খাড়া করে শুনলো। মাঝরাত্রির পর থেকে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠলো। শব্দ শুনে ও বুঝতে পারলো এবার ট্যাঙ্ক দিয়ে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। পাগলের মতো উন্মাদ আনন্দে কঁপে কেঁপে উঠছে পায়ের নিচে মাটি আর আকাশে আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুরু-গম্ভীর বজ্র ননাদ। গ্রেবার তার প্রতিটি রক্তস্রোতে অনুভব করতে পারলো সেই হিমেল শিহরণ আর তার দেহের চারপাশে ঘিরে-থাকা অগ্নি-বলয়ের একটা ঘূর্ণিল উত্তাপ।

হঠাৎ কেন জানি ওর মনে হলো বন্দীদের মুক্তি দিলে হয়তো এত তীব্র হয়ে উঠতো না এই আক্রমণ এবং বন্দীদের মুক্তি দেওয়া না-দেওয়ার ওপরেই যেন নির্ভর করছে এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল। আর তখনই পকেটে অনুভব করলো তালার ভারি চাবিটা। কল্পনায় গ্রেবারের চোখের সামনে ভেসে উঠলো—মুক্ত স্বাধীন বন্দীদের উল্লসিত মুখগুলো। ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো গ্রেবার টেরও পায়নি।

চোখে সূর্যের আলো পড়তেই গ্রেবারের ঘুম ভেঙে গেলো। কামানের গর্জন এখন আরও কাছে মনে হচ্ছে। এত কাছে ঠিক যেন বাগানবাড়ির পেছনেই। গ্যারেজের দিকে তাকিয়ে দেখলো দরজাটা অক্ষত। ভেতরে বন্দীরা ঘোরাফেরা করছে। আর তখনই ওর চোখ পড়লো ফটকের দিক থেকে দ্রুত-ছুটে-আসা স্টেইনব্রেনারের ওপর।

'কি ব্যাপার, ম্যাক্স!'

'আমরা পিছু হটছি,' স্টেইনব্রেনার ওখান থেকেই চিৎকার করে বললো। 'রাশিয়ানরা সৈন্যঘাঁটি অধিকার করে নিয়েছে। গ্রামে সবাইকে মিলিত হতে হবে। শীগগির চলো।' স্টেইনব্রেনার এবার কাছে এসে পৌঁছলো। 'বন্দীদের এখানেই শেষ করে দাও।'

গ্রেবারের বুক কেঁপে উঠলো। 'কোন আদেশ আছে?'

'আদেশ! ঘাঁটির অবস্থা দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যেতো, তখন আর আদেশের কথা জিগেস করতে না। কেন, এখান থেকে কিছু শুনতে পাওনি?'

'পেয়েছি।'

'তাহলে আর জিগেস করছো কেন? আদেশের ভরসায় আমরা তো আর সারা পথ এদের টেনে নিয়ে যেতে পারি না। এসো, বরং দরজার মধ্যে দিয়েই এদের শেষ করে দিই।'

'না।'

গ্রেবার তাকিয়ে দেখলো ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় ওর নীল চোখদুটো ঝকঝক করছে, টান-টান চিবুক, নিচের হালকা ঠোঁটটা উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছে। ডান হাতটা রয়েছে ওর রিভলবারের খাপে।

স্টেইনব্রেনার চাপা স্বরে বললো, 'এতে আবার এত ভাবাভাবির কি আছে, গ্রেবার? এ তো জলের মতো সহজ।'

'না, এদের দায়িত্ব আমার। তোমার কাছে যদি আদেশপত্র না থাকে, তুমি যেতে পারো।'

স্টেইনব্রেনার হাসলো। 'বেশ তো, দায়িত্ব যখন তোমার, তুমিই শেষ করে দাও।'

'না।' গ্রেবার চিৎকার করে উঠলো।

'আমরা যখন এদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না, দুজনের একজনকে তো এ-কাজ করতেই হবে। তোমার সৌখিন স্নায়ুতে যদি না কুলোয়, তুমি যাও। আমি দু-এক মিনিটের মধ্যেই তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।'

'না,' গ্রেবার অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি ওদের গুলি করে মারতে পারবে না।'

'পারবো না!' অস্ফুট স্বরে স্টেইনব্রেনার বললো। তারপর সোজা গ্রেবারের চোখের দিকে তাকালো। 'তুমি জানো, তুকি কি বলছো?'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো গ্রেবারের কণ্ঠস্বর। 'জানি।'

'তুমি জানো তাহলে? তাহলে এটাও জেনে রাখো...'

গ্রেবার দেখলো ওর মুখের চেহারা এখন আশ্চর্য বদলে গেছে। ভ্রূদুটো আপনা থেকেই কুঁচকে গেছে। জিঘাংসায় চোখের মণিদুটো ধক্‌ধক্ করছে, ও খাপ খুলে রিভলভারটা টেনে বার করছে। মনে মনে গ্রেবার প্রস্তুত হয়েই ছিলো, চকিতে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ও গুলি করলো। মরণার্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে স্টেইনব্রেনার চরকির মতো একপাক ঘুরে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়লো নিচে।

গ্রেবার স্থির নিষ্পলক চোখে স্খলিত দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলো। অথচ আশ্চর্য, বিক্ষুব্ধ কোন আলোড়নে বুকের ভেতরটা ওর তোলপাড় হয়ে উঠলো না। কেবল উচ্চারিত হলো দাঁতে-দাঁত-চাপা অস্ফুট একটা ধ্বনি—'কসাই!'

প্রচণ্ড নির্ঘোষে ভারি কামানের একটা গোলা মাথার ওপর দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। গ্রেবার ত্রস্ত পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর চাবি দিয়ে তালা খুলে ও বন্দীদের বললো, 'যাও!'

বন্দীরা অবাক চোখে তাকালো। যদিও ওরা সব লক্ষ্য করেছিলো, তবু যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলো না। গ্রেবার হাত থেকে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'যাও যাও, শীগ্‌গির যাও!'

তরুণ বন্দী সতর্ক ভঙ্গিতে বাইরে পা বাড়ালো। গ্রেবার চলে এলো। স্টেইনব্রেনারের দিকে একবার ফিরেও তাকালো না। ফটক পেরিয়ে এবার

ও ছুটতে শুরু করলো। সবার আগে ওকে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে হবে।

আর তখনই ওপর থেকে গড়িয়ে-পড়া বিশাল একটা পাথরের মতো ওর ভাবনাগুলো যেন একসঙ্গে দ্রুত ধেয়ে এলো ওর দিকে। ওর মনে হলো কি যেন একটা আগে থেকেই স্থির হয়ে ছিলো, অথচ ও তার প্রকৃত সত্তার গভীরে প্রবেশ করতে পারলো না। যেন ওর শরীরের কোন ভারই নেই। ওর মনে হলো এই মুহূর্তে কিছু একটা ঠিক করতে হবে, কিন্তু তার আগে স্থির করতে হবে—ও আর পালাবে না। এখন থেকে সবকিছু ওকে আরও স্পষ্ট করে জানতে হবে, স্পর্শ করতে হবে। হঠাৎ বুকের মধ্যে অনুভূতিটা এত তীব্র হয়ে উঠলো যে ও আর সহ্য করতে পারলো না।

এবার খুব কাছেই রাশিয়ান সৈন্যদের ও দেখতে পেলো। পরিত্যক্ত জার্মান ঘাঁটির দিকে ওরা এগিয়ে আসছে। একটু ঝুঁকে উদ্ধত রাইফেল হাতে ওরা ছুটছে। সঙ্গে কয়েকজন তরুণীও রয়েছে। একজন সৈনিক হঠাৎ ঘুরে তাকাতেই গ্রেবারকে দেখতে পেলো। গ্রেবার ভাবতেই পারেনি এত তাড়াতাড়ি ও ওদের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। সৈনিকটি চকিতে রাইফেল তুলে ওকে নিশানা করলো। রাইফেলের মুখটা উঠলো আর একটু ওপরে। এবার নলের কালো গর্তছুটো গ্রেবার স্পষ্ট দেখতে পেলো। দ্রুত দু হাত তুলে চিৎকার করে ও থামতে বললো। এই মুহূর্তে মনে হলো ওর যেন অনেক কিছু বলার রয়েছে···

আশ্চর্য! গুলিটা ও অনুভবই করতে পারলো না। কেবল দেখলো ওর চোখের সামনে তিরতির করে কাঁপছে পায়ে-দলা একমুঠো সবুজ ঘাস। সরু সরু শীষগুলো এখন ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। এর আগেও ও একবার এরকম হতে দেখেছে, কিন্তু তখন ও চিনতো না। এখন নিস্পন্দ নীলিম শান্তিতে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা মগ্ন চোখের পাতার নিচে থেকে দেখলো ঘাসের একটা শীষ কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেলো দিগন্তের গায়ে, তারপর সেটা ক্রমশ বড় হতে হতে ঢেকে ফেললো নিশ্চল সারা আকাশ। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো ওর দু চোখের পাতা।

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

প্রকৃত নাম এরিখ পল রেমার্ক। জন্ম ১৮৯৮ সালে ওসনাব্রুক-এ জার্মানির মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে। বয়েসে যখন নিতান্তই কিশোর, স্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে যোগ দিতে হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ফ্রান্সের যুদ্ধসীমান্তে একটানা চার বছর অক্লান্ত যুদ্ধে পাঁচ পাঁচ বার মারাত্মকভাবে আহত হলেন। যুদ্ধ যখন শেষ হলো, দেখলেন বন্ধু-বান্ধব পরিবার পরিজন কেউ আর বেঁচে নেই। নিঃসঙ্গ একা দেশে ফিরে এলেন, স্কুল মাস্টারের চাকরি নিলেন একটা গ্রামে। তারপর নানান ধরনের কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখলেন, এর ফাঁকে ফাঁকেই চললো সাহিত্যচর্চা। একবার লটারিতে কিছু টাকা পেয়ে কয়েকটা দেশও ঘুরে এলেন। এরপর যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন প্রথম উপন্যাস 'পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ যখন থামলো'। ১৯২৮ সালে বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে দারুণ সাড়া পড়ে গেলো। এক বছরের মধ্যেই অনূদিত হলো বাইশটি ভাষায়। এই কাহিনীরই জের টেনে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় উপন্যাস 'প্রত্যাবর্তন'। যুদ্ধোত্তর জার্মান জনমানসের নিঃসীম হতাশাকে রূপ দিলেন ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'তিন বন্ধু' উপন্যাসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই তিনটি উপন্যাসই দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কিন্তু মানবিক মূল্যবোধের বিচারে রেমার্ক বিশ্বের দরবারে সত্যিকারের বিদগ্ধ সাহিত্যিকের মর্যাদা লাভ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা পরবর্তী উপন্যাসগুলির জন্যে। হিটলারের জার্মানিতে বর্বর ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে তিনি কোন-দিনই হাত মেলাতে পারেননি, ফলে তাঁর নাম উঠলো পুলিসের কালো খাতায়। ১৯৩৯ সালে নিদারুণ অত্যাচারের দিনগুলোতে রেমার্ক পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এলেন আমেরিকায়। হোটেলে হোটেলে দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন লস এঞ্জেলস্-এ। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নগ্ন বীভৎসতা, অন্যদিকে দেশে দেশে ফ্যাসিস্টদের নির্মম নৃশংস অত্যাচার—এই দুই পটভূমিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা ভালবাসাকে নিয়ে একের পর এক রচনা করে গেলেন—ফ্লটসাম ১৯৪১, আর্চ অফ ট্রায়ম্ফ